রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নামায

প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ

মোহাম্মদ নাসেরুদ্দীন আলবানী
ও
এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম

রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নামায

[প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ]

মোহাম্মদ নাসেরুদ্দীন আলবানী
ও
এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম

বিশ্ব প্রকাশনী

প্রকাশক
এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম

সংশোধিত ও পরিমার্জিত ৫ম সংস্করণ
শাবান – ১৪২৫
আশ্বিন – ১৪১১
সেপ্টেম্বর – ২০০৪

বিনিময় ঃ ১০০.০০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০

বর্ণবিন্যাস
আইডিয়াল কম্পিউটার
বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০

প্রচ্ছদ ঃ
ক্লাসিক প্রোডাক্‌ট্‌স
১০৫ ফকিরাপুল
ঢাকা–১০০০

মুদ্রণ ঃ আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা –১১০০

লেখক পরিচিতি

নাসেরুদ্দীন আলবানী (রঃ) বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মোহাদ্দেস বা হাদীস বিশারদ। আরব ও মুসলিম বিশ্বে তিনি হাদীস শাস্ত্রের ইমাম ও রেফারেন্স ব্যক্তি হিসেবে গণ্য। বিশ্বে হাদীস গ্রন্থের সংখ্যা অসংখ্য। তিনি বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থ থেকে বিশুদ্ধ হাদীসগুলোকে দুর্বল ও জাল হাদীস পৃথক করেছেন। তিনি সহীহ হাদীসগুলোকে বাছাই করে سِلْسِلَةُ الْأَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ এবং দুর্বল হাদীসগুলোকে سِلْسِلَةُ الْأَحَادِيْثِ الضَّعِيْفَةِ নামক দু'টো পৃথক সংকলনে প্রকাশ করেছেন। এজন্য তাঁকে 'বাদশাহ ফয়সল' আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। আরব বিশ্বের ওলামায়ে কেরাম কোন হাদীসকে গ্রহণ ও বর্জনের জন্য আলবানীর মতামতকে মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন।**

তিনি সহীহ হাদীসসমূহের আলোকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নামায পদ্ধতি তুলে ধরার তীব্র প্রয়োজন অনুভব করেন। আর এটা তাঁর মত একজন অনন্য সাধারণ ও প্রথিতযশা পণ্ডিতের পক্ষেই সম্ভব। এ বিষয়ের উপর তিনি ছাড়া আর কোন আলেম এককভাবে কোন বই রচনা করেননি। তিনি এবইটিতে হাদীস গ্রহণের প্রতি চার মাজহাবের অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরার লক্ষ্যে এক মহামূল্যবান ভূমিকা লেখায় বইটি পরশ পাথরের মূল্যকেও ছাড়িয়ে গেছে। এ অনন্য ভূমিকাটি বইটিকে অসাধারণ ও বিশ্বজনীন করেছেন এবং সকল মত ও মাজহাবের লোকের নিকট সমানভাবে সমাদৃত করেছে।

লেখকের পিতার নাম নূহ আলবানী। তিনি ১৩৩৩ হিঃ সালে আলবেনিয়ার প্রাচীন রাজধানী আশকুদারার এক গরীব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। আলবেনিয়ার বাদশাহ আহমদ যোগো দেশে ধর্ম-নিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা চালু করার কারণে পিতা নূহ নিজের ঈমান ও জান-মালের নিরাপত্তাহীনতার আশংকায় সিরিয়ার উদ্দেশ্যে হিজরত করে দামেশক পৌছেন।

নাসেরুদ্দীন আলবানী প্রথমে পিতার কাছে আরবী ভাষা ও কোরআনসহ হানাফী মাজহাবের ফেকাহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে তিনি কোরআন-হাদীস, ফিকহ-আকীদাসহ ইসলামী এলেমে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এরপর এলেম ও দ্বীনের দাওয়াতী কাজে মনোনিবেশ করেন। দ্বীনের দাওয়াত ও সংগ্রামে তাঁকে দু'বার কারাবরণ করতে হয়েছে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১২-এর অধিক।

তিনি ১৩৮১ – ১৩৮৩ হিঃ পর্যন্ত মদীনার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে মোহাদ্দেস হিসেবে হাদীস শিক্ষা দেন এবং ১৩৯৮ হিঃ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি দামেস্ক এবং পরে জর্দানে বাস করেন। ১৯৯৯ সন মোতাবেক, ১৪২১ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ্ তাঁকে তাঁর এ বিশাল দ্বীনি খেদমতের জন্য জান্নাত নসীব করুন। আমীন।

** এছাড়াও তিনি নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, তিরমিজী এবং আবু দাউদের সহীহ ও দুর্বল হাদীসগুলোর পৃথক পৃথক সংকলন করেন।

অনুবাদকের কথা

মহানবী মোহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, 'তোমরা আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখ, সেভাবে নামায আদায় কর।' — (বোখারী, আহমদ)

নামায ইসলাম ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী এবং বেহেশতের চাবি ও মোমেনের উন্নতির সোপান। এক সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান ও সময়ে তা ফরয করা হয়েছে। আল্লাহ মে'রাজের পবিত্র রাত্রে নিজ আরশে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ভেতর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের সওয়াব উপহার ঘোষণা করেছেন।

ফেরেশতা-শ্রেষ্ঠ জিবরীল (আঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে নামাযের সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। তাই রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নামায পদ্ধতি জানার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

লেখক صِفَةُ صَلَاةِ النَّبِيِّ (ص) مِنَ التَّكْبِيْرِ اِلَى التَّسْلِيْمِ كَاَنَّكَ تَرَاهَا-বইটিতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামায পদ্ধতি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

বইটি আরব বিশ্বের ওলামায়ে কেরামসহ সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ইতিপূর্বে শতাব্দী প্রকাশনী থেকে বইটির দু'টো সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। যা আমরা বর্তমানে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামায ১ম ভাগ নাম দিয়েছি।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) কিভাবে নামায পড়েছেন তা জানার পর সহীহ হাদীসের আলোকে নামাযের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলোও আলোচনার দাবী রাখে। অনুরূপভাবে অযূ-গোসলের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলোও আলোচনা হওয়া দরকার। তাই এ বিষয়ের উপর আলোচনা সম্বলিত দ্বিতীয় ভাগ মূল বইয়ের সাথে সংযোজন করা হলো। দ্বিতীয় ভাগের মুখবন্ধ পাঠ করলে পাঠক বিষয়টি সুন্দরভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন। আল্লাহ বইটির মাধ্যমে বাংলাভাষী মুসলমানদেরকেও উপকৃত করুন। আমীন!

এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম
বাংলা বিভাগ, রেডিও জেদ্দা
সৌদী আরব।
১৭/১২/১৯৯৫ ইং

সুচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

প্রথম ভাগ

বিষয়	পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় ভাগ

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামায

প্রথম ভাগ

মোহাম্মদ নাসেরুদ্দীন আলবানী

অনুবাদ ঃ এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম

ভূমিকা

সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর, যিনি নিজ বান্দাহদের ওপর নামায ফরয করেছেন, নামায কায়েম করার ও উত্তমরূপে আদায় করার আদেশ দিয়েছেন, বিনয়কে নামাযের সাফল্যের মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন, নামাযকে ঈমান ও কুফরীর মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করেছেন এবং অশ্লীল ও গুনাহর কাজ থেকে বিরতকারী বানিয়েছেন।

দুরূদ ও সালাম মুহাম্মদ (সঃ)-এর ওপর, যাকে লক্ষ্য করে আল্লাহ বলেছেনঃ

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ

"আমরা তোমার প্রতি যিকর (কোরআনের আদেশ-নিষেধ) নাযিল করেছি যেন তুমি লোকদের কাছে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করতে পারো।" (সূরা আন-নাহল–৪৪)

তিনি এই অর্পিত দায়িত্ব যথার্থভাবে পালন করেছেন। এর মধ্যে নামায হচ্ছে অন্যতম দায়িত্ব, যা তিনি কথা ও কাজের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। এমন কি এ উদ্দেশ্যে একবার তিনি মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে নামায পড়েন ও রুকু-সাজদা করেন এবং বলেন, 'আমি তা এজন্যই করলাম তোমরা যেন তা আমার সঙ্গে আদায় করতে পার ও আমার নামায দেখে শিখতে পারো।'১

তিনি তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণকে আমাদের জন্য কর্তব্য হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেন ঃ

صَلُّوْا كَمَا رَاَيْتُمُوْنِىْ اُصَلِّىْ (بخارى واحمد)

"তোমরা আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখ, সেভাবে নামায আদায় করো।" (বোখারী, আহমদ)

রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর অনুরূপ নামায আদায়কারীদের উদ্দেশ্যে বেহেশতে প্রবেশের জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতির সুসংবাদ দেন। তিনি বলেন ঃ 'আল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করে ঠিক ওয়াক্ত মত নামাযগুলো আদায় করে, রুকু ও সাজদা পরিপূর্ণ করে এবং বিনয় সহকারে নামায পড়ে, তাকে মাফ করার বিষয়ে আল্লাহর ওয়াদা

---

১ (বোখারী ও মুসলিম)

রয়েছে। যে ব্যক্তি অনুরূপ করে না, তার জন্য আল্লাহর কোনো প্রতিশ্রুতি নেই। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাকে মাফ করতে পারেন এবং ইচ্ছা করলে শাস্তি দিতে পারেন।'২

রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বংশধর এবং সাহাবায়ে কেরামের ওপরও সালাম বর্ষিত হোক। যাঁরা আমাদের কাছে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইবাদত, নামায, কথা ও কাজ বর্ণনা করেছেন এবং সেগুলোকেই কেবল নিজেদের মাযহাব ও আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তাদের ওপরও সালাম ও রহমত বর্ষিত হোক, যারা তাঁদের অনুরূপ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন এবং পরবর্তীতে কেয়ামত পর্যন্ত যারা তাদের অনুসরণ করবেন।

আমি যখন হাফেয আল মোনযেরীর 'আত্‌তারগীব ওয়াত্‌তারহীব' গ্রন্থের নামায অধ্যায় শেষ করি এবং দীর্ঘ চার বছরব্যাপী কিছু সংখ্যক ভাইকে তা শিক্ষা দেই, তখন আমাদের সবার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ইসলামে নামাযের স্থান ও মর্যাদা কত বেশী এবং যে ব্যক্তি তা কায়েম করে ও উত্তম রূপে আদায় করে তা কত বেশী সওয়াব ও পুরস্কার রয়েছে। অবশ্য রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নামাযের সঙ্গে নৈকট্য ও দূরত্বের কারণে সওয়াবেরও বেশ-কম হয়ে থাকে। এই কথার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েই রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'বান্দাহ নামায পড়ে। কিন্তু সেই নামাযের সওয়াব লেখা হয় এক-দশমাংশ, এক-নবমাংশ; এক-অষ্টমাংশ, এক-সপ্তমাংশ, এক-ষষ্ঠাংশ, এক-পঞ্চমাংশ, এক-চতুর্থাংশ, এক-তৃতীয়াংশ, ও অর্ধাংশ।৩

সেজন্য আমি বন্ধুদের সতর্ক করে দিয়েছি যে, আমাদের পক্ষে নামায পূর্ণভাবে কিংবা এর কাছাকাছিও আদায় করা সম্ভব নয়, যে পর্যন্ত না আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নামাযের বিস্তারিত বর্ণনা জানতে পারবো এবং তাতে কি কি ফরয-ওয়াজিব, আদব-কায়দা, নিয়ম-কানুন এবং দোআ ও যিকর আছে, তা অবগত হতে পারবো। তারপর যদি আমরা সেগুলোকে বাস্তবে পালন করি, তাহলে আশা করা যায় যে, আমাদের নামায আমাদেরকে অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং আমরা নামাযের জন্য বর্ণিত সওয়াব ও পুরস্কার লাভ করব।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, অধিকাংশ লোকের পক্ষে তা বিস্তারিত জানা মুশকিল। এমনকি সুনির্দিষ্ট মাযহাব অনুসরণের কারণে বহু আলেমের পক্ষেও সেগুলো বিস্তারিত জানার অবকাশ নেই। ফিক্‌হ এবং হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের

---

২. আবু দাউদ। এটি সহীহ হাদীস। একাধিক ইমাম একে সহীহ বলেছেন।

৩. আবু দাউদ ও নাসাঈ।

মাধ্যমে হাদীসের প্রতিটি সেবক একথা পরিষ্কার জানেন যে, তাদের প্রত্যেকের মাযহাবে এমন কিছু সুন্নাহ আছে, যা অন্যদের মাযহাবে নেই। সেগুলোর মধ্যেও এমন কিছু সুন্নাহ আছে, যেগুলোকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কথা ও কাজ হিসেবে বর্ণনা করা ঠিক নয়।

আবুল হাসানাত লক্ষ্মৌবী তাঁর 'আন-নাফেউল কবীর লিমান ইউতালেউ জামে' আস-সগীর' বইতে লিখেছেন, (১২২-১২৩ পৃঃ) বড় বড় ফকীহদের বইগুলোতেও বহু মওযু হাদীসের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে ফাতোয়ার কিতাবগুলোর ক্ষেত্রে একথা বেশী প্রযোজ্য। যদিও লেখকরা বড় পন্ডিত ছিলেন কিন্তু তাঁরা হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে কিছুটা উদাসীনতার পরিচয় দিয়েছেন। ঐ রকম বর্ণিত একটি অসত্য হাদীস হচ্ছে ঃ

مَنْ قَضٰى صَلَوَاتٍ مِّنَ الْفَرَائِضِ فِىْ اٰخِرِجُمْعَةٍ مِّنْ رَّمَضَانَ
كَانَ ذٰلِكَ جَابِرًا لِّكُلِّ صَلَاةٍ فَائِتَةٍ فِىْ عُمُرِهٖ اِلٰى سَبْعِيْنَ سَنَةٍ-

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি রমযানের শেষ জুমআর দিন ফরয নামায আদায় করে, এর ফলে তার জীবনের ৭০ বছরের কাযা নামাযের ক্ষতিপূরণ হবে।"

মোল্লা আলী কারী তাঁর 'মাওযুআতুয সোগরা ওয়াল কোবরা' বইতে এটিকে বাতিল বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা, তা ইজমার পরিপন্থী। ইজমা হচ্ছে, কোন ইবাদত কয়েক বছরের অন্য কোন কাযা ইবাদতের ক্ষতিপূরণ করতে পারে না।

আল্লামা শাওকানী 'আল-ফাওয়ায়েদুল মাজমুআহ ফিল আহাদীসিল মাওযুআহ' গ্রন্থেও এটাকে মাওযু' (অসত্য) হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন।

তাই হাদীসকে হাদীসের সেবক তথা মোহাদ্দেসীনের কাছ থেকে গ্রহণ করতে হবে।

যাই হোক, পরবর্তীকালেই এই প্রবণতা বেশী পরিলক্ষিত হয়। তারা বিনা বিচারে তা রসূলুল্লাহর হাদীস বলে চালিয়ে দেন। সেজন্য ইমাম নববী তাঁর 'আল-মজমু ফী শরহিল মুহাযযাব' গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৬০ পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ মোহেদ্দসীন বলেছেন, হাদীস দুর্বল হলে রসূলুল্লাহ (সঃ) 'বলেছেন', 'করেছেন', 'আদেশ দিয়েছেন' এবং 'নিষেধ করেছেন' এজাতীয় শক্তিশালী ও নিশ্চিত শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা ঠিক নয়। সেসকল ক্ষেত্রে 'বর্ণিত আছে' ও 'উদ্ধৃত আছে' ইত্যাকার দুর্বল ও অনিশ্চিত শব্দ ব্যবহার করার বিধান রয়েছে।

কেননা শক্তিশালী শব্দগুলো বিশুদ্ধ হাদীস এবং দুর্বল শব্দগুলো দুর্বল হাদীসের জন্য ব্যবহার করার নিয়ম রয়েছে।

তাই মোহাদ্দেসীনে কেরাম দুর্বল ও অসত্য হাদীসগুলো থেকে সহীহ হাদীসগুলোকে পৃথক করে ভিন্ন কিতাব রচনা করেছেন। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে শেখ আবদুল কাদের বিন মোহাম্মদ আল-কোরাশী আল-হানাফীর রচিত-

اَلْعِنَايَةُ بِمَعْرِفَةِ اَحَادِيْثِ الْهِدَايَةِ এবং اَلطُّرُقُ وَالْوَسَائِلُ فِىْ تَخْرِيْجِ اَحَادِيْثِ خُلاَصَةِ الدَّلاَئِلِ -

হাফেয যাইলায়ীর نَصَبُ الرَّايَةِ لِاَحَادِيْثِ الْهِدَايَةِ -

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানীর اَلدِّرَايَةُ এবং

تَلْخِيْصَ الْخَبِيْرِ فِىْ تَخْرِيْجِ اَحَادِيْثِ الرَّافِعِى الْكَبِيْرِ ইত্যাদি।

বইটি লেখার কারণ

আমি নামাযের ব্যাপারে ব্যাপক ভিত্তিক কোন বই না পাওয়ায় যে ভাইয়েরা নিজেদের ইবাদতে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চরিত্রকে অনুসরণ করতে চান, তাদের জন্য নামাযের তাকবীরে তাহরীমা থেকে তাসলীম, অর্থাৎ সালাম ফিরানো পর্যন্ত যথাসম্ভব রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নামাযের ব্যাপকভিত্তিক বর্ণনা সম্বলিত একখানা বই লেখার কর্তব্য অনুভব করি। এতে করে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঠিক প্রেমিকরা তাঁর এই আদেশ বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবেন ঃ

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِىْ اُصَلِّىْ

অর্থ ঃ 'তোমরা আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখ সেভাবে নামায আদায় কর।' (বোখারী, আহমদ)

তাই আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করে বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থ থেকে নামায সংক্রান্ত হাদীসগুলো বাছাই করেছি। যার ফলশ্রুতিস্বরূপ এ বই আপনাদের সামনে বিদ্যমান। এ বিষয়ে আমি একটি শর্ত পূরণ করেছি। সেটি হচ্ছে, উসূলে হাদীসের বিধান মোতাবেক যে সকল হাদীসের সহীহ সনদ রয়েছে, আমি কেবলমাত্র সেগুলোকে এই বইতে এনেছি। দুর্বল ও অজ্ঞাত হাদীসগুলোকে যিকর, দোআ ও অন্যান্য অধ্যায়ে পৃথকভাবে বর্ণনা করেছি। আমার মতে, সহীহ হাদীস দ্বারা যে বিষয়টি প্রমাণিত, দুর্বল হাদীস দিয়ে তা প্রমাণ করার কোন প্রয়োজন নেই এবং এর কোন ফায়দাও নেই। দুর্বল হাদীস দ্বারা শুধু

'ধারণা' অর্জন করা যায়, নিশ্চিত জ্ঞান নয়। আর 'ধারণা' অগ্রাধিকারযোগ্য নয়। একথাই আল্লাহ কোরআন মজীদে বলেছেন,

وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (النجم - ٢٨)

অর্থ ঃ 'ধারণা সত্যের ব্যাপারে কোন কাজে আসে না।' (সূরা আন নাজমঃ ২৮)

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃإِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ

অর্থঃ 'তোমরা ধারণা করা থেকে বেঁচে থাক। শুধু ধারণার ভিত্তিতে কথা বলা সবচেয়ে বড় মিথ্যা।'[৪]

আল্লাহ্ আমাদেরকে এর ভিত্তিতে ইবাদত করার নির্দেশ দেননি। বরং রসূলুল্লাহ (সঃ) তা থেকে আমাদেরকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন ঃ

اِتَّقُوا الْحَدِيْثَ عَنِّيْ إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ . (الترمذى واحمد)

অর্থ ঃ 'তোমরা আমার হাদীস বলা থেকে দূরে থাক। তবে যা তোমরা জান তা ব্যতীত।' তিনি যখন দুর্বল হাদীস বলতে নিষেধ করেছেন, তাহলে এর উপর আমল নিষিদ্ধ হওয়া আরো বেশী যুক্তিসঙ্গত।

আমি এ বইটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছি। উপর ও নীচ। উপরের ভাগে হাদীসের 'মতন' সহ মূল বক্তব্য পেশ করেছি। বিভিন্ন হাদীসের পৃথক পৃথক শব্দগুলোও ফায়দার জন্য উল্লেখ করেছি। আমি সনদে বর্ণনাকারী সাহাবীদের নাম খুব কমই উল্লেখ করেছি। উদ্দেশ্য হল, তা যেন সহজ-পাঠ্য হয়। নীচের অংশে উপরের অংশের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছি এবং হাদীসের সনদসহ বিভিন্ন সমালোচনা ও পর্যালোচনা করেছি। তাতে দুর্বল ও সহীহ্ হাদীস সম্পর্কে সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেছি। এরপর আমি উদ্ধৃত হাদীস সম্পর্কে ওলামা ও মোহাদ্দেসীনে কেরামের মতামত উল্লেখ করেছি এবং তাদের দলীল-প্রমাণ বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এর ভিত্তিতে আমি উপরের অংশে বর্ণিত সত্যের যথার্থতা নিরূপণ করেছি। এরপর আমি এমন কিছু মাসআলা উল্লেখ করেছি যেগুলোর ব্যাপারে কোন হাদীস পাওয়া যায় না। সেগুলো হচ্ছে, মুজতাহিদের গবেষণার ফসল এবং তা আমার এই বই-এর মূল বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নয়। আমি বইটির নামকরণ করেছি ঃ

৪. বোখারী ও মুসলিম।

صِفَةُ صَلَاةِ النَّبِيِّ (ص) مِنَ التَّكْبِيْرِ اِلَى التَّسْلِيْمِ كَاَنَّكَ تَرَاهَا ـ

(তাকবীরে তাহরীমা থেকে সালাম ফেরানো পর্যন্ত নবী (সঃ)-এর নামাযের বাস্তব নমুনা)

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন বইটিকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য একনিষ্ঠ ও ইখলাসপূর্ণ করেন এবং আমার মুমিন মুসলমান ভাইদের জন্য তাকে উপকারী বানিয়ে দেন। নিঃসন্দেহে তিনি সর্বাধিক শ্রোতা ও দোআ কবুলকারী।

বইতে অনুসৃত পদ্ধতি

বই-এর বিষয়বস্তু যেহেতু রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রদর্শিত নামায, সেহেতু এটা স্পষ্ট যে, আমি তাতে সুনির্দিষ্ট কোনো মাযহাবের বাঁধা-ধরা নিয়ম অনুসরণ করিনি। আমি অতীত ও বর্তমানের মোহাদ্দেসীনের গৃহীত পদ্ধতি অনুযায়ী কেবল রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত বিষয়গুলোই উল্লেখ করেছি।[৫]

একজন কবি কতই না উত্তম বলেছেন ঃ

'হাদীসের অনুসারীরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অনুসারী, যদিও তারা তাঁর সাহচর্য লাভ করেনি। কিন্তু তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের সাহচর্য লাভ করেছে।'[৬]

---

৫. লাক্ষ্ণৌবী إِمَامُ الْكَلَامِ فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ বই-এর ১৫৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ কেউ যদি ফিক্‌হ এবং উসূলুল ফিকহ শাস্ত্রে গভীর ও নিরপেক্ষভাবে দৃষ্টি দেয়, তাহলে দেখতে পাবে যে, ওলামায়ে কেরাম যে সকল মৌলিক ও অমৌলিক বিষয়ে মতভেদ পোষণ করেন, তাতে অন্যদের চাইতে মোহাদ্দেসীনে কেরামের মতামত অপেক্ষাকৃত বেশী শক্তিশালী। আমি যখন মতভেদগুলো পর্যালোচনা করি, তখন দেখি, মোহাদ্দেসীনে কেরামের মতামত বেশী ইনসাফপূর্ণ। কেননা, তাঁরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ওয়ারিস।

আল্লামা আস্‌সাবকী তাঁর ফতোয়ার ১ম খন্ডের ১৪৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, মুসলমানদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল নামায। প্রত্যেক মুসলমানের উচিত, নামাযের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা এবং ঠিকমত ও নির্দিষ্ট সময়ে তা আদায় করা। তাতে বহু বিষয় আছে যাতে কোন মতভেদ নেই এবং কিছু কিছু বিষয়ে রয়েছে মতভেদ। এই মতভেদ থেকে বাঁচার জন্য সম্ভাব্য উপায়ে চেষ্টা করা দরকার। কিংবা রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে তা গ্রহণ করার চেষ্টা করতে হবে। এরূপ করলে নামায সহীহ হবে এবং তা ঐ নেক আমলের অন্তর্ভুক্ত হবে যার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তোষ অর্জন করা যাবে। আমার দৃষ্টিতে দ্বিতীয় পদ্ধতিটিই গ্রহণ করা জরুরী। কেননা, এর মাধ্যমেই কেবল রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অনুরূপ নামায পড়ার আদেশ কার্যকর করা সম্ভব।

৬. হাসান বিন মোহাম্মদ নাসওয়ায়ী ঐ কবিতা লিখেছেন। ফাযলুল হাদীস ওয়া আহলুহু-যিয়াউদ্দিন আলমাকদেসী।

আশা করি, এ বইতে নামাযের ব্যাপারে হাদীস ও ফিক্‌হ শাস্ত্রের মতভেদগুলোকে জমা করা হবে। অবশ্য তাতে একথা বলা থাকবে না যে, কোন্ কিতাব বা মাযহাব হক ও সত্যপন্থী। ইনশাআল্লাহ, এ বই-এর আমলকারী আল্লাহর হিদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। যাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهِ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ-

অর্থ ঃ 'যে সত্য বিষয়ে তারা মতভেদ পোষণ করে আল্লাহ্ তা বাতলে দিয়েছেন। আল্লাহ যাকে চান সহজ-সরল পথ দেখান।'[৭]

আমি যখন নিজের জন্য সহীহ্ হাদীসকে আঁকড়ে ধরার নীতি গ্রহণ করি এবং এই বই সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করি, তখন আমার এই বিশ্বাস ছিল যে, এর ফলে সকল সম্প্রদায় ও মাযহাবের লোকদের সন্তুষ্ট করা যাবে না। বরং তাদের কেউ কেউ কিংবা অনেকে আমার বিরুদ্ধে সমালোচনা করবে। কিন্তু তাতে কি আসে-যায়? আমার এও ধারণা আছে যে, মানুষের সন্তোষ অর্জন করা সম্ভব নয়। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ

مَنْ اَرْضٰى النَّاسَ بِسَخَطِ اللّٰهِ وَكَلَّهُ اللّٰهُ اِلَى النَّاسِ

অর্থ ঃ 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে লোকদেরকে সন্তুষ্ট করে, আল্লাহ তাকে লোকদের প্রতি সোপর্দ করবেন।'[৮]

কবি কতই না উত্তম বলেছেন ঃ

'আমি সমালোচকদের মুখ থেকে রক্ষা পাবো না, যদিও আমি উঁচু পাহাড়ের কোন গর্তে আশ্রয় নেই না কেন। কোন্ ব্যক্তি মানুষের কাছ থেকে নিরাপদ আছে? যদিও সে শকুনের দুই পাখার ভেতর আশ্রয় নিক না কেন?'

আমার এই বিশ্বাসই আমার জন্য যথেষ্ট যে, আমার এই পদ্ধতিই সঠিক। আল্লাহ্ মুমিনদেরকে এই পদ্ধতিই গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন এবং আমাদের প্রিয় নবী (সঃ)-ও একই পদ্ধতি বাতলে গেছেন। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈ এবং পরবর্তী নেক লোকেরাও একই পন্থা অনুসরণ করেছেন। এদের মধ্যে প্রখ্যাত চার ইমামও রয়েছেন যাদের মাযহাবের সাথে বিশ্বের অধিকাংশ

---

৭. সূরা আল বাকারা ঃ ২১৩ আয়াত।

৮. তিরমিযী। আমি শারহুল আকীদা আত্-তাহাওইয়ায় হাদীসটি বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

মুসলমান সংশ্লিষ্ট। সবাই সুন্নাহ তথা হাদীস আঁকড়ে ধরার বিষয়ে একমত এবং হাদীস বিরোধী বক্তব্য পরিহার করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সেগুলো যত মহান লোকের বক্তব্যই হোক না কেন। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মর্যাদা সর্বাধিক এবং তাঁর পথ যথার্থ ও সঠিক। তাই আমি তাদের পথ অনুসরণ করি, তাদের বক্তব্যের মূল্য দেই এবং হাদীস আঁকড়ে ধরার বিষয়ে তাদের নির্দেশ অনুসরণ করি। তাদের ঐ নির্দেশের ফলে আমার এই সহজ-সরল পথ গ্রহণ সহজ হয়েছে এবং অন্ধ তাকলীদ বা অনুসরণ থেকে রক্ষা পেয়েছি। আল্লাহ আমার পক্ষ থেকে তাদের সবাইকে উত্তম পুরস্কার দান করুন।

হাদীস অনুসরণের বিষয়ে ইমামদের মতামত ও তাদের হাদীস বিরোধী বক্তব্য প্রত্যাখ্যান ঃ

এ বিষয়ে আমরা কিছু আলোচনাকে উপকারী মনে করি। সম্ভবত এর মধ্যে অনুসারীদের জন্য উপদেশ ও নসীহত থাকতে পারে। বরং যারা অন্ধ অনুসরণ করে এবং মাযহাবকে ও মাযহাবের বক্তব্যকে আসমানী ওহীর মতো মনে করে, তাদের জন্য অবশ্যই উপকারী হবে। আল্লাহ বলেছেন ঃ

اِتَّبِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ - وَلَاتَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ -

অর্থ ঃ "তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছ থেকে অবতীর্ণ কিতাবের অনুসরণ করো এবং আল্লাহ ছাড়া আর কোনো বন্ধুর অনুসরণ করো না। তোমরা খুব সামান্যই উপদেশ মেনে চল।" –(সূরা আরাফ ঃ ৩)

১. ইমাম আবু হানীফা (রঃ)

প্রথমে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। তাঁর সাথী-সঙ্গীরা তাঁর বহু কথা বর্ণনা করেছেন। সেগুলোর মূল সুর একটা। সেটা হচ্ছে, হাদীস আঁকড়ে ধরা ওয়াজিব এবং ইমামদের যে সকল রায় হাদীস বিরোধী তা প্রত্যাখ্যান করা জরুরী। তিনি বলেছেন ঃ

১. হাদীস সহীহ হলে সেটাই আমার মাযহাব।'[৯]

---

৯. ইবনে আবেদীন 'আল-হাশিয়া' কিতাবের ১ম খন্ডের ৬৩ পৃষ্ঠা এবং তার 'রাসমুল মুফতী' কিতাবের ১ম খন্ডের ৪র্থ পৃষ্ঠায় একথা উল্লেখ করেছেন। ইবনে আবেদীন ইবনে হাম্মামের 'শারহুল হেদায়াহ' গ্রন্থ থেকে উল্লেখ করেছেন ঃ 'মাযহাবের বিরুদ্ধে বিশুদ্ধ হাদীস পাওয়া গেলে এর ওপরই আমল করতে হবে এবং সেটাই তাঁর মাযহাব। এর ফলে সে হানাফী মাযহাবের অনুসারী হওয়া থেকে বাদ যাবে না।' আমি বলবো, এটা তাদের সর্বোচ্চ তাকওয়া ও জ্ঞানের লক্ষণ। তারা ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন যে, তারা সকল হাদীসের ব্যাপারে অবগত ছিলেন না। ইমাম শাফেঈ (রঃ)-ও অনুরূপ বলে গেছেন। তাদের কোনো মাসআলা সহীহ হাদীস বিরোধী হতে পারে। সে ক্ষেত্রে আমাদেরকে সহীহ হাদীস মতো চলতে হবে।

২. আমরা কোথা থেকে মাসআলা গ্রহণ করেছি, তা জানার আগ পর্যন্ত আমাদের বক্তব্য গ্রহণ করা কারোর জন্য জায়েয নয়।[১০]

আরেক বর্ণনায় ইমাম আবু হানীফার এই বক্তব্য এসেছে, যে ব্যক্তি আমার দলীল-প্রমাণ জানে না, তার জন্য আমার বক্তব্য দিয়ে ফতোয়া দেওয়া হারাম।'

অন্য এক বর্ণনায় তাঁর আরো একটি কথা যোগ করে বলা হয়েছে, 'আমরা মানুষ। আজ যে কথা বলি কাল সে কথা প্রত্যাহার করি।'

আরেক বর্ণনায় এসেছে, 'হে ইয়াকুব (আবু ইউসুফ), তোমার জন্য আফসোস! আমার কাছ থেকে যা শোন সব কিছু লিখ না। কেনন্য, আজ আমি কোনো বিষয়ে একটা মত পোষণ করি আগামীকাল তা ত্যাগ করি আর আগামীকাল যে মত পোষণ করি পরশু তা ত্যাগ করি।[১১]

---

১০. ইবনু আবদিল বার, ১৪৫ পৃঃ। ١. اَلْاِنْتِقَاءُ فِىْ فَضَائِلِ الثَّلَاثَةِ الْاَئِمَّةِ الْفُقَهَاءِ

ইবনুল কাইয়েম, ২য় খন্ড, ৩০৯ পৃঃ। ٢. اِعْلَامُ الْمُوَقِّعِيْنَ.

ইবনু আবেদীন, ষষ্ঠ খন্ড, ২৯৩ পৃঃ। ٣. اَلْحَاشِيَةُ عَلَى الْبَحْرِ الرَّائِقِ.

ইবনু আবেদীন, ষষ্ঠ খন্ড, ২৯-৩২ পৃঃ। ٤. رَسْمُ الْمُفْتِىْ

আশ-শা'রানী, ১ম খন্ড, ৫৫ পৃঃ ইত্যাদি গ্রন্থ। ٥. اَلْمِيْزَانُ.

আমি বলবো, যারা দলীল-প্রমাণ জানে না, তাদের ব্যাপারে যদি এটাই ইমামের বক্তব্য হয়, তাহলে তাদের ব্যাপারে আফসোস! যারা জানেন যে, দলীল এর বিপরীত এবং তদুপরি তারা দলীল বিরোধী ফাতোয়া দেন। এই একটি বক্তব্যই অন্ধ তাকলীদ (অনুসরণ) ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট। সে জন্য কোন কোন হানাফী অন্ধ মোকাল্লেদ এটাকে ইমাম আবু হানীফার বক্তব্য হওয়াকে অস্বীকার করেন।

১১. আমি বলি, শ্রদ্ধেয় ইমাম অধিকাংশ মাসআলায় কেয়াস করেছেন। যখনই তিনি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী অন্য কেয়াস বা হাদীস পেয়েছেন, তখনই আগের কেয়াস ত্যাগ করে পরবর্তীটার উপর আমল করেছেন। এব্যাপারে শা'রানী মীযানের ১ম খন্ডের ৬২ পৃষ্ঠায় যা বলেছেন, সংক্ষেপে তা হচ্ছে ঃ

ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর ব্যাপারে আমার সহ সকল ইনসাফকারীর বিশ্বাস হল, হাদীসসহ ইসলামী শরীআ লিপিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে হাদীসের হাফেযগণ যখন বিভিন্ন দেশের শহর-বন্দর ও গ্রামে ছড়িয়ে পড়েন এবং নিজেদের মিশনে সাফল্য লাভ করেন, তখন পর্যন্ত যদি তিনি জীবিত থাকতেন, তাহলে তিনি তাই গ্রহণ করতেন এবং তিনি যে সকল কেয়াস করেছেন তা ত্যাগ করতেন এবং অন্যান্য মাযহাবের মত তাঁর মাযহাবেও কেয়াস হ্রাস পেত। তাঁর আমলে তাবেঈ এবং তাবয়ে তাবেঈগণ বিভিন্ন শহর ও গ্রামে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

৩. আমার কোনো কথা বা বক্তব্য যদি কোরআন ও হাদীসের বিপরীত হয়, তাহলে আমার বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করো।[১২]

২. মালেক বিন আনাস (রঃ)

১. ইমাম মালেক (রঃ) বলেছেন ঃ আমি মানুষ, ভুল-শুদ্ধ দু'টোই করি। আমার রায় দেখ। যা কোরআন ও সুন্নাহর মোতাবেক তা গ্রহণ কর এবং যা তার বিপরীত তা প্রত্যাখ্যান কর।[১৩]

থাকার কারণে প্রয়োজনের ভিত্তিতে অন্যান্য মাযহাবের তুলনায় কেয়াসের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কেননা, ঐ সকল মাসআলায় তখন হাদীস পাওয়া যায়নি। অন্যান্য মাযহাবের ইমামদের অবস্থা এর ব্যতিক্রম। তাদের আমলে হাদীসের হাফেযগণ শহর ও গ্রামে ছড়িয়ে পড়েন এবং হাদীস সংগ্রহ করে তা লিপিবদ্ধ করেন। ফলে, অন্যান্য মাযহাবের কেয়াসের সংখ্যা হ্রাস পায়।

এ বিষয়ে আল্লামা আবুল হাসানাত তাঁর 'আন-নাফে' আল-কবীর' গ্রন্থের ১৩৫ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আগ্রহী পাঠকরা তা পড়ে দেখতে পারেন।

আমি বলি, যে সকল মাসআলায় ইমাম আবু হানীফা (রঃ) অনিচ্ছাসত্ত্বে সহীহ হাদীসের বিপরীত মতপ্রকাশ করেছেন তা গ্রহণযোগ্য ওযর। কেননা, আল্লাহ কাউকে তার সামর্থের বাইরের বিষয়ে দায়ী করবেন না। সে জন্য তাঁকে বিদ্রুপ করা যাবে না। অনেক জাহেল-মূর্খ লোক অনুরূপ করে থাকে। বরং তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব। কেননা, তিনি মুসলমানদের অন্যতম ইমাম। তাদের ওসীলায় এই দীন সংরক্ষিত আছে এবং আমাদের কাছে পৌঁছেছে। তাঁরা ভুল-শুদ্ধ যাই করুন না কেন, এর বিনিময়ে পুরস্কার পাবেন। তাঁর কোন অনুসারীর জন্যে সহীহ হাদীস বিরোধী তাঁর মাসআলা মানা জরুরী নয়।

১২. আল ইকায-আল ফোলানীঃ পৃঃ ৫০। তিনি এটাকে ইমাম মোহাম্মদের বক্তব্য হিসেবেও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, একথা মোজতাহিদের চাইতে মোকাল্লিদের জন্য বেশী প্রযোজ্য। আমি বলি, এই কথার ওপর ভিত্তি করে শা'রানী মীযান গ্রন্থের ১ম খন্ডের ২৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

যদি কেউ বলে, আমার ইমামের মৃত্যুর পর সহীহ হাদীস পেলে তা দিয়ে আমি কি করবো? এর জওয়াব হচ্ছে, তার উচিত সহীহ হাদীস মোতাবেক আমল করা। কেননা, ইমাম জীবিত থাকলে তাকে তাই আদেশ করতেন। সকল ইমাম শরীয়তের অনুসারী। কেউ যদি বলে, যেহেতু ইমাম গ্রহণ করেননি সেজন্য আমি সহীহ হাদীস গ্রহণ করবো না এটাই অধিকাংশ মোকাল্লিদের মনোভাব-তারা বিরাট কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। তাদের উচিত, ইমামের উপদেশ অনুযায়ী সহীহ হাদীসের উপর আমল করা। আমাদের বিশ্বাস, ইমামরা জীবিত থাকলে তারা সহীহ হাদীস মেনে চলতেন এবং নিজেদের কেয়াস ত্যাগ করতেন।

১৩.আল-জামে'-ইবনু আবদিল বার, ২য় খন্ড, ৩২ পৃঃ। উসূলুল আহকাম-ইবনে হাযম, ষষ্ঠ খন্ড, ১৪৯ পৃঃ। আল-ফোলানী ঃ ৭২ পৃঃ।

২. রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পর এমন কোনো ব্যক্তি নেই যার কথা ও কাজ সমালোচনার উর্ধে। একমাত্র রসূলুল্লাহ (সঃ)-ই সমালোচনার উর্ধে।[১৪]

৩. ইবনু ওহাব বলেছেন, আমি ইমাম মালেকের উযুর মধ্যে দুই পায়ের আঙ্গুল খেলাল করার বিষয়ে এক প্রশ্ন করতে শুনেছি। তিনি উত্তরে বলেন, লোকদের জন্য এটার প্রয়োজন নেই। ইবনু ওহাব বলেন, আমি মানুষ কমে গেলে তাঁকে নিরিবিলি পেয়ে জিজ্ঞেস করি, তাতো আমাদের জন্য সুন্নাহ। ইমাম মালেক বলেন, সেটা কি? আমি বললাম, আমরা লাইস্ বিন সা'দ, ইবনু লোহাইআ', আমর বিন হারেস, ইয়াযিদ বিন আমর আল-মাআফেরী, আবু অবাদুর রহমান আল-হাবালী এবং আল মোস্তাওরাদ বিন শাদ্দাদ আল কোরাশী-এই সূত্র পরম্পরা থেকে জানতে পেরেছি যে, শাদ্দাদ আল কোরাশী বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে কনিষ্ঠ আঙ্গুল দিয়ে দুই পায়ের আঙ্গুল খেলাল করতে দেখেছি। ইমাম মালেক বলেন, এটাতো সুন্দর (হাসান) হাদীস। আমি এখন ছাড়া আর কখনও এই হাদীসটি শুনিনি। তারপর যখনই তাঁকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে, তখনই তাঁকে পায়ের আঙ্গুল খেলাল করার আদেশ দিতে আমি শুনেছি।[১৫]

৩. ইমাম শাফেঈ (রঃ)

এ বিষয়ে ইমাম শাফেঈ থেকে অনেক সুন্দর কথা বর্ণিত আছে এবং তাঁর অনুসারীরা তা সর্বাধিক আমল করেছে।[১৬]

তিনি বলেছেন ঃ

১. তোমাদের কারোর কাছ থেকে যেন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সুন্নাহ ছুটে না যায়। আমি যতো কিছুই বলে থাকি তা যদি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাদীসের পরিপন্থী হয়, তাহলে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কথাই আমার কথা।[১৭]

---

১৪. ইরশাদুস সালেক ঃ ইবনু আবদিল হাদী, ১ম খন্ডঃ ২২৭ পৃঃ। আল-জামে'-ইবনু আবদিল বার, ২য় খন্ড, ৯১ পৃঃ। উসুলুল আহকাম-ইবনু হাযম, ষষ্ঠ খন্ড ঃ ১৪৫-১৭৯ পৃষ্ঠা। আল-ফাতাওয়া-আস্‌সাবকী, ১ম খন্ড ঃ ১৪৮ পৃঃ।

১৫. মোকাদ্দামা আল জারাহ ওয়াত তা'দীল-ইবনু আবি হাতেম ঃ ৩১-৩২ পৃঃ।

১৬.ইবনু হাযম বলেছেন ঃ যে সকল ফকীহ তার অনুসারীদেরকে অন্ধ অনুসরণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন তাদের মধ্যে ইমাম শাফেঈ অন্যতম। তিনি তাকলীদ করতে একেবারেই নিষেধ করেছেন এবং পরবর্তী লোকদের যে কোন (আচার) বক্তব্যের সত্যতা যাঁচাই করে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন।

১৭. হাকেম তা বর্ণনা করেছেন। তারীখে দিমাশ্‌ক—ইবনে আসাকির। ইকায পৃঃ ১০০ এবং ইলামুল মোকেঈন, ২য় খন্ড, ৩৬৩-৩৬৪ পৃঃ।

২. একথার উপর মুসলমানদের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, যখনই কারোর সামনে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কোনো কথা প্রকাশ পায়, তখনই তার জন্যে অন্য কোনো লোকের কথার ভিত্তিতে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাদীস ত্যাগ করা জায়েয নয়।[১৮]

৩. তোমরা যদি আমার কিতাবে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সুন্নাহ বিরোধী কোনো কিছু পাও, তাহলে আমার ঐ কথা ত্যাগ কর। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, তাহলে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ঐ হাদীসকে অনুসরণ কর এবং অন্য কারো কথার প্রতি নজর দিও না।[১৯]

৪. সহীহ ও বিশুদ্ধ হাদীসই আমার মাযহাব।[২০]

৫. আপনারা হাদীস ও রিজাল শাস্ত্রে আমার চাইতে বেশী জ্ঞাত। সহীহ হাদীসের সন্ধান পেলে আমাকে জানাবেন। বর্ণনাকারী কুফা, বসরা ও সিরিয়ার যেই হোক না কেন, হাদীস সহীহ হলে আমি তার কাছে যাবো।[২১]

---

১৮. ইবনুল কাইয়েম, ২ খন্ড ঃ ৩৬১ পৃঃ এবং আলফোলানী ঃ ৬৮ পৃঃ।

১৯. আল-হারাওয়ায়ী জাম্মুল কালাম, ৩য় খন্ডঃ পৃষ্ঠা ১ ও ৪৬। আল ইহতিজাজ বিশ-শাফেঈ-খাতীব, ৮ম খন্ড, পৃঃ ২। ইবনু আসাকির খন্ড ১৫, পৃঃ ৯। আল-মাজমু আন-নববী-১ম খন্ড, ৬৩ পৃষ্ঠা। ইবনুল কায়েম-২য় খন্ডঃ ৩৬১ পৃঃ। আল-ফোলানী-পৃঃ ১০০ এবং আল-হিলাইয়া-আবু নাঈম, ৯ম খন্ডঃ ১০৭ পৃঃ।

২০. আল-মাজমু-আন-নববী। আশশারানী-১ম খন্ড, ৫৭ পৃঃ। তিনি এটাকে হাকেম এবং বায়হাকীর দিকে সম্বোধন করেছেন। আল ফোলানীঃ ১০৭ পৃঃ। শারানী বলেছেন, ইবনু হাযমের মতে, তিনি সহ অন্য ইমামদের কাছেও এটা সহীহ। ইমাম নববী যা বলেছেন তার সারসংক্ষেপ হল ঃ

আমাদের সাথীরা হাই তোলার ব্যাপারে এই রকম আমল করেছেন। তারা রোগসহ বিভিন্ন ওযরের কারণে ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার শর্তের বিষয়েও হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। আমাদের পুরাতন সাথীরা কোনো মাসআলায় হাদীস পেলে এবং শাফেঈ মাযহাব এর বিপরীত থাকলে হাদীস অনুযায়ী আমল করতে বলতেন। যা হাদীস মোতাবেক তাই শাফেঈর মাযহাব। আসসাবকী বলেছেন, হাদীসের অনুসরণ করাই উত্তম। কেউ যদি নিজেকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে উপস্থিত মনে করে, তাহলে তার পক্ষে কি হাদীস মোতাবেক আমল না করে উপায় আছে?

২১. ইমাম আহমদকে সম্বোধন করে এ কথাগুলো তিনি বলেছেন। আদাবুশ শাফেঈ-ইবনু আবি হাতেম ঃ পৃঃ ৯৪-৯৫। আল হিলইয়া-আবু নাঈম, ৯, খন্ড, পৃঃ ১০৬। ইবনে আসাকির, ইবনু আবদিল বার, ইবনুল জাওযী এবং আল-হারওয়ায়ী নিজ নিজ কিতাবে তা উল্লেখ করেছেন।

বায়হাকী বলেছেন, ইমাম শাফেঈ প্রায়ই হাদীসের উপর আমল করেছেন। তিনি হেজায, সিরিয়া, ইয়েমেন এবং ইরাকের আলেমদেরকে জমা করে নির্দ্বিধায় সহীহ বর্ণনাগুলো গ্রহণ করেছেন।

৬. আমি যা বলেছি তার বিপরীত যদি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কোনো হাদীস কারো নিকট বিদ্যমান থাকে, তাহলে আমি আমার জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থাতেই ঐ হাদীসের দিকে ফিরে আসবো।[২২]

৭. তোমরা যদি আমাকে কোনো কথা বলতে দেখ এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে এর বিপরীত রিওয়ায়াত পাও, তাহলে জেনে রাখ আমার জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পেয়েছে।[২৩]

৮. আমি যা বলেছি তার বিপরীত রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর থেকে কোনো সহীহ বর্ণনা থাকলে নবীর হাদীসই উত্তম, তখন তোমরা আমার তাকলীদ করবে না।[২৪]

৯. রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাদীসই আমার কথা–যদিও সেই হাদীস আমার কাছ থেকে শুনতে পাওনি।[২৫]

৪ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল

ইমামদের মধ্যে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল সর্বাধিক হাদীস সংগ্রহকারী ও হাদীসের উপর আমলকারী। তিনি শাখা-প্রশাখা মাসআলা ও রায়ের (ইজতিহাদের) উপর ভিত্তি করে কোন গ্রন্থ রচনা করাকে অপছন্দ করতেন।[২৬]

তিনি বলেছেন ঃ

১. তোমরা আমার, ইমাম মালেক, শাফেঈ আওযাঈ এবং সুফিয়ান ছাওরীর তাকলীদ (অন্ধ আনুগত্য) করবে না। বরং তারা যে উৎস থেকে গ্রহণ করেছেন তুমিও সেই উৎস থেকেই গ্রহণ কর।[২৭]

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, তুমি তোমার দীনের বিষয়ে তাদের কারো অন্ধ আনুগত্য কর না। রসূলুল্লাহ (সঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা গ্রহণ কর। তারপর তাবেঈদের কাছ থেকে গ্রহণ কর এবং এ বিষয়ে ব্যক্তির স্বাধীনতা রয়েছে। তিনি একবার বলেছেন ঃ 'অনুসরণ বলতে বুঝায় রসূলুল্লাহ (সঃ) ও সাহবায়ে কেরাম থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তার অনুসরণ

---

২২. হিলইয়া-আবু নাঈম, ৯ম খন্ড, ১০৭ পৃঃ। আল হারওয়ারী ৪৭ পৃঃ। ইবনুল কাইয়েম-ইলামুল মোকেয়ীন, ২য় খন্ড, পৃঃ ৩৬৩ এবং আল ফোলানী, পৃঃ ১০৪।

২৩. আদাব-ইবনু আবি হাতেম, পৃঃ ৯৩। আল-আমালী, আবুল কাসেম সমরখন্দী। হিলইয়া-আবু নাঈম, ৯ম খন্ড, পৃঃ ১০৬ এবং ইবনু আসাকির।

২৪. ইবনু আবি হাতেম, আবু নাঈম ও ইবনু আসাকির।

২৫. ইবনু আবি হাতেম পৃঃ ৯৩-৯৪।

২৬. আল মানাকেব-ইবনুল জাওযী, পৃঃ ১৯২।

২৭. আল-ফোলানী, পৃঃ ১১৩। ইবনুল কাইয়েম-ই'লাম, ২য় খন্ডঃ পৃঃ ৩০২।

করা।' তারপর তাবেঈদের কাছ থেকে বর্ণিত বিষয় মানা-না মানার ব্যাপারে ব্যক্তির স্বাধীনতা রয়েছে।[২৮]

২. আওযাঈ'; ইমাম মালেক ও ইমাম আবু হানীফার রায় তাদের নিজস্ব রায় বা ইজতিহাদ। আমার কাছে এসবই সমান। তবে দলীল হল আছার অর্থাৎ সাহাবী ও তাবেঈগণের কথা।[২৯]

৩. যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করে, সে ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে আছে।[৩০]

হাদীস অনুসরণের ব্যাপারে এবং অন্ধ আনুগত্য থেকে দূরে থাকার জন্য এই হচ্ছে ইমামগণের মন্তব্য ও বক্তব্য। তাদের বক্তব্যগুলো এত স্পষ্ট ও পরিষ্কার যে, এর জন্য কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দরকার কিংবা বির্তকের অবকাশ নেই। এর ভিত্তিতে বলা যায় যে, হাদীস অনুসরণের কারণে নিজ ইমামের মাযহাবের রায়ের বিপরীত হলেও কেউ মাযহাব বিচ্যুত হয় না। বরং সে নিজ মাযহাবেরই অনুসারী থাকে।

তবে যে ব্যক্তি শুধু ইমামদের কথার দোহাই দিয়ে হাদীসের বিরোধিতা করে, সে ব্যক্তি কিছুতেই অটুট রজ্জু আঁকড়ে ধরে নেই। বরং এই অনমনীয় মনোভাবের কারণে সে ইমামদের নাফরমানীই করে এবং তাদের কথার বিরোধিতা করে।

আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـ

(سورة النساء : ٦٥)

অর্থ ঃ "আপনার রবের কসম। তারা সেই পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না যে পর্যন্ত আপনাকে তাদের ঝগড়ার সালিশে বিচারক না বানায়, আপনার ফয়সালার ব্যাপারে অন্তরে কুণ্ঠা বোধ না করে এবং আপনার রায় প্রশান্ত চিত্তে মেনে না নেয়।" (সূরা আন নিসা ঃ ৬৫)

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖٓ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْيُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ

---

২৮. মাসায়েলে ইমাম আহমদ, পৃঃ ২৭৬-২৭৭।

২৯. ইবনু আবদিল বার-আল-জামে, ২য় খন্ড ঃ পৃঃ ১৪৯।

৩০. ইবনুল জাওযী পৃঃ ১৮২,

অর্থ ঃ 'যারা আল্লাহর আদেশের বিরোধিতা করে, তাদের এ বিষয়ে ভয় করা জরুরী যে, তারা দুনিয়ায় গযব কিংবা আখেরাতে কষ্টদায়ক আযাবের সম্মুখীন হবে।৩১.ক

হাফেয ইবনে রজব (রঃ) বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বাণী যাদের কাছে পৌছেছে এবং যারা তা জানতে পেরেছেন, তাদের কর্তব্য হল উম্মাহর কাছে তা বর্ণনা করা, তাদেরকে উপদেশ দেয়া এবং রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বাণীর আনুগত্য করার আদেশ দেয়া যদিও তা উম্মাহর মহান ব্যক্তিদের রায়ের বিপরীত হয়। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আদেশের মর্যাদা অন্য যে কোনো ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মতের মর্যাদার চাইতে শ্রেষ্ঠতর। কেননা, কোন মহান ব্যক্তিত্বও ভুল করে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আদেশের বিরোধিতা করতে পারেন। এ কারণেই সাহাবায়ে কেরামসহ পরবর্তী উত্তরসূরীরা সহীহ হাদীস বিরোধীকোনো কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। কোনো কোনো সময় তাঁরা কঠোর ভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।৩১.খ

তবে তা বিদ্বেষের কারণে নয়। সম্মানিত ব্যক্তির প্রতি ভালবাসা অব্যাহত রেখেই কঠোর অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন। কেননা, আল্লাহর রসূল ছিলেন তাদের কাছে সর্বাধিক প্রিয় এবং তাঁর আদেশ ছিল সৃষ্টিজগতের সব কিছুর উর্ধে। যখন রসূলের (সঃ) বাণীর সাথে অন্য কারোর কথা সংঘর্ষমুখর হয়, তখনই অন্যদের কথার ওপর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কথার শ্রেষ্ঠত্ব দান করে তার আনুগত্য করা হয়। রসূল (সঃ)-এর কথার পরিপন্থী হওয়ার কারণে তা

---

৩১ ক. সূরা নূর ঃ ৬৩।

৩১ খ. আমি বলি এমনকি তারা নিজেদের বাপ কিংবা ওলামায়ে কেরামের কথাও কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ইমাম তাহাওয়ী শরহে মাআ'নীল আছার গ্রন্থের ১ম খন্ডের ৩৭২ পৃঃ এবং আবু ইয়া'লী নিজ মোসনাদ গ্রন্থের ৩য় খন্ডে ১৩১৭ পৃষ্ঠায় সালেম বিন আবদুল্লাহ বিন ওমার থেকে নির্ভরযোগ্য সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন। আমি মসজিদে নবওয়ীতে আবদুল্লাহ বিন ওমার (রাঃ)-এর সাথে বসা ছিলাম। তখন সিরিয়া থেকে এক লোক এসে তাঁকে হজ্জে তামাত্তু সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। ইবনে ওমার উত্তরে বলেন,, তা ভাল ও উত্তম। তখন লোকটি বলে আপনার আব্বা ও মা কি তা করতে নিষেধ করতেন ? ইবনে ওমার বলেন, তোমার জন্য আফসোস! রসূলুল্লাহ (সঃ) যা করেছেন আমার বাপ তা নিষেধ করলে তুমি কোন্‌টা মানবে? লোকটি বলে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর টাই মানবো। ইবনে ওমার বলেন এবার এখান থেকে যাও।

কোনো সম্মানিত লোকের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে অন্তরায় নয়। এ ব্যক্তি আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রাপ্ত।[৩১.গ]

কেননা, তার কাছে রসূলের বাণী সুস্পষ্ট হলে তিনি বিনা দ্বিধায় তা মেনে নেবেন।[৩২]

আমি বলি, তারা কি করে ভুল সংশোধনকে অপছন্দ করবে। অথচ তাদেরকে রসূলের আনুগত্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং রসূলুল্লাহর হাদীস বিরোধী কথা ও কাজ প্রত্যাহার করাকে জরুরী ঘোষণা করা হয়েছে। বরং ইমাম শাফেঈ নিজ সঙ্গীদেরকে সহীহ্ হাদীস তাঁর দিকে সম্বোধন করার নির্দেশ দিয়েছেন। যদিও তারা সেই হাদীস তার কাছ থেকে গ্রহণ করেননি কিংবা বিপরীত হাদীসই গ্রহণ করেছেন। সেজন্য ইবনু দাকীক আল-ঈদ যখন চার মাযহাবের একক কিংবা সামষ্টিক সহীহ হাদীস বিরোধী মাসআলাগুলো এক বিরাট খন্ডে জমা করেন, তখন তিনি এর ভূমিকায় বলেন ঃ

এই মাসআলাগুলোকে চার ইমামের দিকে সম্বোধন করা হারাম। তাদের অনুসারী ফকীহদের উচিত সেগুলো জানা এবং ইমামদের দিকে সেগুলোকে সম্বোধন না করা। যেন তাদের দিকে মিথ্যাকে সম্বোধন করা না হয়।[৩৩ ক]

ইমামদের হাদীস বিরোধী বক্তব্যে ছাত্রদের ভূমিকা

বিশুদ্ধ হাদীস অনুসরণের উদ্দেশ্যে অনেক ছাত্র নিজ ইমামদের সকল কথা গ্রহণ করেননি। তারা ইমামদের সহীহ হাদীস পরিপন্থী বহু বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছেন। এমন কি হানাফী মাযহাবের দুই ইমাম মোহাম্মদ ও আবু ইউসুফ নিজ ওস্তাদ আবু হানীফা (রঃ)-এর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মতের ক্ষেত্রে ভিন্ন মত প্রদান করেছেন।

তারা তা বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে বহু শাখা-প্রশাখা মাসআলা আলোচনা করেছেন।[৩৩ খ]

---

৩১ গ. আমি বলি শুধু ক্ষমাপ্রাপ্তই নয় বরং পুরস্কৃতও। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন

إِذَاحَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَاصَابَ فَلَهُ اَجْرَانِ وَإِذَاحَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَاَخْطَأَ فَلَهُ اَجْرٌ وَّاحِدٌ ـ

অর্থঃ শাসক রায় দেয়ার সময় যদি ইজতিহাদ করে এবং সঠিক রায় দেয় তাহলে তার সওয়াব দ্বিগুণ হবে। আর যদি ইজতিহাদ করা সত্ত্বেও ভুল রায় দেয় তথাপি এক গুণ সওয়াব পাবে। (বোখারী ও মুসলিম)

৩২. ঈকাযুল হিসাম পৃঃ ৯৩।

৩৩. ক. আল-ফোলানী, পৃঃ ৯৯।

৩৩. খ. তিনি ইমাম শাফেয়ী'র আল-উম্মু কিতাবের টীকায় মুদ্রিত শাফেয়ী' ফেকহের প্রথম সংক্ষিপ্ত কিতাবে বলেছেন, আমি মোহাম্মদ বিন ইদরিস শাফেয়ী'র অবগতি সাপেক্ষে এই সংক্ষিপ্ত ফেকাহ রচনা করেছি। তাঁর এই কথার অর্থ হল শাফেয়ী (রঃ) তাঁর ইচ্ছাকে অনুমোদন করেছেন এবং তিনি অন্যের অন্ধ অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন যাতে করে প্রত্যেকেই নিজের দীনের প্রতি লক্ষ্য রাখে এবং নিজের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করে।

শাফেঈ মাযহাবের ইমাম মোযানীসহ অন্যান্য অনুসারীর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।[৩৪]

আমরা এই বিষয়ে আরো উদাহরণ দিলে আলোচনা দীর্ঘায়িত হবে এবং বিষয়বস্তুকে সংক্ষিপ্ত করার অভীষ্ট লক্ষ্য থেকে বিচ্যুতি ঘটবে। এজন্য আমরা মাত্র দু'টি উদাহরণ দিয়ে এ বিষয়ে আলোচনা শেষ করবো।

১. ইমাম মোহাম্মদ তাঁর মোআত্তা গ্রন্থের ১৫৮ পৃষ্ঠায় বলেছেন ঃ আবু হানীফা (রঃ) এস্তেস্কার (বৃষ্টি প্রার্থনায়) নামায পড়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেননি। কিন্তু আমাদের মত হল, ইমাম লোকদের নিয়ে জামাতে দুই রাক'আত নামায পড়বেন, তারপর দোআ করবেন ও নিজ চাদর উল্টিয়ে পরবেন।[৩৫]

২. ইমাম মোহাম্মদের সাথী এবং ইমাম আবু ইউসুফের ছাত্র ইসাম বিন ইউসুফ আল-বালখী বহু বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর বিপরীত ফতোয়া দিয়েছেন।[৩৬] প্রথমে ইসামের দলীল জানা ছিল না। পরবর্তীতে দলীল জেনে তিনি বিপরীত ফতোয়া দিয়েছেন।[৩৭] তাই তিনি রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে উঠার সময় দুই হাত উপরে উঠাতেন।[৩৮] এমনটি করার কথা রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বহুসংখ্যক বর্ণনাকারী দ্বারা বিভিন্ন যুগে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ এটি হাদীসে মোতাওয়াতের। ঐ হাদীসের উপর আমল করতে তার কোনো অসুবিধে হয়নি। যদিও তাঁর তিনজন ইমামই এর বিপরীত মত পোষণ করেছেন। সকল মুসলমানের উচিত হল চার ইমামসহ অন্যদের ব্যাপারে ঐ রকম সাক্ষ্য দান করা।

সারকথা ঃ আমি আশা করবো মাযহাবের কোনো অন্ধ অনুসারী যেন এই বইয়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সমালোচনা না করেন এবং তার নিজ মাযহাবের বিরোধী বলে এ বইতে বর্ণিত রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাদীস থেকে উপকৃত

---

৩৪. আল-হাশিয়া-ইবনু আবেদীন, ১ম খন্ড, ৬২ পৃঃ। লক্ষ্মবী আন-নাফে' আল কবীর গ্রন্থের ৯৩ পৃঃ এটাকে ইমাম গাযযালীর বক্তব্য বলে উল্লেখ করেছেন।

৩৫. তিনি এ গ্রন্থে ২০টি মাসআলায় ইমাম আবু হানীফার সাথে দ্বিমতের কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলো তাঁর গ্রন্থের নিম্নোক্ত পৃষ্ঠায় রয়েছে ঃ ৪২, ৪৪, ১০৩, ১২০, ১৫৮, ১৬৯, ১৭২, ১৭৩, ২২৮, ২৩০, ২৪০, ২৪৪, ২৭৪, ২৭৫, ২৮৪, ৩১৪, ৩৩১, ৩৩৮, ৩৫৫, ৩৫৬।

৩৬. আল ফাওয়ায়েদ আল বাহিয়্যাহ ফী তারাজিমিল হানাফিয়্যা ঃ পৃঃ ১১৬।

৩৭. আল-বাহরুর রায়েক, ষষ্ঠ খন্ড, ৯৩ পৃঃ। রাসমুল মুফতী, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৮।

৩৮. আল ফাওয়ায়েদ, পৃঃ ১১৬। এরপর তিনি মন্তব্য করেন, মযবুত দলীলের ভিত্তিতে ইমামের তাকলীদ ত্যাগ করলেও জাহেল লোকেরা সমালোচন করে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আল্লাহর কাছে রইল।

হওয়ার চেষ্টা ত্যাগ না করেন। আমি আশা করবো তারা হাদীসের উপর আমলের জরুরত স্মরণ রাখবেন। মত-পার্থক্যের সময় আমাদেরকে হাদীসের দিকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ বলেছেন ঃ "তোমার রবের কসম, তারা কখনও ঈমানদার হবে না যে পর্যন্ত না তোমাকে নিজেদের ঝগড়া-বিবাদের ফয়সালায় সালিস মানে, পরে তোমার ফয়সালার বিষয়ে নিজেদের অন্তরে কোনো দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সন্তুষ্টি সহকারে তোমার ফয়সালা মেনে না নেয়।" (সূরা নিসা ঃ ৬৫)

আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদের সবাইকে ঐ সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত করেন, যাদের বিষয়ে আল্লাহ বলেছেন,

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ۔

অর্থ ঃ "মুসলমানদেরকে যখন কোন বিষয়ে ফয়সালার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে আহ্বান করা হয়, তখন তো তাদের কথা এই হয় যে, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম এবং তারাই সফলকাম।" (সূরা নূর ঃ ৫১)

একটি সন্দেহের জওয়াব

দশ বছর পূর্বে লেখা আমার বই-এর এ ভূমিকা দ্বারা যুবক মোমেনদের মনে সাড়া জেগেছে। তাতে তাদেরকে ইসলামের নির্ভুল উৎস কোরআন ও হাদীসের দিকে ফিরে আসার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে দাওয়াত দেয়া হয়েছে। আল হামদু-লিল্লাহ্‌ এর ফলে হাদীসের উপর আমলকারী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তারা এমর্মে অন্যদের কাছে পরিচিতিও হয়েছে। তা সত্ত্বেও আমি কিছু লোকের মধ্যে এ বিষয়ে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে স্থবিরতা লক্ষ্য করেছি। এতে আর কি সন্দেহ থাকতে পারে, যেখানে আমি কোরআন, হাদীস ও ইমামদের বক্তব্যের বরাত দিয়ে প্রমাণ করেছি যে, সবাইকে কোরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু কিছু সংখ্যক অনুসারী তাদের অনুসৃত মোকাল্লাদ শেখদের বিভিন্ন কথা দ্বারা সংশয়ের আবর্তে দিন কাটাচ্ছেন। তাই আমি ঐ সকল সন্দেহ-সংশয়ের জওয়াব দেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। আশা করি এর ফলে তারা হাদীসের অনুসরণ করতে আরো বেশি অনুপ্রাণিত হবেন। এখন আমরা নিম্নোক্ত সন্দেহগুলোর জওয়াব দেবো ঃ

১. কেউ কেউ বলেন, দীনী ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্‌র জীবন ও চরিত্রের দিকে প্রত্যাবর্তন করা খুবই জরুরী। বিশেষ করে নামাযের মত বাধ্যতামূলক নিরেট

ইবাদতসমূহে যেখানে ইজতিহাদ ও ব্যক্তিগত মতের কোনো স্থান নেই, সেক্ষেত্রে তা আরো বেশি প্রযোজ্য। কিন্তু আমরা কোনো মোকাল্লেদ (অনুসারী) আলেম ও শেখকে এ বিষয়ে আদেশ দিতে দেখি না বরং তারা মতভেদকে মেনে নেন। তাদের ধারণা এটা মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি কনসেশন বা রেয়াত। তারা নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন ঃ

اِخْتِلاَفُ اُمَّتِىْ رَحْمَةٌ

অর্থ ঃ 'আমার উম্মতের মধ্যকার মতভেদ রহমত স্বরূপ।' এই হাদীস আপনি যে পদ্ধতির দিকে আহ্বান জানান তার বিপরীত। এ ব্যাপারে আপনার জওয়াব কি?

এই প্রশ্নের দু'টি উত্তর আছে।

প্রথমত হাদীসটি সহীহ নয় বরং তা বাতিল এবং এর কোন ভিত্তি নেই। আল্লামা সাবকী বলেছেন ঃ আমি এই হাদীসের কোনো সহীহ সনদ খুঁজে পাইনি। এমনকি এর কোনো দুর্বল ও মাওযু (মিথ্যা) সনদও নেই। অর্থাৎ এটি আদৌ হাদীস নয়।

এক্ষেত্রে আরো দু'টো হাদীস উল্লেখ করা হয়। সেগুলো হল ঃ

١. اِخْتِلاَفُ اَصْحَابِىْ لَكُمْ رَحْمَةٌ ـ

٢. اَصْحَابِىْ كَالنُّجُوْمِ فَبِاَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ ـ

১. 'আমার সাহাবীদের মতপার্থক্য রহমত স্বরূপ।'

২. আমার সাহাবীরা তারার মত। তাদের যে কাউকে অনুসরণ করবে হেদায়াত লাভ করবে।'

এই দু'টো হাদীসই সহীহ নয়। প্রথমটা খুবই দুর্বল এবং দ্বিতীয়টা মাওযু বা অসত্য হাদীস। আমি এ বিষয়ে আমার 'সিলসিলাতুল আহাদীস আযযাঈফা ওয়াল মাওযুআহ' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। (নম্বর যথাক্রমে ৫৮,৫৯, ৬১)

প্রথম হাদীসটি একদিকে দুর্বল, অন্যদিকে তা কোরআনের বিপরীত। কোরআন বলেছে তোমরা দীনী বিষয়ে মতভেদ কর না, বরং তাতে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা কর। যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوْا رِيْحَكُمْ . (الانفال ـ ٤٦)

অর্থ ঃ "তোমরা ঝগড়া ও মতবিরোধ কর না, তাহলে তোমাদের শক্তি চলে যাবে ও তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে।" (সূরা আনফাল ঃ ৪৬)

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ-مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ- (الروم- ٣١-٣٢)

অর্থ ঃ "তোমরা ঐ সকল মোশরেকের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না যারা নিজেদের দীনকে শতধা বিচ্ছিন্ন করে বহু দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক দল নিজেদের কাছে যা আছে তা নিয়ে খুশী।' (সূরা রূম ঃ ৩১-৩২)

আল্লাহ্‌ বলেন ঃ

وَلَايَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ-إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ (هود- ١١٨+١١٩)

অর্থ ঃ "আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্যরা মতভেদ অব্যাহত রেখেছে।" (সূরা হুদ ঃ ১১৮+১১৯)

যাদের উপর আল্লাহর রহমত হয়েছে, তারা মতভেদ করে না, বরং বাতিল পন্থীরাই মতভেদ করে। তাহলে কি করে ধারণা করা যায় যে, মতভেদ ও মতপার্থক্য দ্বারা রহমত আসবে?

এটা প্রমাণিত হল যে, বর্ণিত হাদীসগুলো সহীহ নয়, সনদ বা মূল বাক্য কোনটাই বিশুদ্ধ নয়।৩৯ এটা দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইমামরা যে হাদীস ও কোরআন অনুসরণের নির্দেশ দিয়ে গেছেন, এতো দুর্বল শোবা-সন্দেহের কারণে তার উপর আমল করা থেকে বিরত থাকা জায়েয হবে না।

২. কেউ কেউ প্রশ্ন করেন দীনী বিষয়ে যদি মতপার্থক্য নিষিদ্ধ হয়, তাহলে সাহাবায়ে কেরাম ও পরবর্তীতে ইমামদের মতপার্থক্য সম্পর্কে কি জওয়াব আছে? তাদের মতভেদের সঙ্গে কি পরবর্তী লোকদের মতপার্থক্যের কোন ব্যবধান আছে?

এর জওয়াব হচ্ছে, হাঁ, উভয় দলের মতভেদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে। ঐ মত পার্থক্য দুই ভাবে বিবেচনা করতে হবে। একটি হচ্ছে, মতপার্থক্যের কারণ আর অন্যটি হচ্ছে তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব।

---

৩৯. কেউ ইচ্ছা করলে আমার উপরোক্ত গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পড়তে পারেন।

সাহাবায়ে কেরামের মতপার্থক্য ছিল জরুরত ভিত্তিক এবং তাঁদের বুঝ-শক্তির স্বাভাবিক পার্থক্য। ইচ্ছাকৃত ভাবে তাঁরা মতপার্থক্য করেননি। তাঁদের যুগে আরো কিছু বিষয়ও এর সঙ্গে যোগ হয়েছিল। প্রথমে মতভেদ দেখা দিলেও পরে তা দূর হয়ে গেছে।[৪০] ঐ জাতীয় মতপার্থক্য থেকে পুরো মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। তারা উপরে বর্ণিত আয়াতে নিন্দারযোগ্য নয় এবং তারা শাস্তিও পাবেন না। কেননা, শাস্তির জন্য যে ইচ্ছা ও পুনরাবৃত্তি দরকার তা তাদের বেলায় অনুপস্থিত।

পক্ষান্তরে, অনুসারী বা মোকাল্লেদদের মতভেদের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য কোনো ওযর নেই। তাদের কিছু সংখ্যকের জন্য কোরআন ও হাদীস থেকে এমন সুস্পষ্ট দলীল পেশ করা যায়, যা অন্য কোনো মাযহাবের মতকে সমর্থন করে। তা সত্ত্বেও যদি তা ভিন্ন মাযহাবের অজুহাতে ত্যাগ করে, তাহলে বুঝতে হবে তার কাছে মাযহাবটাই আসল কিংবা সেটাই একমাত্র দীন। যে দীন নবী করীম (সঃ) দুনিয়ায় নিয়ে এসেছেন এবং অন্যান্য মাযহাব ভিন্ন এবং বাতিল দীন। নাউযুবিল্লাহ।

মূলত এক মাযহাবের কোনো অনুসারী অন্য যে কোনো মাযহাব থেকে যা ইচ্ছা ও যতটুকু ইচ্ছা ততোটুকু গ্রহণ করতে পারে এবং নিজ মাযহাব থেকেও যতটুকু ইচ্ছা ততোটুকু ছাড়তে পারে। কেননা, সবটুকুই এবং সব মাযহাবই শরীআহ বা আল্লাহর আইন ভিত্তিক। তাতে কোনো অসুবিধে নেই। বাতিল হাদীসের উপর ভিত্তি করে মতভেদের উপর অর্থহীনভাবে অটল থাকার কোনো যুক্তি নেই। মতভেদের বিষয়ে অনেক ওলামায়ে কেরাম মন্তব্য করেছেন। তাদের মন্তব্যগুলো হচ্ছে ঃ

ইবনুল কাসেম বলেছেন ঃ আমি ইমাম মালেক এবং ইমাম লাইসকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবায়ে কেরামের মতপার্থক্যের বিষয়ে আলোচনা করতে শুনেছি। তাঁরা বলেন, লোকেরা বলে, তাতে প্রশস্ততা ও উদারতা রয়েছে। আসলে সে রকম নয়। আসলে তা ছিল ভুল ও শুদ্ধ কাজ।[৪১]

আশহাব বলেন ঃ ইমাম মালেককে প্রশ্ন করা হয়েছিল, যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নির্ভরযোগ্য (ছেকা) সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাতে কি প্রশস্ততা ও উদারতা আছে?

---

৪০. বিস্তারিত জানার জন্য ইবনু হাযমের 'ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম' কিংবা শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবীর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা' অথবা তাঁর বিশেষ পুস্তিকা 'আকদুল জাইয়েদ ফী আহকামিল ইজতিহাদ ওয়াত তাকলীদ' দ্রষ্টব্য।

৪১. জামে বায়ানিল ইল্‌ম ঃ ইবনু আবদিল বার, ২য় খন্ড, পৃঃ ৮১-৮২।

তিনি জওয়াবে বলেন, না। আল্লাহর কসম, যে পর্যন্ত না সঠিক হাদীস বর্ণনা করে। হক ও সত্য এক। দুটো বিপরীত কথা একই সময়ে কি করে হক হয়? হক ও সত্য একটাই।৪২

ইমাম শাফেঈ (রঃ)-এর সাথী মোযানী বলেন ঃ সাহাবায়ে কেরাম মতভেদ করেছেন, একে অপরকে ভুল বলেছেন, একজন আরেকজনের কথায় সন্দেহ পোষণ করে পরে তা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে দেখেছেন। যদি তাঁদের সকলের সব কথা সঠিক হত, তাহলে তাঁরা অনুরূপ বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করতেন না।

উমার ফারুক (রাঃ) এক কাপড়ে নামায আদায়ের ব্যাপারে উবাই বিন কা'ব ও আবদুল্লাহ বিন মাসউদের মতভেদের কারণে রাগ করেছিলেন। উবাই বলেছিলেন, এক কাপড়ে নামায আদায় করা সুন্দর ও উত্তম। আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ বলেন, তাতো করা যায় কিন্তু তাতে কাপড় খুব কম হয়ে যায়। তখন উমার (রাঃ) রাগ করে বেরিয়ে আসেন এবং বলেন, উবাই ঠিক কথাই বলেছে। তিনি ইবনে মাসঊদের কথাকে এক্ষেত্রে বড়ো করে দেখেননি। তারপর তিনি বলেন, এখন থেকে আমি আর কাউকে মতভেদ করতে দেখলে তাকে এই এই করবো।৪৩

এটা প্রমাণিত হয়ে গেলো যে, মতভেদ সকল মন্দের মূল, তা রহমত নয়। কিছু মতভেদের জন্য পাকড়াও করা হবে। যেমন চরমপন্থী মাযহাবের অনুসারী লোক। আর কিছু মতভেদ আছে যার জন্য পাকড়াও করা হবে না। যেমন, সাহাবায়ে কেরামের মতভেদ এবং ইমামদের মতপার্থক্য। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁদের দলভুক্ত করুন। সাহাবাদের মতপার্থক্য অন্ধ অনুসারীদের মতপার্থক্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সাহাবায়ে কেরাম বাধ্য হয়ে মতভেদ পোষণ করেছেন।কিন্তু তাঁরা মতভেদকে অপছন্দ করতেন ও অস্বীকার করতেন এবং মতভেদ থেকে বাঁচার উপায় পেলে বেঁচে থাকতেন। কিন্তু অন্ধ অনুসারীরা (মোকাল্লেদ) তা থেকে বাঁচার উপায় থাকা সত্ত্বেও বেঁচে থাকেন না, ঐক্যবদ্ধ হন না, সেজন্য চেষ্টা করেন না। বরং মতভেদকে জিইয়ে রাখেন।

এই উভয়ের মধ্যে সুদূরপ্রসারী প্রভাবের পার্থক্য সুস্পষ্ট। শাখা-প্রশাখায় পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সাহাবায়ে কেরাম ঐক্য রক্ষার ব্যাপারে ছিলেন খুবই সতর্ক। তাঁরা অনৈক্য সৃষ্টিকারী কথা ও কাজ থেকে বহুদূরে অবস্থান করতেন।

---

৪২. ঐ, ২য় খন্ড, ৮২, ৮৮ ও ৮৯ পৃঃ।
৪৩. ঐ, ২য় খন্ড, ৮৩-৮৪ পৃঃ।

তাঁদের কেউ প্রকাশ্যে বিসমিল্লাহ পড়ার পক্ষে, কেউ বিপক্ষে। কেউ দুই হাত উত্তোলনকে (রাফয়ে ইয়াদাইন) উত্তম মনে করতেন, কেউ তা মনে করতেন না। কেউ স্ত্রীকে স্পর্শ করলে উযু ভেঙ্গে যায় মনে করতেন, আবার কেউ তা মনে করতেন না। তা সত্ত্বেও তাঁরা সবাই একই ইমামের পেছনে নামায পড়েছেন এবং কেউ মাযহাবী মতভেদের কারণে অপরের পেছনে নামায পড়া থেকে বিরত থাকতেন না।

কিন্তু মোকাল্লেদদের (অনুসারীদের) অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। মতপার্থক্যের কারণে তারা ইসলামের দ্বিতীয় মহান রোকন নামাযের ব্যাপারেও ঐক্যবদ্ধ হতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা একই ইমামের পেছনে সবাই এক সঙ্গে নামায পড়তে অনিচ্ছুক। কেননা, তাদের দৃষ্টিতে ভিন্ন মাযহাবের অনুসারী ইমামের নামায বাতিল কিংবা কমপক্ষে মাকরূহ। আমরা এরকম বহু শুনেছি ও দেখেছি।[৪৪] কেন তা শুনব না? কোনো কোনো প্রখ্যাত মাযহাবের কিতাবে উক্ত নামাযকে বাতিল কিংবা মাকরূহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর ফলে, একই জামে মসজিদে চার মাযহাবের চারটি মেহরাব দেখা যায় এবং তাতে চারজন ইমাম একের পর এক নামায পড়ান। প্রত্যেক মাযহাবের লোকেরা যে মুহূর্তে নিজ ইমামের অপেক্ষা করছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে অন্য ইমাম দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছেন।

শুধু তাই নয়, কোনো কোনো অন্ধ অনুসারী আরো কঠিন মতভেদও পোষণ করেন। তারা হানাফী মাযহাবের অনুসারীর সঙ্গে শাফেঈ মাযহাবের অনুসারীর বিয়ে-শাদী নিষেধ করেন। আবার কোনো কোনো মশহুর হানাফী শাফেঈ মাযহাবকে আহলে কিতাবের অনুরূপ মনে করে বিয়েকে জায়েয বলেছেন।[৪৫]

এই ফতোয়া থেকে এরকম অর্থও বের করা হয় যে, শাফেঈ মাযহাবের কোনো পুরুষ হানাফী মাযহাবের কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে না। যেমনটি আহলে কিতাবের সঙ্গে প্রযোজ্য।

বুদ্ধিমানের জন্যে পরবর্তী কালের আলেমদের মতভেদের কুফল বুঝার জন্য উপরোক্ত দুটি উদাহরণই যথেষ্ট। যদিও এরূপ আরো বহু উদাহরণ দেয়া যায়। অন্যদিকে আমাদের পূর্বসূরী ওলামায়ে কেরামের মতভেদের কারণে উম্মাহর উপর কোনো খারাপ প্রভাব পড়েনি। তাদের সামনে অনৈক্য ও বিভেদ

---

৪৪. 'মা লা ইয়াজুযু ফীহিল খেলাফ' গ্রন্থের ৮ম অধ্যায়, পৃঃ ৬৫-৭২ দ্রষ্টব্য। তাতে এ জাতীয় কিছু উদাহরণ আছে, যা জামেয়া আযহারের ওলামায়ে কেরাম থেকে সংঘটিত হয়েছে।

৪৫ আল-বাহরুর রায়েক।

সৃষ্টি না করার জন্য কোরআনের আয়াতগুলো পরিষ্কার ছিল। কিন্তু পরবর্তী যুগের ওলামায়ে কেরামের (মোতাআখ্‌খিরীন) প্রেক্ষাপট তা নয়। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সহজ-সরল রাস্তার দিকে পথ প্রদর্শন করুন।

আফসোস! যদি তাদের মতভেদ শুধু প্রয়োজন ও বাধ্য হওয়া পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকত এবং অন্য যে সব জাতির কাছে দাওয়াত পৌঁছানো দরকার সে পর্যন্ত যদি তা বিস্তার লাভ না করত, তাহলে কতইনা ভাল হত! অথচ তা বিভিন্ন দেশের কাফেরদের পর্যন্ত ছাড়িয়ে গেছে। যে কারণে তারা আল্লাহর এই দীনে দলে দলে প্রবেশ করতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। মোহাম্মদ আল গাযালী তাঁর 'জলাম মিনাল গারব' বই-এর পৃষ্ঠা নং ২০০-তে লিখেছেন ঃ আমেরিকার প্রিনস্টোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে একজন প্রশ্নকারী প্রশ্ন করেন যে, প্রাচ্যবিদ ও ইসলামবিষয়ক বিশেষজ্ঞরা প্রায়ই বলে থাকেন, মুসলমানরা বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে কোন্ শিক্ষা তুলে ধরছে এবং তারা কোন্ ইসলামের দিকে দাওয়াত দিচ্ছে? সেটা কি সুন্নীদের শিক্ষা, না শিয়াদের শিক্ষা? শিয়াদের মধ্যে তা ইমামিয়া সম্প্রদায়, না যায়েদিয়া সম্প্রদায়ের শিক্ষা ? আবার তারা সবাই তাতেও শতধাবিভক্ত। তাদের মধ্যে একদল অগ্রসর চিন্তা-ভাবনা করে আর অন্যদল করে সেকেলে ও প্রাচীন চিন্তা-ভাবনা। মূল কথা, ইসলামের দাওয়াতদানকারীরা নিজেরা যেমন বিভ্রান্ত, তেমনি অন্যান্য লোকদেরকেও ইসলামের দাওয়াত দিয়ে বিভ্রান্ত করে তোলে।

আল্লামা সুলতান আল-মাসুমী তাঁর

هَدِيَّةُ السُّلْطَانِ اِلٰى مُسْلِمِيْ بِلَادِ جَابَانِ -

গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, টোকিও এবং ওসাকার জাপানী নাগরিকেরা প্রশ্ন করেছেন, দীন ইসলামের তাৎপর্য কি? মাযহাবের মানে কি? কোনো লোক মুসলমান হলে, তার জন্য কি চার মাযহাবের এক মাযহাব অনুসরণ করা জরুরী, না জরুরী নয়?

সেখানে এনিয়ে বিরাট মতভেদ দেখা দিয়েছে এবং ঝগড়া-ঝাটিও হয়ে গেছে। যখন কিছু জাপানী লোক ইসলাম কবুল করতে প্রস্তুত হয়েছে, তখন তারা টোকিও ইসলামী সংস্থার কাছে যান। সেখানে কিছু সংখ্যক ভারতীয় মুসলমান তাদেরকে হানাফী মাযহাব অনুসরণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। অন্যদিকে, ইন্দোনেশিয়ার জাভার কিছু মুসলমান তাদেরকে শাফেঈ মাযহাব অনুসরণের কথা বলেন। ইসলাম গ্রহণে জাপানী লোকেরা এসকল কথা শুনে ইসলাম কবুলের ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে যান এবং মাযহাব তাদের ইসলাম গ্রহণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

৩.কেউ কেউ মনে করে, আমি লোকদের হাদীস অনুসরণ এবং ইমামদের হাদীস বিরোধী বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করার আহ্বানের মাধ্যমে তাদের ইজতিহাদ ও বক্তব্য সম্পূর্ণ ত্যাগ করার আমন্ত্রণ জানিয়েছি।

এই অভিযোগের উত্তরে আমি বলবো, এই অভিযোগ মোটেই সত্য নয়, বরং তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বাতিল। আমার আগের বক্তব্যই এ কথার উত্তম প্রমাণ। আমি যা ত্যাগ করার আহ্বান জানাই তা হচ্ছে মাযহাবকে দীন না বানানো এবং তাকে কোরআন ও সুন্নাহর স্থলাভিষিক্ত না করা। এমন যেন না করা হয় যে, বিরোধ দেখা দিলে, কিংবা নতুন মাসআলা তৈরি অথবা জরুরী মাসআলার প্রয়োজনে কোরআন ও হাদীসকে বাদ দিয়ে মাযহাবের দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়। বর্তমান যুগের ফকীহরা এরূপ করছেন এবং ব্যক্তিগত বিষয়, তালাক ও বিয়ে সহ বিভিন্ন বিষয়ে তারা নতুন নতুন মাসআলা তৈরি করছেন। এজন্য তারা ভুল-শুদ্ধ বুঝার জন্য কোরআন ও হাদীসের শরণাপন্ন হচ্ছেন না। তারা তথাকথিত 'মতভেদ রহমত' এই তত্ত্ব কিংবা অনুমতি (রোখসত), সহজ ও সুবিধার উপর ভিত্তি করে মাসআলা প্রণয়ন করেন। এ প্রসঙ্গে সোলাইমান আত্‌তাইমী কতই না সুন্দর বলেছেন ঃ

'তুমি যদি সকল আলেমের রোখসত-অনুমতিকে গ্রহণ কর, তাহলে তোমার মধ্যে সকল মন্দের সমাহার ঘটবে।৪৬

তিনি আরো বলেন, 'এটা ইজমা এবং এ ব্যাপারে কোনো মতভেদ আছে বলে আমার জানা নেই।'

ইমামদের কথার দিকে প্রত্যাবর্তন করা, সেগুলোর সাহায্য নেয়া এবং উপকৃত হওয়ার ব্যাপারে কোনো বাধা নেই। বিশেষ করে যে সব বিষয়ে কোরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট কোনো বক্তব্য নেই, সে সব ক্ষেত্রে তাঁদের বক্তব্য থেকে উপকৃত হওয়া যাবে। এমন কি অধিকতর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য কোরআন-হাদীসের বিভিন্ন বিষয়ে তাদের বক্তব্য জানতে হবে। এতোটুকুকে আমরা অস্বীকার করি না। বরং তা করার জন্য আমরাও বলি এবং উৎসাহিত করি। এইভাবে ফায়দা গ্রহণ করা কাম্যও বটে। বিশেষ করে যারা কোরআন ও হাদীস মোতাবেক চলতে চায়, তারা অবশ্যই তাদের থেকে ফায়দা গ্রহণ করবে।

আল্লামা ইবনে আবদুল বার (রঃ) উক্ত গ্রন্থে বলেছেন ঃ (২য় খন্ড, ১৭২ পৃঃ) 'প্রিয় ভাই, আপনার কর্তব্য হল মূলনীতির হেফাযত করা। জেনে রাখুন, যে ব্যক্তি হাদীস এবং কোরআনে বর্ণিত বিধানগলোর হেফাযত করে এবং

৪৬. ইবনে আবদুল বার, ২য় খন্ড, ৯১-৯২ পৃঃ।

ফকীহদের বক্তব্যের প্রতি নজর দেয়, সে এর মাধ্যমে নিজ ইজতিহাদকে সাহায্য করে। সে বিনা বিচার-বিশ্লেষণে কারোর আনুগত্য করে না এবং ইমামরা জ্ঞান-গবেষণা করে যা গ্রহণ করেছেন শুধু তার উপর সন্তুষ্ট থাকেন না। সে বুঝ-বিবেচনার ব্যাপারে তাদেরকে অনুসরণ করে, তাদের প্রচেষ্টা ও প্রদত্ত তথ্যের জন্য তাদের শুকরিয়া জ্ঞাপন করে, তাদের সিদ্ধান্ত সঠিক হলে সে জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানায়। অবশ্য তাদের অধিকাংশ বক্তব্যই সঠিক। সে তাদের দোষ-ত্রুটি গোপন করে না, যেমন তারাও নিজেদের দোষ-ত্রুটি গোপন করে যাননি। এজাতীয় ব্যক্তিই আমাদের পূর্বসূরীদের মতো সঠিক অনুসারী, যথার্থ সহযোগী এবং রসূলুল্লাহর (সঃ) হাদীস ও সহাবায়ে কেরামের চরিত্রের আনুগত্যকারী। যে ব্যক্তি বিচার-বিশ্লেষণ করে না, হাদীসকে নিজ রায়ের দ্বারা প্রতিরোধ করে এবং নিজের পান্ডিত্যের কাছে থেকে পরাভূত করে, সে ব্যক্তি গোমরাহ ও অন্যদেরকে গোমরাহকারী। আর যে ব্যক্তি জ্ঞান ব্যতীত ফতোয়া দেয়, সে কঠিনতম অন্ধ ও অধিকতর গোমরাহ।'

৪. কোনো কোনো অনুসারীর (মোকাল্লেদের) কাছে এমন এক ধারণা চালু আছে, যা তাদেরকে সেই হাদীস অনুসরণের বাধা দেয়, যে হাদীসের বিপরীতে তাদের মাযহাবের মাসআলা রয়েছে। তাদের ধারণা হল, ঐ ক্ষেত্রে হাদীসের অনুসরণ মাযহাবের ইমামের ত্রুটির প্রমাণ। তাদের কাছে ঐ ত্রুটি অর্থ ইমামের সমালোচনা ও দোষ ধরা। যা একজন সাধারণ মুসলমানের ক্ষেত্রেও জায়েয নেই, তা কিভাবে তাদের মাযহাবের ইমামদের ক্ষেত্রে জায়েয হতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, এই ধারণা বাতিল। কেননা, এই ধারণার কারণে হাদীস থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া হয়। নচেত কি করে একজন বিবেকমান মুসলমান এ রকম বলতে পারে? স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স) যেখানে বলেছেন ঃ

اِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَاَصَابَ فَلَهٗ اَجْرَانِ وَاِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَاَخْطَاَ فَلَهٗ اَجْرٌ وَاحِدٌ (البخارى والمسلم)

অর্থ ঃ 'বিচারক বিচারের পূর্বে ইজতিহাদ করে সঠিক রায়ে পৌঁছতে পারলে দু'টি বিনিময় পাবে। আর যদি ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছে, তাহলেও একটি বিনিময় পাবে।'[৪৭]

এ হাদীস ঐ জাতীয় অর্থকে নাকচ করে দেয় এবং একথা পরিষ্কার করে বলে দেয় যে, 'অমুকে ভুল করেছে' শরীয়তে এই কথার অর্থ হল 'অমুক একটি মাত্র বিনিময় লাভ করেছে।' যদি তিনি ভুল করেও একটি পুরস্কার পান,

৪৭.বোখারী ও মুসলিম।

তাহলে কি করে তাঁকে সমালোচনা করা হল ও তাঁর দোষ ধরা হল? এ জাতীয় ধারণা ভ্রান্ত। তাই এথেকে মুক্ত হওয়া দরকার। নচেত এটাই মুসলমানদের জন্য সমালোচনা ও দোষের কারণ হবে। আমরা জানি যে, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈ, তাবয়ে তাবেঈ' ও মোজতাহিদ ইমামগণ একে অপরের ভুল ধরতেন এবং একে অপরের প্রশ্নের জওয়াব দিতেন।৪৮

এখন কি বুদ্ধিমান কোনো ব্যক্তি বলবেন যে, তারা একে অপরের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করেছেন? সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) এক ব্যক্তির স্বপ্নের ব্যাখ্যার বিষয়ে হযরত আবু বকরের ভুল ধরেছিলেন। তিনি তাঁকে বলেন,

اَصْبَتَ بَعْضًا وَاَخْطَأْتَ بَعْضًا (بخارى ومسلم)

অর্থ ঃ 'তুমি কিছু অংশের সঠিক ব্যাখ্যা দিয়েছ আর কিছু অংশের ভুল ব্যাখ্যা করেছ।' তাই বলে কি রসূলুল্লাহ (সঃ) আবু বকরের সমালোচনা করেছেন বলতে হবে? কি আশ্চর্য ব্যাখ্যা তাদের? হাদীসের খেলাপ করলেও সম্মান দেখানোর নামে ভুলের উপর তাদের অনুসরণ করতে হবে?

ঐ ব্যক্তিরা ভুলে গেছে, তারা ঐ ধারণার কারণে যে মন্দ থেকে বাঁচতে চেয়েছিল, সে মন্দের মধ্যেই নিক্ষিপ্ত হয়েছে। যদি কোনো ব্যক্তি তাদেরকে প্রশ্ন করে, অনুসরণ যদি অনুসৃত ব্যক্তির সম্মানের প্রতীক হয় এবং তার বিরোধিতা যদি তার অসম্মান হয়, তাহলে তোমরা কি করে নিজেদের জন্য রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাদীসের বিরোধিতাকে জায়েয এবং তাঁর অনুসরণ ত্যাগ করাকে বৈধ করলে? আনুগত্যের পরিবর্তনটা হল রসূল (সঃ) থেকে মাযহাবের ইমামের দিকে–যিনি মাসুম বা নিষ্পাপ নন। পক্ষান্তরে রসূল নিষ্পাপ। তাঁকে অসম্মান করা কি কুফরী নয়? ইমামের বিরোধিতা যদি অসম্মান হয়, তাহলে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বিরোধিতা তো আরো বড়ো ধরনের অসম্মান হওয়ার কথা। শুধু তাই নয়, তা কুফরীও বটে। তারা ঐই প্রশ্নের কোনো জওয়াব দিতে পারবে না। তারা শুধু এইটুকু বলবে যে, আমরা ইসলামের প্রতি গভীর আস্থার কারণে সুন্নাহ ত্যাগ করেছি এবং তিনি হাদীস বা সুন্নাহ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত আছেন।

আমি এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত একটি জবাব দিতে চাই। আমার কথা হল, অনেক ইমাম আছেন যারা তোমাদের চাইতে অধিকতর হাদীস জানেন। যদি তোমাদের মাযহাবের বিপরীত কোন হাদীস তারা বলেন এবং ঐ সকল ইমামদের মধ্য থেকে যে কোন একজন তা গ্রহণও করেছেন তখন তা গ্রহণ

৪৮. ইমাম মোযানী, পৃঃ ৩৬ এবং হাফেয ইবনে রজব, পৃঃ ২৯।

করা জরুরী। কেননা, তোমাদের কথা এখানে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। হাদীসের অনুসারী ইমামের আনুগত্য হাদীস পরিত্যগকারী ইমামের চাইতে শ্রেষ্ঠ। এটা খুবই পরিষ্কার বিষয়।

আমি এখন বলতে পারি, আমার এই পুস্তকটি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নামায সম্পর্কে সহীহ ও বিশুদ্ধ হাদীসের একটি সংকলন ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই তা ত্যাগ করার পক্ষে কোন ওযর চলে না। কেননা, তাতে এমন কিছু নেই যা ত্যাগ করার জন্য ওলামায়ে কেরামের মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর আল্লাহ তাদেরকে এ জাতীয় ঐক্য থেকে রক্ষা করুন। এ বইতে এমন কোনো মাসআলা নেই, যা কোন না কোনো মাযহাব গ্রহণ করেননি। যে বা যারা ঐ বিষয়ে বলেননি, তারা নির্দোষ এবং একটা পুরস্কার দ্বারা পুরস্কৃত। তখন তাদের কাছে ঐ সম্পর্কে কোনো হাদীস পৌঁছেনি অথবা এমনভাবে পৌঁছেছে, যা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি কিংবা ওলামায়ে কেরামের কাছে স্বীকৃত কোনো ওযরের কারণে তারা তা গ্রহণ করতে পারেননি। তবে পরবর্তীতে যে সকল অনুসারীর কাছে তা পৌঁছেছে, তাদের কোনো ওযর গ্রহণযোগ্য নয়, বরং তাদের কর্তব্য হল হাদীস মেনে চলা। এ ভূমিকার এটাই উদ্দেশ্য।

আল্লাহ বলেন ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ - (الانفال - ٢٤)

অর্থ ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দাও। যখন রসূল তোমাদেরকে এমন জিনিসের দিকে ডাকে যা জীবন দান করবে। তোমরা জেনে রাখ, আল্লাহ বান্দাহ ও তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করেন এবং তার দিকেই তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে।" (সূরা আনফাল ঃ ২৪)

আল্লাহ সত্য বলেন এবং তিনি হেদায়াত দেন। তিনিই উত্তম পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী। (মোহাম্মদ নাসেরুদ্দিন আলবানী, দামেস্ক ২৮/১০/১৩৮৯ হিঃ)

রসূলুল্লাহর নামায পদ্ধতি

কেবলার দিকে মুখ করে দাঁড়ানো

রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন ফরয, সুন্নত ও নফল নামায পড়তেন, তখন কাবার দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন এবং অন্যদেরকেও কাবার দিকে মুখ করে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিতেন। তিনি ভুল নামায আদায়কারীকে লক্ষ্য করে বলেন, 'তুমি যখন নামাযের জন্য দাঁড়াবে, তখন কেবলামুখী হয়ে তাকবীর বলবে।[১]

তিনি সফরে নিজ সওয়ারীর উপর বেজোড় নফল নামায পড়তেন এবং সওয়ারী পূর্ব ও পশ্চিমে যে দিকেই যেত, সেদিকে মুখ করেই নামায আদায় করতেন।[২]

এ বিষয়ে আল্লাহ্‌র কোরআন বলছে ঃ

فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ـ

অর্থ ঃ "তোমরা যেদিকেই মুখ কর, সে দিকেই আল্লাহ আছেন।"[৩]

এছাড়াও তিনি সওয়ারীর উপর জোড় নফল নামাযও পড়তেন। তিনি যখন নফল নামায পড়তেন, তখন সওয়ারীর উপর কেবলামুখী হয়ে বসতেন এবং তাকবীর বলতেন। তারপর সওয়ারী যেদিকেই যেত তিনি নামায অব্যাহত রাখতেন।[৪]

তিনি সওয়ারীর উপর মাথার ইশারায় রুকু ও সিজদাহ দিতেন। তিনি রুকুর তুলনায় সিজদায় অধিকতর নীচু হতেন।[৫] তিনি ফরয নামায পড়ার ইচ্ছা করলে সওয়ারী থেকে নীচে নেমে কেবলামুখী হয়ে নামায আদায় করতেন।[৬] কঠিন ভয়কালীন নামাযে তিনি নিজ উম্মতের জন্য দাঁড়িয়ে সওয়ারীর উপর, কেবলা কিংবা অকেবলামুখী হয়ে নামায আদায়ের সুন্নত চালু করে গেছেন।[৭]

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ

'যখন তারা নামাযে এসে মিলিত হবে, তখন তাকবীর বলবে ও মাথা দ্বারা ইশারা করবে।[৮]

---

১. বোখারী ও মুসলিম
২. ঐ।
৩. সূরা বাকারা, ১১৫ আয়াত।
৪. আবু দাউদ, ইবনে হিব্বান।
৫. আহমদ, তিরমিযী।
৬. বোখারী, মুসলিম।
৭. বোখারী ও মুসলিম।
৮. বায়হাকী।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) আরো বলতেন, পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যখানে কেবলা।[৯]

জাবের (রাঃ) বলেছেন ঃ আমরা একবার রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে এক অভিযানে বের হই। তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় আমরা কেবলা নির্ধারণের ব্যাপারে মতভেদ পোষণ করি। আমরা প্রত্যেকেই পৃথক পৃথকভাবে নামায আদায় করি। আমরা প্রত্যেকেই স্থানের পরিচিতির জন্য সামনে একটা দাগ কাটি। সকাল বেলায় আমরা যখন ঐ স্থান দেখি, তখন দেখতে পাই যে, আমরা কেবলার বিপরীত দিকে নামায পড়েছি। আমরা তা রসূলুল্লাহর কাছে বর্ণনা করি। তিনি আমাদেরকে পুনরায় নামায পড়ার আদেশ করেননি। বরং তিনি বলেন, তোমাদের নামায শুদ্ধ হয়েছে।[১০]

রসূলুল্লাহ (সঃ) বায়তুল মাকদেসের দিকে মুখ করে নামায পড়েন। তখন কাবা শরীফকে কেবলা বানানো তার বাসনা ছিল। অথচ নীচের আয়াত নাযিল হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি বায়তুল মাকদেসের দিকে ফিরেই নামায পড়েন। আয়াতটি হচ্ছে ঃ

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط

অর্থ ঃ "আমরা আকাশের দিকে বারবার তোমার ফিরে তাকানোকে দেখছি। এখন আমরা তোমার মুখ সেই কেবলার দিকেই ফিরিয়ে দিচ্ছি যা তুমি পছন্দ করো। সুতরাং মসজিদে হারামের দিকে মুখ ফিরাও।" (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৪৪)

এই আয়াত নাযিলের পর তিনি কাবার দিকে মুখ করে নামায পড়া শুরু করেন। সকাল বেলায় কিছু লোক মসজিদে কুবায় নামায পড়াকালীন সময় একজন আগন্তুক বলেন, রাত্রে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর কাবাকে কেবলা বানিয়ে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে কোরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে। তাই তোমরা কাবার দিকে মুখ ফিরাও। এসময় তাদের মুখ ছিল সিরিয়াভিমুখী। তখন তারা কাবার দিকে ফিরে দাঁড়ান এবং ইমামও তাই করেন।[১১]

৯. তিরমিযী, হাকেম।

১০. দারু কোতনী, হাকেম, বায়হাকী, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও তাবারানী।

১১. বোখারী, মুসলিম, আহমদ, তাবারানী।

কেয়াম (দাঁড়ানো)

রসূলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহর নিম্নোক্ত আদেশের ভিত্তিতে ফরয ও নফল নামায দাঁড়িয়ে পড়তেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ

অর্থ ঃ 'আল্লাহর সামনে অনুগত ও বিনীত হয়ে দাঁড়াও।[১২]

তিনি সফরে নফল ও সুন্নত নামায সওয়ারীর উপর বসে আদায় করতেন। তিনি যুদ্ধকালীন ভয়ের নামাযে উম্মাহর জন্য পায়ের উপর দাঁড়িয়ে কিংবা সওয়ারীর উপর বসে আদায়ের নিয়ম চালু করে গেছেন। আল্লাহ বলেছেন ঃ

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ - فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّالَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ -

অর্থ ঃ "তোমরা নামাযসমূহের পূর্ণ হেফাযত কর। বিশেষ করে মধ্যবর্তী ও উত্তম-উৎকৃষ্ট নামায। আল্লাহর সামনে অনুগত সেবকের ন্যায় দাঁড়াও। ভয়ের সময় পদাতিক কিংবা আরোহী অবস্থাতেই নামায পড়। তারপর নিরাপত্তা ফিরে আসলে আল্লাহকে সেই নিয়মে ডাক যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না।[১৩]

রসূলুল্লাহ (সঃ) মৃত্যুকালীন তাঁর রোগে বসে বসে নামায পড়েছেন।[১৪]

আরেকবার অসুস্থ হয়ে তিনি বসে নামায পড়েছেন এবং লোকেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়েন। তারপর তিনি তাদেরকে বসার জন্য ইঙ্গিত দেন, তারা সবাই বসে পড়েন। নামায শেষে তিনি বলেন, তোমরা প্রথমে যা করেছিলে, তা পারস্য ও রোম সম্রাটদের নীতি। তারা বসে থাকে আর লোকেরা দাঁড়িয়ে থাকে। তোমরা এরূপ কর না। অনুসরণের জন্যই তোমাদের ইমাম নিযুক্ত করা হয়েছে। তিনি রুকু করলে তোমরা রুকু করবে, তিনি রুকু থেকে উঠলে তোমরা উঠবে এবং তিনি বসে নামায পড়লে তোমরাও সবাই বসে নামায পড়বে।[১৫]

১২.বাকারা ঃ ২৩৮।

১৩. বাকারা ঃ ২৩৮-২৩৯ আয়াত।

১৪. তিরমিযী, আহমদ।

১৫. মুসলিম।

অসুস্থ লোকের বসে নামায পড়া

ইমরান বিন হোসাইন (রাঃ) বলেছেন, আমার ছিল অর্শ রোগ। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন, দাঁড়িয়ে নামায পড়। যদি দাঁড়াতে সক্ষম না হও, তাহলে বসে নামায পড়। যদি তাও সম্ভব না হয়, তাহলে শুয়ে এক পাশে ফিরে নামায পড়বে।[১৬]

তিনি আরো বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বসে নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি উত্তর দেন, দাঁড়িয়ে নামায পড়া উত্তম। বসে নামায পড়লে দাঁড়িয়ে নামায পড়ার অর্ধেক সওয়াব পাওয়া যায় এবং শুইয়ে নামায পড়লে বসে নামায পড়ার অর্ধেক সওয়াব পাওয়া যায়।[১৭] এখানে রোগীর নামায সম্পর্কেই প্রশ্ন করা হয়েছে।

আনাস (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) কিছু রোগীর কাছে গেলেন যারা বসে বসে নামায আদায় করছিলেন। তিনি বলেন, বসে নামায পড়লে দাঁড়িয়ে নামায পড়ার অর্ধেক সওয়াব।[১৮]

রসূলুল্লাহ (সঃ) এক রোগীকে দেখতে যান। রোগীটি বালিশের উপর নামায পড়ছিলেন। তিনি বালিশটি ফেলে দেন। তারপর রোগীটি নামায পড়ার জন্য একটি কাঠ নেন। তিনি এবারও কাঠটি ফেলে দেন এবং বলেন, সক্ষম হলে মাটির উপর নামায পড়। নচেত ইশারা দ্বারা নামায পড় এবং রুকুর তুলনায় সাজদায় অধিকতর ঝুঁকে পড়।[১৯]

নৌকায় নামায

রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে নৌকায় নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ডুবে যাওয়ার ভয় না থাকলে দাঁড়িয়ে নামায পড়।[২০]

রসূলুল্লাহ (সঃ) শেষ বয়সে একটি লাঠির উপর ভর দিয়ে নামায পড়েছেন।[২১]

---

১৬. বোখারী, আবু দাউদ, আহমদ। খাত্তাবী বলেছেন, ইমরানের হাদীসে ফরয নামায সম্পর্কে বলা হয়েছে কষ্ট হলেও দাঁড়িয়ে পড়তে পারলে ভাল। অন্যথায় বসে পড়া জায়েয থাকলেও তাতে সওয়াব অর্ধেক পাওয়া যাবে।

১৭. বোখারী, আবু দাউদ, আহমদ।

১৮. আহমদ ও ইবনে মাজাহ। সনদ বিশুদ্ধ

১৯. তাবারানী, বায্‌যার, বায়হাকী। সনদ বিশুদ্ধ।

২০. বায্‌যার, দার কোতনী, হাকেম।

২১ আবু দাউদ, হাকেম।

রাত্রের নামাযে দাঁড়ানো ও বসা

রসূলুল্লাহ (সঃ) রাত্রে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন। তিনি দীর্ঘ সময় বসেও নামায পড়তেন। তিনি দাঁড়িয়ে নামায পড়লে দাঁড়িয়ে রুকু দিতেন এবং বসে নামায পড়লে বসে রুকু দিতেন।[২২]

কখনও তিনি বসে বসে নামায পড়লে কেরাআতও বসে বসেই পড়তেন। কিন্তু যখন ৩০/৪০ আয়াত বাকী থাকত, তখন তিনি দাঁড়াতেন। তারপর রুকু ও সাজদা করতেন। দ্বিতীয় রাকআতেও তিনি অনুরূপ করতেন।[২৩]

তিনি শেষ বয়সে বসে নফল নামায পড়েছেন। ইন্তিকালের এক বছর আগে তিনি বসে নফল নামায পড়েন।[২৪]

রসূলুল্লাহ (সঃ) আসন-পিঁড়ি হয়ে এক পায়ের উপর অন্য পা আড়াআড়িভাবে স্থাপন করে বসতেন। ইংরেজিতে একে Cross-Legged বলে।[২৫]

জুতা সহকারে নামায পড়া ও অনুরূপ করার আদেশ

রসূলুল্লাহ (সঃ) কখনও জুতা পায়ে এবং কখনও খালি পায়ে নামায পড়তেন। তিনি নিজ উম্মাহর জন্যও অনুরূপ করাকে বৈধ করে গেছেন।[২৬]

তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ নামায পড়লে সে যেন জুতা পরে থাকে কিংবা দুই পায়ের মাঝখানে তা খুলে রাখে। জুতা দিয়ে কাউকে যেন কষ্ট না দেয়।[২৭]

তিনি কখনও জুতা সহকারে নামায পড়ার বিষয়ে তাকীদ দিতেন। তিনি বলেছেন ঃ তোমরা ইহুদীদের বিরোধিতা কর, তারা জুতা ও চামড়ার মোযায় নামায পড়ে না।[২৮]

কখনও তিনি নামাযের মধ্যেই দুই পায়ের জুতা খুলে নামায অব্যাহত রাখতেন। এমর্মে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন ঃ

একদিন রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়েন। তিনি নামাযে জুতা খুলে বামদিকে রাখেন। তা দেখে লোকেরাও জুতা খুলে ফেলল। তিনি

২২.মুসলি, আবু দাউদ।
২৩. বোখারী, মুসলিম।
২৪. মুসলিম, আহমদ।
২৫. নাসাঈ, ইবনে খোযাইমাহ, হাকেম।
২৬. আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ। ইমাম তাহাবী বলেছেন, এটি মোতাওয়াতের হাদীস।
২৭. আবু দাউদ, বাযযার।
২৮. ঐ।

নামায শেষে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কেন জুতা খুলে রেখেছ? তারা বলল, আপনাকে জুতা খুলতে দেখে আমরাও জুতা খুলে রেখেছি। তিনি বললেন, আমার কাছে জিবরীল (আঃ) আসেন এবং জুতায় অপবিত্রতার খবর দেন। তাই আমি তা খুলে রেখেছি। তোমরা মসজিদে আসলে নিজের জুতা দেখে নেবে। তাতে ময়লা থাকলে মুছে ফেলবে এবং জুতা সহকারেই নামায পড়বে।[২৯]

তিনি জুতা খুলে তাঁ বাম পার্শ্বে রাখতেন।[৩০] তিনি বলতেন, তোমরা নামায পড়লে নিজ জুতা খুলে ডানে ও বামে রাখবে না যা অন্যের ডানে পড়তে পারে। তবে বামদিকে কেউ না থাকলে বামে রাখা যেতে পারে। অন্যথায় নিজের দুই পায়ের মাঝখানে রাখবে।[৩১]

মিম্বরের উপর নামায আদায়

একবার রসূলুল্লাহ (সঃ) মিম্বরের উপর নামায আদায় করেন। এক বর্ণনায় এসেছে, মিম্বরের ছিল তিনটি তাক বা সিঁড়ি।[৩২]

তিনি মিম্বরের উপর দাঁড়ান ও তাকবীর বলেন। লোকেরাও তাঁর পেছনে তাকবীর বলেন। তারপর তিনি মিম্বরের উপরই রুকুতে যান এবং রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ান। তারপর নীচে নেমে আসেন এবং মিম্বরের নীচের সিঁড়িতে সাজদা করেন। তারপর আবার মিম্বরের উপর উঠেন এবং প্রথম রাকআতের অনুরূপ নামায পড়েন। এইভাবে তিনি নামায শেষ করেন। তারপর লোকদের দিকে ফিরে বলেন, হে লোকেরা! আমি এরূপ করেছি যেন তোমরা আমাকে ভালভাবে অনুসরণ করতে পার এবং আমার নামায দেখে শিখতে পার।[৩৩]

সুতরাহ্ (আড়াল) ও এর অপরিহার্যতা

রসূলুল্লাহ (সঃ) সুতরার কাছে দাঁড়াতেন। দেয়াল থেকে তিনি তিন হাত দূরে দাঁড়াতেন।[৩৪]

---

২৯. আবু দাউদ, ইবনু খোযায়মাহ, হাকেম। ইমাম আয্‌যাহাবী ও ইমাম নববীও একে বিশুদ্ধ হাদীস বলেছেন।

৩০. আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনু খোযায়মাহ।

৩১. আবু দাউদ, ইবনু খোযায়মা, হাকেম।

৩২. তিন সিঁড়ি বিশিষ্ট মিম্বরই সুন্নত। বেশি সিঁড়ি নামাযের কাতারের জন্য অসুবিধে। এটি উমাইয়া আমলের বেদআত।

৩৩. বোখারী, মুসলিম।

৩৪. বোখারী, আহমদ।

তাঁর সাজদা ও দেয়ালের মাঝে একটি ভেড়া পারাপারের জায়গা থাকত।৩৫

রসূলুল্লাহ (স) বলতেন, সুতরার দিক ছাড়া অন্যদিকে ফিরে নামায পড়বে না এবং তোমার নামাযের সামনে দিয়ে কাউকে অতিক্রম করতে দেবে না। কেউ অস্বীকার করলে তুমি তার সাথে লড়বে। তার সঙ্গে একজন সাথী রয়েছে।৩৬

রসূলুল্লাহ (সঃ) আরো বলেছেন, কেউ যদি সুতরার দিকে মুখ করে নামায পড়ে, সে যেন সুতরার নিকটবর্তী হয় এবং শয়তানকে নিজ নামায অতিক্রম করার সুযোগ না দেয়।৩৭

রসূলুল্লাহ (সঃ) কখনও কখনও মসজিদের খুঁটিকে সামনে রেখে নামায পড়েছেন।৩৮

রসূলুল্লাহ (সঃ) আড়ালবিহীন খোলা মাঠে নামায পড়ার সময় সামনে যুদ্ধাস্ত্র দাঁড় করিয়ে সেই দিকে মুখ করে নামায পড়তেন এবং লোকেরা তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতেন।৩৯ কোন কোন সময় তিনি সওয়ারীকে সামনে রেখে তার পেছনে নামায পড়েছেন।৪০ তবে উটের আস্তাবলে নামায পড়ার অনুমতি নেই। বরং রসূলুল্লাহ (সঃ) তা করতে নিষেধ করেছেন।৪১ কখনও কখনও তিনি সওয়ারীর আসনকে সুতরাহ বানিয়ে সেদিকে ফিরে নামায পড়েছেন।৪২

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি নিজের সামনে সওয়ারীর আসনের পেছনের কাঠের অনুরূপ একটা কিছু রেখে নামায পড়ে, তাহলে তার সামনে দিয়ে কি অতিক্রম করল এ বিষয়ে তার কোনো পরোয়া নেই।৪৩ তিনি কখনও কখনও গাছের দিকে মুখ করে নামায পড়েছেন। ৪৪ তিনি

---

৩৫. বোখারী ও মুসলিম।

৩৬. ইবনু খোযায়মাহ।

৩৭. আবু দাঊদ, বায্‌যার, পৃঃ ৪৫, হাকেম। ইমাম যাহাবী ও নববী একে সহীহ হাদীস বলেছেন।

৩৮. ছোট-বড়ো সকল মসজিদে সুত্‌রার পেছনে নামায পড়ার জন্য ইমাম আহমদ উৎসাহিত করেছেন। এটাই যথার্থ। (মাসায়েল আন ইমাম আহমদ ঃ ইবনু হামি, ১ম খন্ড ঃ ৬৬ পৃঃ)

৩৯. বোখারী, মুসলিম ও ইবনু মাজাহ।

৪০. বোখারী, আহমদ।

৪১. ঐ।

৪২. মুসলিম, ইবনু খোযায়মাহ, আহমদ।

৪৩. মুসলিম, আবু দাঊদ

৪৪. নাসাঈ, আহমদ।

কখনও খাটের দিকে ফিরে নামায পড়েছেন এবং আয়েশা (রাঃ) নিজ চাদর মুড়ি দিয়ে খাটে শোয়া ছিলেন।৪৫

রসূলুল্লাহ (সঃ) সুতরাহ ও নিজের মাঝখানে কোনো কিছুকে অতিক্রম করতে দিতেন না। কোন ভেড়া-বকরী তাঁর নামাযের সামনে দিয়ে পার হতে চাইলে তিনি ভেড়া-বকরীর আগেই দ্রুত দেয়ালের সাথে পেট লাগিয়ে গা ঘেঁষে দাঁড়াতেন এবং ভেড়া-বকরী তার পেছন দিয়ে পেরিয়ে যেত।৪৬

একবার রসূলুল্লাহ (সঃ) ফরয নামায পড়ার সময় নিজ হাত একসাথে মিলান। তাঁর নামায শেষে সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! নামাযে কি কিছু ঘটেছে? তিনি বলেন, না। তবে শয়তান আমার সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে চাচ্ছিল। আমি তার গলা চেপে ধরি এবং আমার হাতে তার জিহ্বার শীতলতা অনুভব করি। আল্লাহর কসম, যদি এ ব্যাপারে আমার ভাই নবী সোলায়মান (আঃ) আমার অগ্রগামী না হতেন, তাহলে আমি তাকে মসজিদের একটি খুটির সাথে বেঁধে রাখতাম এবং মদীনার শিশুরা তাকে দেখার জন্য চক্কর লাগাত। কেউ যদি চায় যে, কেবলা ও তার মাঝে কোনো অন্তরায় সৃষ্টি না হোক, তাহলে সে যেন সক্ষম হলে অনুরূপ করে।৪৭

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলতেন, কোনো ব্যক্তি লোকদেরকে আড়াল করার উদ্দেশ্যে সুতরার দিকে ফিরে নামায পড়ার সময় অন্য কোন ব্যক্তি তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে চাইলে তাকে বুক দিয়ে প্রতিরোধ করবে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তাকে সাধ্যমত প্রতিহত করবে। আরেক বর্ণনায় এসেছে, তাকে দুইবার নিষেধ করতে হবে। যদি সে না মানে, তাহলে তার সাথে লড়াই করতে হবে। কারণ সে ব্যক্তি শয়তান।৪৮

তিনি আরো বলেছেন, নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী ব্যক্তি যদি জানত যে, তার পরিণতি কি, তাহলে নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চাইতে তার জন্য ৪০ পর্যন্ত অপেক্ষা করা উত্তম।৪৯

---

৪৫. বোখারী, মুসলিম, আবু ইয়ালী।

৪৬. ইবনু খোযায়মাহ, তাবারানী, হাকেম, আযযাহাবী।

৪৭. আহমদ, দার কোতনী এবং সহীহ সনদ সহকারে তাবারানীও বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি বোখারী মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে একদল সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত আছে। এই হাদীস কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে একটি দলীল। তারা জিন স্বীকার করে না। তাদের মতে, জিন বলতে মানুষকে বুঝানো হয়েছে।

৪৮. বোখারী, মুসলিম, ইবনু খোযায়মাহ।

৪৯. ঐ।

(এ হাদীসে ৪০ বলতে কি বুঝানো হয়েছে তা পরিষ্কার নয়। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ ৪০ দিন, বছর বা ওয়াক্ত ইত্যাদি–অনুবাদক)

সুত্রাহ্ না থাকলে যে জিনিস নামায ভঙ্গ করে

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলতেন, নামাযীর সামনে সুত্রাহ না থাকলে ঋতুবর্তী মহিলার[৫০] অতিক্রম কিংবা গাধা ও কাল কুকুরের অতিক্রমের কারণে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়। আবু যর জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রসূল! লাল কুকুরের তুলনায় কাল কুকুরের বিষয়টি এমন কেন? রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, কাল কুকুর শয়তান।[৫১]

কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়া

রসূলুল্লাহ (সঃ) কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'তোমরা কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়বে না এবং কবরের উপর বসবে না।'[৫২]

নিয়্যত [৫৩]

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 'সকল আমল নিয়্যতের সাথে জড়িত। সকল ব্যক্তি তাই পাবে যা সে নিয়্যত করে।[৫৪]

তাকবীর

রসূলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহু আকবার বলে নামায শুরু করতেন।[৫৫] তিনি ভুল নামায আদায়কারী ব্যক্তিকেও অনুরূপ করার আদেশ দিয়েছিলেন। তিনি তাকে

---

৫০. অর্থাৎ বালেগা মহিলা।

৫১. মুসলিম, আবু দাঊদ, ইবনু খোযায়মাহ।

৫২. ঐ।

৫৩. ইমাম নববী রাওযাতুত তালেবীন বইতে লিখেছেন, নিয়্যত হল ইচ্ছা বা সংকল্প। নামাযের সময় মুসল্লীর মনে নামাযের যে পরিচিতি ও গুণাবলী ভেসে আসে তাই নিয়্যত। যেমন, যোহর, ফরয ইত্যাদি। প্রথম তাকবীরের সাথে ঐ সংকল্প সংশ্লিষ্ট থাকতে হবে।

৫৪. বোখারী, মুসলিম।

৫৫. মুসলিম, ইবনে মাজাহ। নিয়্যত করার জন্যে তিনি কখনও

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ .....

ইত্যাদি বলতেন না। বরং তা সর্বসম্মতভাবে বেদআত। শুধু এতটুকু মতভেদ যে, তা বেদআতে হাসানাহ, না সাইয়্যেআহ। আমরা বলবো, ইবাদতের মধ্যে সকল বেদআত গোমরাহী। হাদীস তাই বলে।

বলেছেন, 'কোনো ব্যক্তির নামায ওযু শেষে 'আল্লাহু আকবার' বলে শুরু না করলে তা সম্পন্ন হয় না' (সহীহ সনদ সহকারে তাবারানী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।)

রসূলুল্লাহ (সঃ) আরো বলেছেন, নামাযের চাবি হচ্ছে পবিত্রতা অর্জন। তাকবীর দ্বারা নামাযের বাইরের বৈধ কাজগুলোকে নামাযে হারাম করা হয় এবং সালাম ফিরানোর মাধ্যমে নামাযের বাইরের বৈধ কাজগুলোকে হালাল করা হয়। (আবু দাউদ, তিরমিযী, হাকেম, আল্লামা যাহাবী এ হাদীসকে বিশুদ্ধ বলেছেন)

তিনি তাকবীর বড়ো করে উচ্চারণ করতেন, পেছনের লোকেরাও তা শুনতে পেত। (আহমদ, হাকেম এবং আল্লামা যাহাবী এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন)

তিনি যখন অসুস্থ অবস্থায় নামায পড়ান, তখন আবু বকর (রাঃ) তাঁর তাকবীরের শব্দ বড়ো করে লোকদেরকে শুনান। (মুসলিম ও নাসাঈ)

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, ইমাম যখন আল্লাহু আকবার বলেন, তখন তোমরাও আল্লাহু আকবার বল।[৫৬]

দুই হাত তোলা (রফে' ইয়াদাইন)

রসূলুল্লাহ (সঃ) কখনও তাকবীর তাহরীমার সময়,[৫৭] কখনও তাকবীরের পরে[৫৮] এবং কখনও তাকবীরের আগে দুই হাত তুলতেন।[৫৯]

তিনি আঙ্গুল লম্বা করে হাত তুলতেন, তা বেশি ফাঁক করতেন না এবং মিলিয়েও রাখতেন না।[৬০] তিনি দুইহাত কাঁধ পর্যন্ত তুলতেন।[৬১]

মাঝে-মধ্যে কানের লতি পর্যন্ত হাত তুলতেন।[৬২]

বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা

রসূলুল্লাহ (সঃ) বাম হাতের উপর ডান হাত রাখতেন[৬৩]

---

৫৬. আহমদ। বায়হাকী সহীহ সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন।
৫৭. বোখারী, নাসাঈ।
৫৮. ঐ।
৫৯. বোখারী, আবু দাউদ।
৬০. আবু দাউদ, ইবনু খোযায়মাহ, হাকেম, তাম্মাম।
৬১. বোখারী, নাসাঈ।
৬২. বোখারী আবু, দাউদ।
৬৩. মুসলিম, আবু দাউদ।

এবং বলতেন, আমাদের নবীগণকে ইফতার দ্রুত করা, সেহরী বিলম্বে খাওয়া এবং নামাযে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[৬৪]

একবার তিনি এক নামায পড়া ব্যক্তির পাশে দিয়ে যাওয়ার সময় দেখেন যে, সে ডান হাতের উপর বাম হাত রেখেছে। তিনি তার হাত পৃথক করে দিয়ে তার ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে দেন।[৬৫]

বুকে হাত রাখা

তিনি বাম হাতের পিঠ ও কব্‌যার উপর ডান হাত রাখতেন [৬৬] এবং এরূপ করার জন্য সাহাবায়ে কেরামকে আদেশ দেন। [৬৭]

কখনও তিনি বাম হাতকে ডান হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরতেন। (নাসাঈ ও দার কুতনী-সনদ সহীহ) হাদীস থেকে বুঝা যায় হাতের উপর হাত রাখা কিংবা আঁকড়ে ধরা উভয়টিই সুন্নত। তবে হানাফী মাযহাবের কিছু লোক দু'টো বিষয়কে এক সাথে করা উত্তম বলেছেন। কিন্তু এটা বেদআত। তারা বলেছেন, বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে ডান হাতের কনিষ্ঠ ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে বাম হাতের কব্জি আঁকড়ে ধরতে হবে এবং অবশিষ্ট তিন আঙ্গুল বিছিয়ে দিতে হবে। [৬৮]

রসূলুল্লাহ (সঃ) দু'হাত বুকের উপর রেখে নামায পড়তেন। [৬৯] তিনি কোমরের উপর হাত রেখে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। [৭০] কোমর বলতে কোমরের হাড় বুঝানো হয়েছে। এর উপর হাত রাখতে রসূলুল্লাহ (সঃ) নিষেধ করেছেন। [৭১]

---

৬৪. ইবনু হিব্বান, আয্‌যিয়া সহীহ সনদ সহকারে তা বর্ণনা করেছেন।

৬৫. আহমদ, আবু দাউদ বিশুদ্ধ সনদ সহকারে।

৬৬. আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনু খোযায়মাহ বিশুদ্ধ সনদ সহকারে, ইবনু হিব্বানও একে সহীহ বলেছেন।

৬৭. মালেক, বোখারী, আবু আওয়ানা।

৬৮. হাশিয়া ইবনু আবেদীন-রদ্দুল মোহতার।

৬৯. আবু দাউদ, ইবনু খোযায়মাহ, আহমদ। তারীখে ইসপাহান-আবুশ শেখ, পৃঃ ১২৫। তিরমিযী এর একটি সনদকে উত্তম বলেছেন। একই অর্থে মোআত্তা ও বোখারীতে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। বুকের উপর হাত রাখাই সুন্নত হিসেবে হাদীসে বর্ণিত আছে। এর বিপরীত বর্ণনা হয় দুর্বল, না হয় ভিত্তিহীন। ইমাম ইসহাক বিন রাহওয়াহ এই সুন্নতের উপর আমল করেছেন।

৭০. বোখারী, মুসলিম।

৭১. আবু দাউদ, নাসাঈ প্রভৃতি।

সাজদার স্থানের প্রতি নযর রাখা ও বিনয়ী হওয়া

রসূলুল্লাহ (সঃ) নামায পড়ার সময় মাথা নীচু করতেন এবং দৃষ্টি যমীনের উপর রাখতেন। [৭২] তিনি যখন কাবা শরীফের ভেতর ঢুকেন, তখন তাঁর দৃষ্টি সাজদার জায়গা ছাড়া আর কোনো দিকে নিবদ্ধ ছিল না, যে পর্যন্ত না তিনি সেখান থেকে বের হন। [৭৩]

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, ঘরে এমন কোনো জিনিস থাকা উচিত নয়, যা নামাযীর মনকে ব্যস্ত রাখতে পারে।[৭৪]

তিনি নামাযে আকাশের দিকে তাকাতে নিষেধ করেছেন। [৭৫] শুধু তাই নয়, তাকীদ সহকারে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'হয় লোকেরা আসমানের দিকে তাকানো বন্ধ করবে, আর না হয় তাদের চোখ আর ফিরে আসবে না।' অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, 'আর না হয় তাদের চোখ কেড়ে নেয়া হবে।' [৭৬]

অন্য এক হাদীসে এসেছে, 'তোমরা যখন নামায পড়বে, তখন এদিক-ওদিক তাকাবে না। কারণ, আল্লাহ নিজ চেহারা বান্দার চেহারার দিকে নিবদ্ধ রাখেন যতোক্ষণ না বান্দা এদিক-ওদিক তাকায়।' [৭৭] এদিক সেদিক তাকানোর বিষয়ে তিনি আরো বলেছেন, 'এটা হচ্ছে বান্দার নামাযে শয়তানের ছোবল।' [৭৮]

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 'নামাযে আল্লাহর দৃষ্টি সে পর্যন্ত বান্দার দিকে থাকে যে পর্যন্ত বান্দা এদিক-সেদিক না তাকায়। যখন সে এদিক-ওদিক তাকানোর জন্য মুখ ফিরায়, আল্লাহও নিজ মুখ ফিরিয়ে নেন।' [৭৯]

রসূলুল্লাহ (সঃ) নামাযে তিনটি কাজ নিষেধ করেছেন। প্রথম হচ্ছে দুই সাজদার মাঝখানে সোজা হয়ে না বসে মোরগের মতো ঠোকর দেয়া (অর্থাৎ সাজদা করা)। দ্বিতীয় হচ্ছে, কুকুরের মতো বসা এবং তৃতীয় হচ্ছে, শিয়ালের মতো এদিক-ওদিক তাকানো। [৮০]

---

৭২. বায়হাকী, হাকেম।
৭৩. ঐ
৭৪. আবু দাউদ, আহমদ বিশুদ্ধ সনদ সহকারে।
৭৫. বোখারী, আবু দাউদ।
৭৬. বোখারী, মুসলিম।
৭৭. তিরমিযী, হাকেম।
৭৮. বোখারী,, আবু দাউদ।
৭৯. আবু দাউদ, ইবনু খোযায়মাহ ও ইবনু হিব্বান এটাকে সহীহ বলেছেন।
৮০. আহমদ, আবু ইয়ালী-তারগীব।

তিনি আরো বলেছেন, মৃত্যুপথ যাত্রীর শেষ নামাযের মতো মনোযোগ সহকারে নামায পড় এবং মনে কর যে, তুমি আল্লাহকে দেখছ। আর যদি তুমি তাঁকে নাও দেখ, তাহলে তিনি অবশ্যি তোমাকে দেখেন।[৮১]

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, ফরয নামায উপস্থিত হলে কোন ব্যক্তি যদি ভালভাবে উযু করে, বিনয় (খুশু') সহকারে নামায পড়ে এবং ভালভাবে রুকু করে, তাহলে তা তার সগীরা গুনাহর ক্ষতিপূরণ (কাফ্‌ফারা) হবে যে পর্যন্ত সে কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে। এভাবেই যুগের পর যুগ চলতে থাকবে।[৮২]

রসূলুল্লাহ (সঃ) চিহ্ন বিশিষ্ট কাল পশমী কাপড়ে নামায পড়েন এবং কাপড়ের চিহ্নের প্রতি একবার নযর করেন। নামায শেষ হলে তিনি বলেন, আমার এই কাপড়টি আবু জাহামের কাছে নিয়ে যাও এবং তার চিহ্নবিহীন মোটা কাপড়টি নিয়ে আস। কেননা, এই কাপড়টি আমাকে নামায থেকে অন্যমনস্ক করে দিয়েছিল।[৮৩] অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, আমি নামাযে কাপড়ের চিহ্নের দিকে নযর করি যা আমাকে প্রায় ফেতনার মধ্যে ফেলে দিচ্ছিল।

আয়েশা (রাঃ)-এর একটি কাপড়ে ছবি ছিল এবং ছোট একটি ঘরে টানানো ছিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ দিকে মুখ করেই নামায পড়তেন। তিনি বললেন, আয়েশা, ওটি আমার সামনে থেকে সরিয়ে নাও। নামাযে কাপড়ের ছবিটির প্রতি আমার দৃষ্টি যায়।[৮৪]

রাসূলুল্লাহ (সঃ) আরো বলেছেন, খাবার উপস্থিত হলে কোন নামায নেই এবং পেশাব-পায়খানা আটকিয়ে রেখেও কোনো নামায নেই।[৮৫] নামাযে বিনয়ের স্বার্থে এদু'টো বিষয়ের কথা বলা হয়েছে।

নামায শুরুর দোআ

রসূলুল্লাহ (সঃ) নামাযে সূরা কিরাআত শুরুর আগে বিভিন্ন দোআ পড়তেন। ঐ সকল দোআয় তিনি মূলত আল্লাহর প্রশংসা, শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণ-গান বর্ণনা করতেন। তিনি ভুল নামায আদায়কারী একজন সাহাবীকে শোধরানোর

---

৮১. ইবনু মাজাহ, আহমদ, তাবারানী, ইবনু আসাকির।

৮২. মুসলিম।

৮৩. বোখারী, মুসলিম, মালেক।

৮৪. বোখারী, মুসলিম, আবু আওয়ানা। তিনি ছবিটি সরিয়ে নিতে বললেন, কিন্তু তা ছিঁড়ে ফেলতে না বলার কারণ, সম্ভবত তাতে কোনো প্রাণীর ছবি ছিল না। বোখারী ও মুসলিম শরীফের অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি প্রাণীর ছবি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে ফাতহুল বারী এবং গায়াতুল মোরাম ফী তাখরীজি আহাদীসিল হালাল ওয়াল হারাম গ্রন্থের ১৩১-১৪৫ নং হাদীসে।

৮৫. বোখারী মুসলিম, ইবনু আবী শায়বা।

সময় বলেছিলেন, 'কোন ব্যক্তির নামায সেই পর্যন্ত পরিপূর্ণ হয় না, যে পর্যন্তনা সে (তাকবীর) আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব, (হামদ) প্রশংসা ও (সানা) গুণ-গান করে এবং পরে সাধ্য অনুযায়ী যতোটুকু সম্ভব কোরআন থেকে পাঠ করে। [৮৬]

১. তিনি একেক সময় একেক দোআ পড়তেন। কোন কোন সময় নিম্নোক্ত দোআ পড়তেন ঃ

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِيْ مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ـ

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! আমার ও আমার গুনাহর মধ্যে সেরকম দূরত্ব সৃষ্টি করো যেমন দূরত্ব রয়েছে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ! আমাকে গুনাহ থেকে এমনভাবে পরিষ্কার করে দাও যেমন করে সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে ধবধবে পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ! আমাকে গুনাহ থেকে পানি, বরফ ও শীতলতা দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে দাও।"

এ দোআটি পড়তেন তিনি ফরয নামাযে। [৮৭]

২. তিনি ফরয, সুন্নত ও নফল নামাযে নিম্নোক্ত দোআও পড়েছেন ঃ

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ـ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ اَنْتَ رَبِّيْ وَاَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ جَمِيْعًا اِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ وَاهْدِنِيْ لِاَحْسَنِ الْاَخْلَاقِ لَا يَهْدِيْ لِاَحْسَنِهَا اِلَّا اَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّيْ سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِيْ يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ وَالْمَهْدِيْ مَنْ هَدَيْتَ اَنَا بِكَ وَاِلَيْكَ لَا مَنْجَاَ وَلَا مَلْجَاَ مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ ـ

---

৮৬. ঐ।

৮৭. আবু দাউদ, হাকেম এবং আল্লামা হাফেয আয্যাহাবী একে সহীহ হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন।

অর্থ ঃ "আমি সঠিক সরল পথের অনুসারী মুসলিম হিসেবে আমার চেহারা সেই আল্লাহর দিকে ফিরালাম যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিশ্চিয়ই আমার নামায, সুকৃতি ও কোরবানী, আমার জীবন ও মৃত্যু বিশ্বজগতের রব মহান আল্লাহর জন্য নিবেদিত। তাঁর কোনো শরীক নেই, আমাকে একাজেরই নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং আমি মুসলমানদের প্রথম। হে আল্লাহ! তুমি শাহানশাহ, তুমি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। আমি তোমার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি। তুমি আমার রব এবং আমি তোমার গোলাম। আমি আমার আত্মার উপর যুলুম করেছি এবং আমার গুনাহ্‌ স্বীকার করছি। আমার সকল গুনাহ্‌ মাফ করে দাও। তুমি ছাড়া আর কেউ গুনাহ্‌ মাফকারী নেই। আমাকে সর্বোত্তম চরিত্রের পথ দেখাও। তুমি ছাড়া আর কেউ তা দেখাতে পারে না। আমাকে খারাপ চরিত্র থেকে দূরে রাখ। তুমি ছাড়া আর কেউ আমাকে তা থেকে দূরে রাখতে পারে না। আমি তোমার আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তোমার দীনের সাহায্য ও অনুসরণে সদা প্রস্তুত। সকল কল্যাণ তোমার হাতে। তোমার প্রতি কোনো মন্দ কাজের সম্বোধন করা যায় না। তুমি যাকে পথ দেখিয়েছ সেই হেদায়াত প্রাপ্ত। আমি তোমার সাথে আছি ও তোমার প্রতি আশাবাদী হয়ে আছি। তুমি ছাড়া আমার মুক্তি ও আশ্রয়ের কোনো জায়গা নেই। তুমি বরকতময় ও শ্রেষ্ঠ। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই এবং তাওবাহ করছি।[৮৮]

৩. কখনো তিনি উপরোল্লিখিত দোআই পড়তেন সামান্য পরিবর্তন সহকারেঃ

اَنْتَ رَبِّىْ وَاَنَا عَبْدُكَ ـ

বাক্যটি বাদ দিতেন এবং নিম্নের বাক্যটি অতিরিক্ত যোগ করতেন ঃ[৮৯]

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ـ

৪. কখনো তিনি উপরোক্ত দোআটি وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

পর্যন্ত পড়ে তারপর নিম্নের অংশটুকু যোগ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِهْدِنِىْ لِاَحْسَنِ الْاَخْلَاقِ وَاَحْسَنِ الْاَعْمَالِ لَايَهْدِىْ

৮৮. মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, আহমদ, তাবারানী, শাফেঈ, আবু আওয়ানা। যারা এটিকে শুধু নফল নামাযের সাথে সীমাবদ্ধ করেছেন, তারা কল্পনার ভিত্তিতেই তা করেছেন।

৮৯. নাসাঈ, বিশুদ্ধ সনদ সহকারে।

لِاَحْسَنِهَا اِلَّا اَنْتَ وَقِنِيْ سَيِّئَ الْاَخْلَاقِ وَالْاَعْمَالِ لَا يَقِيْ سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ ـ

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! আমাকে উত্তম চরিত্র ও উত্তম আমলের পথ দেখাও। তুমি ছাড়া আর কেউ তা দেখাতে পারে না। আমাকে খারাপ চরিত্র ও আমল থেকে বাঁচাও, তুমি ছাড়া আর কেউ তা থেকে বাঁচাতে পারে না।" [৯০]

৫. তিনি কখনো কখনো এই দোআ পড়েছেন ঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ ـ

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! তুমি সকল ত্রুটি থেকে মুক্ত ও পবিত্র। আমরা সর্বদা তোমার প্রশংসা করি। তোমার নামের বরকত অনেক বেশি এবং তোমার সম্মান ও মর্যাদা অনেক উঁচু। তুমি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই।" [৯১]

রসূলুল্লাহ (সঃ) এই দোআটি সম্পর্কে বলেছেন, আল্লাহর কাছে বান্দার সর্বাধিক প্রিয় বাক্য হল ঃ [৯২] .... سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ

৬. রাত্রের নামাযে তিনি উপরোক্ত দোআর সাথে আরও একটু বাড়িয়ে বলতেন ঃ

তিনবার .... لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

এবং তিনবার পড়তেন। [৯৩] اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا

৭. একবার এক সাহাবী এই দোআ পড়েন ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاصِيْلًا

---

৯০. নাসাঈ, দারু কুতনী বিশুদ্ধ সনদ সহকারে।

৯১. আবু দাউদ, হাকেম। আল্লামা যাহাবী একে সহীহ বলেছেন।

৯২. ইবনু মান্দাহ আত্‌তাওহীদ কিতাবের ২য় খন্ডে ১২৩ পৃঃ বিশুদ্ধ সনদ সহকারে এবং 'নাসাঈ ফিল ইয়াওম ওয়াল লাইলা' বইতে এটি বর্ণনা করেছেন।

৯৩. আবু দাউদ, তাহাবী বিশুদ্ধ সনদ সহকারে।

অর্থ ঃ "আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহান, অত্যধিক প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করি।'

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, আমি এটি শুনে দারুণ আনন্দিত হয়েছি। কারণ, এই দোআর ফলে আসমানের দরযা খুলে গেছে। [৯৪]

৮. একজন সাহাবী নীচের দোআটি পড়েন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ ـ

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, আমি ১২ জন ফেরেশতাকে এ দোআ উপরে উঠানোর ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করতে দেখেছি। [৯৫]

৯. রসূলুল্লাহ (সঃ) রাত্রের নামাযে নিম্নের দোআগুলো পড়তেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِمْ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ مَلِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِمْ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَلِقَاءُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ ـ اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ اَنْتَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ فَاغْفِرْلِيْ مَاقَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّيْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ اَنْتَ اِلٰهِيْ لَااِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ـ

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমার, তুমি আসমান, যমীন এবং উভয়ের মধ্যে যারা আছে তাদের জন্য আলো। সমস্ত প্রশংসা তোমার, তুমি আসমান ও যমীন এবং উভয়ের মধ্যে যা আছে তাদের রক্ষক ও হেফাযতকারী। সমস্ত প্রশংসা তোমার, তুমি আসমান ও যমীন এবং ঐ উভয়ের মধ্যে যারা আছে তাদের বাদশাহ। সমস্ত প্রশংসা তোমার, তুমি সত্য,

---

৯৪. মুসলিম, আবু আওয়ানা। আবু নাঈম আখবারে ইসপাহানে জোবায়ের বিন মোতয়েম থেকে বর্ণনা করেছেন, জোবায়ের রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে নফল নামাযে তা বলতে শুনেছেন।

৯৫. মুসলিম।

তোমার ওয়াদা সত্য, কথা সত্য, তোমার সাথে সাক্ষাত হওয়া সত্য, বেহেশত সত্য, দোযখ সত্য, কেয়ামত সত্য, নবীরা সত্য এবং নবী মোহাম্মদ সত্য। হে আল্লাহ! তোমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই ইসলাম গ্রহণ করেছি, তোমার উপর নির্ভর করেছি, তোমার উপর ঈমান এনেছি, তোমার দিকে ফিরে এসেছি, তোমার উদ্দেশ্যে বিরোধ করেছি এবং তোমার বিধান মতো ফয়সালা করেছি। তুমি আমাদের রব এবং তোমার কাছেই আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। আমাদের অতীত ও ভবিষ্যতের গুনাহ মাফ কর, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ত্রুটি ক্ষমা কর এবং আমার বিষয়ে যা তুমি জান তাও মাফ কর। তুমিই প্রথম এবং তুমিই শেষ। তুমি আমার মাবুদ, তুমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই।" [৯৬]

১০.

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ، فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ اِنَّكَ تَهْدِىْ مَنْ تَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ-

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! জিবরাঈল, মিকাঈল ও ইসরাফীলের রব, আসমান ও যমীনের স্রষ্টা এবং প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়ের জ্ঞানী; তুমিই বান্দাদের মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে তাদের মধ্যে ফয়সালা করে থাক। তোমার অনুগ্রহে আমাকে মতবিরোধকৃত সত্যের ব্যাপারে সঠিক পথ দেখাও।তুমিই যাকে ইচ্ছা সহজ-সরল পথ দেখাও। [৯৭]

১১. রসূলুল্লাহ (সঃ) ১০ বার তাকবীর (আল্লাহু আকবার), ১০ বার আল্লাহর প্রশংসা (আলহামদু লিল্লাহ), ১০ বার আল্লাহর পবিত্রতা (সুবাহানাল্লাহ), ১০ বার লাইলাহা ইল্লাল্লাহু বলতেন এবং ১০ বার গুনাহ মাফ (ইস্তেগফার) চাইতেন। তারপর ১০ বার বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ وَعَافِنِىْ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে মাফ কর, হেদায়াত দাও, রিযক দাও এবং সুস্থতা দাও।

এরপর ১০ বার বলতেন ঃ

৯৬. বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, আবু আওয়ানা, দারেমী, ইবনু নসর।

৯৭. মুসলিম, আবু আওয়ানা।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الضِّيْقِ يَوْمَ الْحِسَابِ ـ

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! আমি হাশরের হিসাব-নিকাশের দিনের সংকীর্ণতা ও কষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় চাই।" [৯৮]

১২. রসূলুল্লাহ (সঃ) তিনবার اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে আরো বলতেন ঃ

ذُوالْمَلَكُوْتِ وَالْجَبَرُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ ـ

অর্থ ঃ "আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, শক্তি ও কুদরত, কঠোরতা, গর্ব এবং মহত্ত্বের মালিক।" [৯৯]

সূরা-কেরাআত পাঠ

দোয়া পাঠের পর রসূলুল্লাহ (সঃ) প্রথমে আল্লাহর কাছে নিম্নরূপ বাক্যে আশ্রয় চাইতেন ঃ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ ـ

অর্থ ঃ "আমি আল্লাহর কাছে অভিশপ্ত শয়তানের মাতলামি, গর্ব-অহংকার ও মন্দ কবিতা [১০০] থেকে আশ্রয় চাই।" [১০১]

ভাল কবিতায় জ্ঞান ও কৌশলের কথা আছে।' (বোখারী)

তিনি কখনও আরো একটু বাড়িয়ে দোআটি এরূপ পড়তেন ঃ [১০২]

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ ....

তারপর তিনি 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পাঠ করতেন এবং এগুলো তিনি নিঃশব্দে পড়তেন। [১০৩]

---

৯৮. আহমদ, ইবনু আবী শায়বাহ,আবু দাউদ, তাবারানী বিশুদ্ধ সনদ সহকারে।

৯৯. আবু দাউদ, আততায়ালিসী–বিশুদ্ধ সনদসহ।

১০০. হাম্‌য্‌, নাফাখ ও নাফাছ শব্দ তিনটির উপরোক্ত অর্থ বিশুদ্ধ মোরসাল সনদ সহকারে রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। কবিতা বলতে মন্দ কবিতা বুঝাবে। কেননা, ভাল কবিতার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ اِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً

১০১. আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ, দারু কুতনী। হাকেম, ইবনু হিব্বান ও আল্লামা যাহাবী একে সহীহ বলেছেন।

১০২. আবু দাউদ, তিরমিযী, আহমদ—সনদ বিশুদ্ধ।

১০৩. বোখারী, মুসলিম, আবু আওয়ানা তাহাবী, আহমদ।

অতপর তিনি সূরা ফাতেহা পাঠ করতেন এবং এক আয়াত এক আয়াত করে থেমে থেমে পড়তেন। তিনি اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ বলে থামতেন। اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়ে থামতেন। مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ বলে থামতেন।

এইভাবে সূরা শেষ করার আগ পর্যন্ত প্রতিটি আয়াত শেষে থামতেন। এক আয়াতের সাথে আরেক আয়াতকে বিরতিহীনভাবে পড়তেন না।[১০৪] তিনি কখনও مالك না পড়ে বিনা মদে مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ পড়তেন।[১০৫]

সূরা ফাতেহা নামাযের রোকন হওয়া এবং এর ফযীলত

রসূলুল্লাহ (সঃ) এই সূরার সম্মান ও মর্যাদা প্রসঙ্গে বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা ফাতেহা এবং আরও অতিরিক্ত কেরাআত পড়ে না, তার নামায ঠিক হয় না। (বোখারী, মুসলিম, বায়হাকী, আবু আওয়ানা)

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, যে ব্যক্তি নামায পড়ল কিন্তু সূরা ফাতেহা পড়ল না, তার নামায অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ। (মুসলিম, আবু আওয়ানা)

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, আল্লাহ বলেছেন, আমি নামাযকে আমার ও বান্দার মাঝে দুই ভাগে ভাগ করেছি। অর্থাৎ সূরা ফাতেহাকে দুই ভাগে ভাগ করেছি। এক ভাগ আমার, অপর ভাগ বান্দার। বান্দা যা চাইবে তাই পাইবে। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমরা (ফাতেহা) পড়। কারণ যখন বান্দাহ বলে,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

এর জওয়াবে আল্লাহ বলেন, 'বান্দাহ আমার প্রশংসা করেছে।' তারপর বান্দাহ যখন বলে, اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ। আল্লাহ এর জওয়াবে বলেন, 'বান্দাহ আমার গুণ-গান করেছে।' বান্দাহ যখন বলে مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ আল্লাহ জওয়াবে বলেন, 'বান্দাহ আমাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করেছে।' বান্দাহ যখন বলে اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ। আল্লাহ বলেন, 'এটাই আমার ও আমার বান্দাহর মাঝের সম্পর্ক, বান্দাহ যা চাইবে, তা পাবে।' বান্দাহ যখন বলে

---

১০৪. আবু দাউদ, আস্‌সাহমী, হাকেম ও আল্লামা যাহাবী একে বিশুদ্ধ বলেছেন।

১০৫. তাম্মাম আর রাযী, ইবনু আবু দাউদ, আবু নাঈম। হাকেম ও যাহাবী একে সহীহ বলেছেন।

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ۔

আল্লাহ্ বলেন, 'এগুলো সব আমার বান্দার জন্য (মন্‌যুর করা হল) আমার বান্দাহ যা চাইবে তাই পাবে।' [১০৬]

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলতেন ঃ আল্লাহ তাওরাত ও ইনজীলে উম্মুল কোরআনের (ফাতেহা) মত কোনো সূরা নাযিল করেননি। এতে বারবার পড়ার মতো ৭টি আয়াত আছে। [১০৭] এটি মহা কোরআন যা আমি আপনাকে দিয়েছি।' (আল-কোরআন)

রসূলুল্লাহ (সঃ) ভুল নামায আদায়কারীকে সংশোধন করার সময় নামাযে সূরা ফাতেহা পড়তে নির্দেশ দেন। [১০৮]

তিনি আরো বলেছেন, যে ব্যক্তি এ সূরা মুখস্থ্ করতে পারেনি, সে যেন পড়েঃ

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ۔[১০৯]

রসূলুল্লাহ (সঃ) ভুল নামায আদায়কারীকে শোধরানোর সময় বলেছিলেন, যদি কোরআন তোমার জানা থাকে, তাহলে তাই পড়, অন্যথায় হামদ, তাকবীর ও তাহলীল বল।অর্থাৎ এরূপ পড় ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ۔[১১০]

ইমামের প্রকাশ্য কেরাআতে মুকতাদি কেরাআত পড়বে না

রসূলুল্লাহ (স) মুক্তাদীদেরকে প্রথম দিকে প্রকাশ্য কেরাআত বিশিষ্ট নামাযে ইমামের পেছনে কোরআন পড়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। একদিন

---

১০৬. মুসলিম, মালেক, আবু আওয়ানা। আস্‌সাহমী 'তারীখে জুরজানে' জাবের (রাঃ) থেকে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত আছে।

১০৭. নাসাঈ, হাকেম এবং আল্লামা যাহাবী একে সহীহ্ বলেছেন।

১০৮. বোখারী বিশুদ্ধ সনদ-ইমামের পেছনে কেরাআত পড়ার অধ্যায়।

১০৯. আবু দাউদ, ইবনু খোযায়মাহ, হাকেম, তাবারানী, ইবনু হিব্বান। হাকেম ও যাহাবী একে সহীহ বলেছেন।

১১০. আবু দাউদ, তিরমিযী।

ফজরের সময় তিনি কেরাআত পড়েন এবং তা তাঁর জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ে। নামায শেষে তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ "তোমরা সম্ভবত ইমামের পেছনে কেরাআত পড়! আমরা বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা দ্রুত কেরাআত পড়ি। তিনি বললেন, তোমরা এরূপ কর না। তবে কেউ ইচ্ছা করলে শুধু সূরা ফাতেহা পড়তে পারে। কারণ যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতেহা না পড়ে, তার নামায নেই।[১১১]

এরপর তিনি সকল প্রকাশ্য কেরাআত বিশিষ্ট নামাযে ইমামের পেছনে মুক্তাদীর পড়া নিষিদ্ধ করেন। কেননা একবার তিনি প্রকাশ্য কেরাআত বিশিষ্ট নামায শেষে (এক বর্ণনায় তা ছিল ফজরের নামায) জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি আমার সাথে নামাযে কেরাআত পড়েছিলে? এক ব্যক্তি বলল, হাঁ, 'আমি, হে রসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, অন্যরা যখন কেরাআত পড়ে, তখন আমি কেন আর কেরাআত পড়বো? রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ঐ কথা শুনে লোকেরা প্রকাশ্য কেরাআত বিশিষ্ট নামাযে কেরাআত পড়া সম্পূর্ণ ত্যাগ করেন এবং শুধুমাত্র ইমামের অপ্রকাশ্য কেরাআত বিশিষ্ট নামাযে মনে মনে কেরাআত পড়েন।[১১২]

ইমামের কেরাআতের সময় চুপ করে থাকাকে ইমামের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন 'অনুকরণের উদ্দেশ্যে ইমাম নিয়োগ করা হয়েছে। ইমাম তাকবীর বললে তোমরাও তাকবীর বলবে এবং ইমাম কেরাআত পড়লে তোমরা চুপ করে থাকবে।[১১৩]

ইমামের পেছনে কেরাআত পড়ার পরিবর্তে কেরাআত শুনাকে যথেষ্ট বিবেচনা করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ যার ইমাম আছে, ইমামের কেরাআতই তার কেরাআত।[১১৪]

এটা হচ্ছে, প্রকাশ্য কেরআত বিশিষ্ট নামাযের বিধান।

---

১১১. বোখারী, আবু দাউদ, আহমদ। তিরমিযী ও দারু কুতনী এটাকে উত্তম হাদীস বলেছেন।

১১২. মালেক, হোমায়দী, বোখারী, আবু দাউদ, মাহালেমী। তিরমিযী এটাকে উত্তম এবং আবু হাতেম রাযী, ইবনু হিব্বান ও ইবনুল কাইয়্যেম এটাকে সহীহ বলেছেন। হযরত উমর (রাঃ) থেকে অনুরূপ আরেকটি হাদীস বর্ণিত আছে। তাতে বলা হয়েছে, 'আমি কেন কোরআন পড়া নিয়ে বিবাদ করবো? ইমামের কেরাআত কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয়? ইমামকে অনুকরণীয় বানানো হয়েছে। ইমাম যখন কেরাআত পড়বে, তখন তোমরা চুপ করে থাকবে। বায়হাকী, জামে আল-কবীর।

১১৩. ইবনু আবী শায়বা, আবু দাউদ, মুসলিম, আবু আওয়ানা, আর-রুইয়ানী।

১১৪. ইবনু আবী শায়বা, দারু কুতনী, ইবনু মাজাহ, আহমদ।

ইমামের অপ্রকাশ্য কেরাআতে মুকতাদী কেরাআত পড়বে

সাহবায়ে কেরাম অপ্রকাশ্য কেরাআত বিশিষ্ট নামাযে কেরাআত পড়ার বিষয়টি অনুমোদন করেছেন। জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আমরা যোহর ও আসরের নামাযের প্রথম দুই রাকআতে ইমামের পেছনে সূরা ফাতেহা ও একটি সূরা এবং শেষ দুই রাকআতে শুধুমাত্র সূরা ফাতেহা পড়তাম।[১১৫]

তবে রসূলুল্লাহ (সঃ) কেবলমাত্র আওয়াজকে অপছন্দ করেছেন। (কেরাআত পড়াকে নয়)। একবার যোহরের নামায পড়ার সময় তিনি সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের মধ্যে কে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى পড়েছে? একজন জওয়াবে বলেন, 'আমি'। তবে 'আমি ভাল ছাড়া অন্য কারণে তা করিনি।' তিনি বললেন, আমি বুঝতে পেরেছি একজন নামাযে আমার সাথে কেরাআত নিয়ে টানা-হেঁচড়া করছিল।[১১৬] অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, তারা নবী করীম (সঃ)-এর পেছনে জোরে কেরাআত পড়তেন। তখন তিনি বলেন, তোমরা আমার কোরআন পড়ায় বাধা সৃষ্টি করেছ।[১১৭]

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ নামাযী ব্যক্তি আল্লাহর সাথে গোপনে কথা বলে। সে কার সাথে গোপনে কথা বলে তা খেয়াল করা উচিত। তোমরা একে অন্যের কেরাআতের সময় জোরে কেরাআত পড়বে না।[১১৮]

তিনি আরো বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের একটি অক্ষর পাঠ করে তার জন্য রয়েছে ১টি কল্যাণ বা সওয়াব। প্রতিটি নেক কাজের ১০ গুণ বিনিময় দেয়া হয়। আমি বলি না যে, আলিফ-লাম-মীম একটি অক্ষর। বরং আলিফ একটি অক্ষর, লাম একটি অক্ষর এবং মীম একটি অক্ষর।[১১৯]

নিম্নের হাদীসটি মিথ্যা ঃ যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে কেরাত পড়ে আগুন দ্বারা তার মুখ ভর্তি করে দেয়া হবে।' এটি সিলসিলাতুল আহাদীস আদ্ব দাইফা গ্রন্থের ৫৬৯ নং হাদীস।

---

১১৫. ইবনু মাজাহ-সনদ বিশুদ্ধ।

১১৬. মুসলিম, আবু আওয়ানা এবং আস-সেরাজ।

১১৭. বোখারী, আহমদ এবং আস-সেরাজ বিশুদ্ধ সনদ সহকারে।

১১৮. মালেক, বোখারী বিশুদ্ধ সনদ সহকারে আফআলুল ইবাদ গ্রন্থে।

নোট ঃ অপ্রকাশ্য কেরাআত বিশিষ্ট নামাযে মুকতাদীর কেরাআত পড়ার পক্ষে ইমাম শাফেঈ, ইমাম আবু হানীফার ছাত্র ইমাম মোহাম্মদ (এক রেওয়ায়াতে) ইমাম যুহরী, মালেক, ইবনুল মোবারক, আহমদ বিন হাম্বল এবং ইবনে তায়মিয়া মত দিয়েছেন।

১১৯. তিরমিযী, ইবনে মাজাহ বিশুদ্ধ সনদ সহকারে।

আমীন বলা এবং ইমামের প্রকাশ্যে আমীন বলা

সূরা ফাতেহা শেষ করে রসূলুল্লাহ (সঃ) জোরে 'আমীন' বলতেন এবং আওয়াজ দীর্ঘ করতেন। [১২০] 'আমীন' শব্দের অর্থ হল, 'কবুল কর'।

রসূলুল্লাহ (সঃ) মুকতাদীদের 'আমীন' বলার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যখন ইমাম বলবে ঃ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ - তখন তোমরা বলবে, 'আমীন'। ফেরেশতারাও আমীন বলে এবং ইমামও আমীন বলবে। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, যখন ইমাম 'আমীন' বলে, তোমরাও আমীন বলবে। তোমাদের আমীন ফেরেশতাদের আমীনের সাথে একত্রিত হয়। আরেক বর্ণনায় এসেছে, তোমাদের কেউ নামাযে 'আমীন' বললে, আসমানের ফেরেশতারাও 'আমীন' বলে। ফলে একের আমীন অন্যের আমীনের সাথে একত্রিত হয় ও মিশে যায়। তখন আল্লাহ ঐ মুসল্লীর অতীতের গুনাহ মাফ করে দেন। [১২১]

এক হাদীসে এসেছে, তোমরা আমীন বল আল্লাহ তা কবুল করবেন। [১২২]

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, ইহুদীরা তোমাদের ইমামের পিছনে সালাম ও আমীনের ব্যাপরে যতো বেশী হিংসা করে অন্য কোনো বিষয়ে এতো বেশি হিংসা করেনা। [১২৩ক]

সূরা ফাতেহার পর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কেরাআত

রসূলুল্লাহ (সঃ) সূরা ফাতেহার পর অন্য সূরা পড়তেন। কখনও সূরাটি দীর্ঘ করতেন এবং কখনও বিভিন্ন কারণে সংক্ষিপ্ত করতেন। যেমন, সফর, সর্দি-কাশি, অন্যান্য রোগ-শোক ও শিশুর কান্না ইত্যাদি সময় সংক্ষেপ করতেন।

আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) একদিন ফজরের নামায সংক্ষিপ্ত কেরাআত সহকারে পড়েন। অন্য আরেক হাদীসে আছে,

---

১২০. বোখারী-কেরাআত অধ্যায়, আবু দাউদ বিশুদ্ধ সনদ সহকারে।

১২১. বোখারী মুসলিম, নাসাঈ।

১২২. মুসলিম, আবু আওয়ানা।

১২৩-ক বোখারী-আলআদাব আল-মুফরাদ গ্রন্থে এবং ইবনু মাজাহ, ইবনু খোযায়মাহ, আহমদ এবং আস্-সেরাজ বিশুদ্ধ সনদ সহকারে।

নোট ঃ মুকতাদীরা ইমামের পেছনে জোরে ইমামের সাথে আমীন বলবে। ইমামের আগে কিংবা পরে আমীন না বলে একই সাথে বলতে হবে। বিষয়টি আমি আমার বিভিন্ন কিতাবে বিস্তারিত পর্যালোচনা করেছি। এর মধ্যে সিলসিলাতিল আহাদীস আযযাঈফা এবং সহীহ আত্তারগীব ওয়াত তারহীব অন্যতম।

একদিন রসূলুল্লাহ (সঃ) ফজরের নামায পড়েন এবং তাতে কোরআনের সবচাইতে ছোট ২টা সূরা পড়েন। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি কেন এতো সংক্ষেপ করেছেন? তিনি বলেন, আমি শিশুর কান্না শুনতে পেয়েছি।[১২৩খ] তখন আমি ভাবলাম যে, তার মা আমাদের সাথে নামায পড়ছে। আমি তার মাকে তার জন্য তাড়াতাড়ি অবসর করে দিলাম।[১২৪]

তিনি আরো বলেন, আমি নামায শুরু করার পর যখন দীর্ঘ কেরাআতের ইচ্ছা করি, তখন শিশুর কান্না শুনতে পাই। ফলে আমি কেরআত সংক্ষিপ্ত করি।কেননা, আমি শিশুর কান্নায় মায়ের গভীর উদ্বিগ্নতার কথা অনুভব করি।[১২৫]

তিনি কখনও সূরার প্রথম থেকে শুরু করে অধিকাংশ সময় তা শেষ করতেন।[১২৬] তিনি বলতেন, প্রত্যেক সূরাকে তার রুকু ও সাজদার অংশ দাও।[১২৭] অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, প্রত্যেক সূরার জন্য এক রাকআত। অর্থাৎ প্রত্যেক রাকআতে একটি করে সূরা পড়া উত্তম।[১২৮]

কোন সময় তিনি এক সূরাকে দুই রাকআতে ভাগ করে পড়তেন।[১২৯] আবার কোন সময় একই সূরাকে দ্বিতীয় রাকআতেও পুনরাবৃত্তিও করতেন।[১৩০]

কখনও তিনি একই রাকআতে দুই বা ততোধিক সূরা পড়তেন।[১৩১]

এক আনসারী সাহাবী মসজিদে কুবায় ইমামতি করতেন। তিনি সূরা ফাতেহা পড়ার পর সূরা ইখলাস পড়তেন। তারপর অন্য আরেকটি সূরা

১২৩-খ. এই হাদীসসহ এজাতীয় অন্যান্য হাদীস প্রমাণ করে যে, শিশুদেরকে মসজিদে আনা জায়েয আছে। শিশুদেরকে মসজিদে না আনার ব্যাপারে মুখে মুখে যে হাদীস প্রচলিত আছে, তা দুর্বল এবং তা দলীল হিসেবে পেশ করা যোগ্য নয়। হাদীসটি হচ্ছে, 'তোমাদের মসজিদ থেকে শিশুদেরকে দূরে রাখ।' ইবনুল জাওযী, আলমোনযেরী, আল হায়ছামী, ইবনে হাজার আসকালানী এবং আলবোসাইরী এটিকে দুর্বল হাদীস বলেছেন। আবদুল হক ইসবেলী একে ভিত্তিহীন বলেছেন।

১২৪. আহমদ বিশুদ্ধ সনদ সহকারে এবং ইবনু আবী দাউদ আলমাসাহেফ গ্রন্থে তা বর্ণনা করেছেন।

১২৫. বোখারী, মুসলিম।

১২৬. এ ব্যাপারে পরে অনেক হাদীস উল্লেখ করা হবে।

১২৭. ইবনু আবী শায়বা, আহমদ, আবদুল গনি আল-মাকদেসী।

১২৮. ইবনু নসর, তাহাবী-বিশুদ্ধ সনদসহ।

১২৯. আহমদ, আবু ইয়ালী।

১৩০. তিনি এমনটি ফজরের নামাযে করেছেন।

১৩১. সামনে বিস্তারিত দলীল আসবে।

পড়তেন। তিনি প্রত্যেক রাকআতে এরূপ করতেন। তাঁর সাথীরা তাকে এ বিষয়ে বলেন যে, তুমি এই সূরা দিয়ে নামায শুরু করার পর ভাব যে, তা যথেষ্ট নয়, তাই তুমি অন্য আরেকটি সূরা মিলাও। হয় তুমি এই সূরাই (ইখলাস) পড়বে, না হয় তা বাদ দিয়ে অন্য আরেকটি সূরা পড়বে। তিনি বললেন, আমি তা কখনও ছাড়বো না। তোমরা চাইলে আমি এই সূরা সহকারে তোমাদের ইমামতি করতে পারি। আর তোমরা অপছন্দ করলে আমি ইমামতি ছেড়ে দিতে পারি। অথচ তাদের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি এবং তারা তাকে ব্যতীত অন্য কাউকে ইমাম বানাতে অপছন্দ করতেন। নবী করীম (সঃ) তাদের কাছে আসলে তারা তাঁকে বিষয়টি জানান। তিনি জিজ্ঞেস করেন, হে অমুক! তোমার সাথীরা যা করার জন্য বলে তা করতে তোমার বাধা কি এবং কোন্ জিনিস তোমাকে ঐ সূরাটি প্রত্যেক রাকআতে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে? লোকটি জওয়াব দেয়, আমি সূরাটি (সূরা ইখলাস) ভালবাসি। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, ঐ সূরাটির প্রতি ভালবাসা তোমাকে বেহেশতে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে। [১৩২]

একই রাকআতে একই ধরনের সূরা কিংবা ভিন্ন ধরনের সূরা পড়া

রসূলুল্লাহ (সঃ) একই ধরনের লম্বা সূরাগুলো এক সাথে পড়তেন।[১৩৩] তিনি একই রাকআতে সূরা আররাহমান (৫৫:৭৮) এবং সূরা আন-নাজম (৫৩:৬২) পড়তেন। অনুরূপভাবে তিনি একই রাকআতে নিম্নের সূরা একত্রে পড়তেন ঃ

সূরা ক্বামার (৫৪ঃ৫৫) এবং সূরা আল্ হাক্কা (৬৯:৫২)

সূরা তূর (৫২:৪৯) এবং সূরা আয-যারিয়াত (৫১:৬০)

সূরা সাআলা সায়েলুন (৭০:৪৪) এবং ওয়ান্নাযিআত (৭৯:৪৬)

সূরা ওয়াকেআহ (৫৬:৯৬) এবং সূরা ক্বলম (৬৮:৫২)

সূরা সাআলা সায়েলুন লিল-মোতাফফেফীন (৮৩:৩৬) এবং আবাসা (৮০:৪২)

সূরা আল-মোদ্দাসসের (৭৪:৫৬) এবং সূরা আল-মোযযাম্মেল (৭৩:২০) সূরা দাহ্র (৭৬:৩১) এবং সূরা কেয়ামাহ (৭৫:৪০)

সূরা নাবা (৭৮ : ৪০) এবং সূরা আল-মোরসালাত (৭৭:৫০)

সূরা আদ্-দোখান (৪৪:৫৯) এবং সূরা তাকভীর (৮১:২৯)। [১৩৪]

---

১৩২. বোখারী, তিরমিযী।

১৩৩. একই ধরনের সূরা মানে, অর্থের দিক থেকে সাদৃশপূর্ণ সূরা। যেমন, উপদেশ, বিধান, কিস্সা ইত্যাদি। (সূরা ق থেকে শেষ পর্যন্ত সূরা গুলোকে সর্বসম্মতভাবে লম্বা সূরা বলা হয়।

১৩৪. বোখারী মুসলিম।

কোন সময় তিনি ৭টি লম্বা সূরা থেকে একাধিক সূরা এক সাথে পড়তেন। যেমন সালাতুল লাইলে তিনি এক রাকআতে সূরা বাকারা, সূরা নিসা এবং সূরা আলে-ইমরান পড়তেন। তিনি বলতেন, দীর্ঘ কেয়াম বিশিষ্ট নামায উত্তম।[১৩৫]

তিনি যখন এই আয়াত পড়তেন ঃ

اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْيِىَ الْمَوْتٰى-

তখন বলতেন سُبْحَانَكَ فَبَلٰى আর তিনি যখন পড়তেন سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى। তখন বলতেন, سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى [১৩৬]

প্রথমোক্ত আয়াতে আল্লাহ প্রশ্ন করেছেন, 'মহান আল্লাহ কি মৃতদেহকে জীবিত করতে সক্ষম নন? রসূলুল্লাহ (সঃ) এর জওয়াবে বলতেন ঃ তুমি পবিত্র এবং তুমি তা করতে সক্ষম। দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, 'তোমার মহান রবের পবিত্রতা বর্ণনা কর।' এর জওয়াবে তিনি বলতেন ঃ 'আমার মহান রবের জন্যে পবিত্রতা।'

শুধু সূরা ফাতেহা পড়াও জায়েয

মোআয (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে ইশার নামায পড়ে ঘরে ফিরে যেতেন এবং নিজ গোত্রের সাথীদের নিয়ে পুনরায় নামাযের ইমামতি করতেন।

এক রাত তিনি ফিরে যান এবং তাদের নিয়ে নামায পড়েন। তাঁর নিজ গোত্র বনী সালামার এক যুবকও তার সাথে নামায পড়েন। যুবকটির নাম সালিম। নামায দীর্ঘ হওয়ায় যুবকটি নামায ছেড়ে দেয় এবং মসজিদের এক প্রান্তে পৃথকভাবে নামায আদায় করে। তারপর নিজ উটের লাগাম ধরে বেরিয়ে যায়। মোআযের নামায শেষ হলে তাকে ঘটনাটি জানানো হয়। মোআয বলেন, তার মধ্যে মুনাফেকী আছে। আমি তার এই ঘটনার বিষয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে অবহিত করবো। যুবকটিও বলল, আমিও মোআযের বিষয়টি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ)- কে অবহিত করবো। পরের দিন সকালে তারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে যান। মোআয যুবকটি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে খবর দেন। যুবকটি বলেন, হে আল্লাহর রসূল! মোআয আপনার

---

১৩৫. মুসলিম, তাহাবী।

১৩৬. আবু দাউদ, বায়হাকী বিশুদ্ধ সনদ সহকারে। এটা নামাযের ভেতর ও বাইরে এবং ফরয ও নফলে করণীয়।

কাছে রাতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করে। পরে ফিরে যায় এবং আমাদের নামায দীর্ঘ করে। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, হে মোআয! তুমি কি ফেতনা সৃষ্টিকারী? রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, হে ভাতিজা! তুমি যখন নামায পড়, তখন তা কিভাবে আদায় কর? যুবকটি উত্তর দিল, আমি সূরা ফাতেহা পড়ি। তারপর আমি আল্লাহর কাছে বেহেশত প্রার্থনা করি এবং দোযখ থেকে আশ্রয় চাই। কিন্তু আমি আপনার ও মোআযের ঐ সকল সুরেলা কেরআত বুঝি না। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, আমি ও মোআয এই দু'টো কিংবা একটার মধ্যেই থাকি। (অর্থাৎ সূরা ফতেহার সাথে একটি সূরা, কিংবা শুধু সূরা ফাতেহা পড়ি) যুবকটি বলল, শীঘ্রই মোআয নিজ গোত্রে ফিরে আসার পর যখন শত্রুর আগমনের খবর পাবে, তখন বিষয়টি বুঝতে পারবে। বর্ণনাকারী বলেন, শত্রু আসার পর যুবকটি যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেল। এরপর রসূলুল্লাহ (সঃ) মোআযকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার ও আমার বিরুদ্ধে অভিযোগকারী প্রতিপক্ষের কি খবর? মোআয বলেন, হে আল্লাহর রসূল! সে আল্লাহকে সত্য জেনেছে। আমিই বরং তাকে মিথ্যা জ্ঞান করেছি। সে শহীদ হয়ে গেছে। [১৩৭]

প্রকাশ্যে ও গোপনে কেরাআত পড়া

রসূলুল্লাহ (সঃ) ফজরের ফরয নামায এবং মাগরিব ও ইশার ফরয নামাযের ১ম দুই রাকআতে প্রকাশ্যে কেরাআত পড়তেন। তিনি যোহর ও আসরের ফরয নামায, মাগরেবের ফরযের তৃতীয় রাকআত এবং ইশার ফরযের শেষ দুই রাকআতে কেরাআত অপ্রকাশ্যে পড়তেন। [১৩৮]

সাহাবায়ে কেরাম তাঁর দাড়ির নড়াচড়া দেখে বুঝতে পারতেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) অপ্রকাশ্যে কেরাআত পড়ছেন। [১৩৯]

কোন সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে আয়াত শুনাতেন। অর্থাৎ এতোটুকু অপ্রকাশ্য আওয়াযে পড়তেন যে, নিকটবর্তী লোকেরা তা শুনতে পেত। [১৪০]

---

১৩৭. ইবনু খোযায়মাহ, বায়হাকী-বিশুদ্ধ সনদ, আবু দাউদ। মুল ঘটনা বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, 'রসূলুল্লাহ (সঃ) দুই রাকআত নামায পড়েছেন, কিন্তু তাতে সূরা ফাতেহা ছাড়া আর কিছু পড়েননি।' আহমদ, মোসনাদে হারেস বিন উসামা। বায়হাকী দুর্বল সনদ সহকারে তা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মোআয ও ইবনু আব্বাসের হাদীস দ্বারা নামাযে শুধু সূরা ফাতেহা পড়ার যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছে।

১৩৮. ইমাম নববী বলেছেন, আমাদের পূর্বসূরীরা তাদের পূর্বসূরীদের কাছ থেকে সর্বসম্মতভাবে বিশুদ্ধ হাদীসের ভিত্তিতে এরূপ করে আসছেন।

১৩৯. বোখারী, আবু দাঊদ।

১৪০. বোখারী ও মুসলিম।

তিনি জুমআ, দুই ঈদ এবং ইস্তিস্কার (বৃষ্টি প্রার্থনার) নামাযে কেরআত প্রকাশ্যে পড়তেন। [১৪১]

রাতের নামাযে কেরাআত প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে পড়া [১৪২]

রসূলুল্লাহ (সঃ) রাতের নামাযে কখনও কেরাআত প্রকাশ্যে এবং কখনও অপ্রকাশ্যে পড়তেন। (মুসলিম, বোখারী আফআলুল ইবাদ গ্রন্থে)। তিনি যখন ঘরে কেরাআত পড়তেন, তখন হুজরায় যিনি থাকতেন তিনি তাঁর কেরাআত শুনতেন।-(আবু দাউদ, তিরমিযী-শামায়েল গ্রন্থে বিশুদ্ধ সনদ সহকারে) এ কথার অর্থ হল, তিনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যের মাঝামাঝি আওয়াজে কেরাআত পড়তেন।

তিনি কখনও আরও একটু উঁচু আওয়াজে কেরাআত পড়তেন। হুজরার বাইরে অবস্থানকারী ব্যক্তি তা শুনতে পেতেন। (নাসাঈ, তিরমিযী-শামায়েল গ্রন্থে এবং বায়হাকী 'আদ্‌দালায়েল' গ্রন্থে বিশুদ্ধ সনদ সহকারে তা বর্ণনা করেছেন)।

আর এ ভাবেই কেরাআত পড়ার জন্য তিনি আবু বকর এবং উমর (রাঃ)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এক রাতে তিনি বের হন এবং আবু বকর (রাঃ)-কে ছোট আওয়াজে নামায পড়তে দেখেন। তিনি উমর (রাঃ)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাঁকে উঁচু আওয়াজে নামায পড়তে দেখেন। তাঁরা উভয়ে যখন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছ একত্রিত হন, তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, হে আবু বকর! আমি তোমার কাছে দিয়ে যাওয়ার সময় তুমি ছোট আওয়াজে কেরাআত পড়ছিলে! আবু বকর বলেন, আমি যার কাছে দোয়া করেছি তাকে শুনিয়েছি ইয়া রসূলাল্লাহ! তিনি উমরকে বলেন, আমি তোমার কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তুমি উঁচু আওয়াজে নামায পড়ছিলে। উমর বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন লোককে জাগাই এবং শয়তানকে দূর করি। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, হে আবু বকর! তোমার আওয়াজ কিছুটা চড়া করো এবং উমরকে বলেন, তোমার আওয়াজ কিছুটা কমাও। [১৪৩]

---

১৪১. বোখারী, আবু দাউদ।

১৪২. আবদুল হক 'তাহাজ্জুদ' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ দিনে নফল ও সুন্নতে রসূলুল্লাহ (সঃ) প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে কিভাবে কেরাআত পড়তেন, তা সহীহ হাদীস দ্বারা জানা যায় না। তবে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, তিনি অপ্রকাশ্যে কেরাআত পড়েছেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বর্ণিত, একদিন তিনি আবদুল্লাহ বিন হোযাফার পাশ দিয়ে দিনে অতিক্রম করেন। আবদুল্লাহ দিনে প্রকাশ্যে কেরাআত পড়েন। তিনি আবদুল্লাহকে বলেন, হে আবদুল্লাহ! আল্লাহকে শুনাও, আমাদেরকে নয়। হাদীসটি দুর্বল।

১৪৩. আবু দাউদ, হাকেম। আল্লামা যাহাবী এটিকে সহীহ বলেছেন।

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, প্রকাশ্যে কোরআন পাঠকারী প্রকাশ্যে দান-সদকারীর মত এবং গোপনে কোরআন পাঠকারী গোপনে দান-সদকাকারীর মত। [১৪৪]

রসূলুল্লাহ (সঃ) নামাযে যা পড়তেন

রসূলুল্লাহ (সঃ) নামাযে যে সকল সূরা-কেরাআত পড়তেন, তা পাঁচ ওয়াক্‌ত নামাযসহ অন্যান্য নামাযে বিভিন্ন রকম হত। নীচে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো ঃ

১. ফজরের নামায

তিনি ফজরের নামাযে সূরা কাফ থেকে পরবর্তী ৭টি বড়ো সূরার যে কোনো একটি পড়তেন। [১৪৫]

কখনও সূরা ওয়াকেআ (৯৬:৫৬) বা এজাতীয় অন্য সূরা ফরয দুই রাকআতে পাঠ করতেন। [১৪৬] বিদায় হজ্জে ফজরের নামাযে তিনি সূরা আত্‌-তুর পড়েছেন। [১৪৭] তিনি কখনও প্রথম রাকআতে সূরা 'কাফ ওয়াল কোরআনুল মজীদ' সহ এজাতীয় অন্য সূরা পড়েছেন। [১৪৮] তিনি কখনও কেসারে মুফাসসাল সূরা যেমন সূরা তাকভীর (৮১:১৫) পাঠ করতেন। [১৪৯] তিনি একবার দুই রাকআতেই সূরা যিলযাল পড়েছেন। বর্ণনাকারী বলেছেন, জানি না, রসূলুল্লাহ (সঃ) ভুলে পড়েছেন, না কি ইচ্ছাকৃতভাবে পড়েছেন। [১৫০]

একবার তিনি সফরে সূরা নাস ও সূরা ফালাক পড়েছেন। [১৫১] তিনি উকবাহ বিন আমের (রাঃ)-কে বলেন, তুমি তোমার নামাযে মোআওয়েযাতাইন (সূরা ফালাক ও নাস) পড়। [১৫২]

---

১৪৪. ঐ

১৪৫. নাসাঈ, আহমদ-সনদ সহীহ।

১৪৬. আহমদ, ইবনু খোযায়মাহ হাকেম এবং আল্লামা যাহাবী একে সহীহ বলেছেন।

১৪৭. বোখারী, মুসলিম।

১৪৮. মুসলিম, তিরমিযী।

১৪৯. মুসলিম, আবু দাঊদ।

১৫০. আবু দাউদ, বায়হাকী-সনদ বিশুদ্ধ। বুঝা যায় যে, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে তা করেছেন বৈধতার জন্য।

১৫১. আবু দাউদ, ইবনু খোযায়মাহ, ইবনু বিসরান আমালী গ্রন্থে, ইবনু আবী শায়বা এবং আল্লামা যাহাবী একে সহীহ বলেছেন।

১৫২. আবু দাউদ, আহমদ–সনদ বিশুদ্ধ।

কখনও তিনি এর চাইতেও বেশি পড়তেন। তিনি ৬০ আয়াত কিংবা আরো বেশি পড়তেন। [১৫৩] একজন বর্ণনাকারী বলেছেন, জানি না, এক রাকআতে নাকি দুই রাকআতে তা পড়েছেন।

তিনি কখনও সূরা রূম [১৫৪] এবং কখনও সূরা ইয়াসীন পড়েছেন। [১৫৫]

একবার তিনি মক্কায় ফজর পড়েন। তিনি সূরা আল্-মোমেনূন দিয়ে শুরু করেন। মূসা ও হারূন (আঃ) কিংবা বর্ণনাকারীর সন্দেহ অনুযায়ী, ঈসা (আঃ)-এর উল্লেখ আসার পর নাক দিয়ে শ্লেষ্মা বের হয়। তিনি তখন রুকুতে চলে যান। [১৫৬]

ফজরে কখনও তিনি সূরা আস্-সাফ্ফাত পড়ে লোকদের ইমামতি করতেন। [১৫৭]

শুক্রবারে তিনি প্রথম রাকআতে সূরা আলিফ-লাম-মীম তানযীল (আস্সাজদাহ) এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা আদ-দাহর পড়তেন। [১৫৮] তিনি প্রথম রাকআতে কেরাআত দীর্ঘ এবং দ্বিতীয় রাকআতে সংক্ষিপ্ত করতেন। [১৫৯]

ফজরের সুন্নতের কেরাআত

রসূলুল্লাহ (সঃ) ফজরের দুই রাকাআত সুন্নতে সংক্ষিপ্ত কেরাআত পড়তেন। [১৬০] এমন কি আয়েশা (রাঃ) বলতেন ঃ তিনি কি সূরা ফাতেহা পড়েছেন? [১৬১]

তিনি কোন সময় প্রথম রাকাআতে সূরা ফাতেহার পর সূরা বাকারার ১৩৬ আয়াত অর্থাৎ .... قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا

শেষ পর্যন্ত পড়তেন এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা আলে-ইমরানের ৬৪ আয়াত অর্থাৎ

---

১৫৩. বোখারী, মুসলিম।
১৫৪. নাসাঈ, আহমদ, বায্যার।
১৫৫. আহমদ-সনদ সহীহ।
১৫৬. মুসলিম, বোখারী।
১৫৭. আহমদ, আবু ইয়ালী, মাকদেসী।
১৫৮. বোখারী, মুসলিম।
১৫৯. ঐ।
১৬০. আহমদ-সনদ বিশুদ্ধ।
১৬১ বোখারী, মুসলিম।

قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ -

শেষ পর্যন্ত পড়তেন।[১৬২]

কখনও আবার এর পরিবর্তে সূরা মোমেনূনের ৫২ নং আয়াত পড়তেন।[১৬৩]

আয়তাটি হচ্ছে ঃ

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيْسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ ....

কখনও তিনি প্রথম রাকআতে সূরা কাফেরূন (নং-১০৯) এবং ২য় রাকআতে সূরা ইখলাস (নং-১১২) পড়তেন।[১৬৪]

তিনি একবার এক ব্যক্তিকে প্রথম সূরাটি প্রথম রাকআতে পড়তে দেখে বলেন, 'এই বান্দাহটি তার রবের প্রতি ঈমান এনেছে এবং দ্বিতীয় সূরাটি দ্বিতীয় রাকআতে পড়তে দেখে বলেন, 'এই বান্দাহটি তার রবকে চিনতে পেরেছে।[১৬৫]

২. যোহরের নামায

রসূলুল্লাহ (সঃ) যোহরের ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকআতে সূরা ফাতেহা এবং একটা করে অন্য সূরা পড়তেন। তিনি প্রথম রাকআতে দ্বিতীয় রাকআত অপেক্ষা লম্বা সূরা পড়তেন।[১৬৬]

তিনি কখনও যোহরের প্রথম রাকআতে কেরাআত এতো লম্ব করতেন যে, নামায শুরু হওয়ার পর কোনো ব্যক্তি 'বাকী' নামক স্থানে গিয়ে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে সেখান থেকে ঘরে ফিরে উযু করে পরে মসজিদে এসে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে প্রথম রাকআতে পেতেন।[১৬৭]

লোকদের ধারণা, রসূলুল্লাহ(সঃ)-এমনটি করতেন এজন্যে যেনো লোকেরা প্রথম রাকআত পায়।[১৬৮]

---

১৬২. মুসলিম, ইবনু খোযায়মাহ ও হাকেম।

১৬৩. মুসলিম, আবু দাউদ।

১৬৪। ঐ।

১৬৫. তাহাবী, ইবনু হিব্বান, ইবনে বিশরান। আল্লামা যাহাবী একে সহীহ বলেছেন।

১৬৬. বোখারী, মুসলিম।

১৬৭. মুসলিম, বোখারী কেরাআত অধ্যায়।

১৬৮. আবু দাউদ–বিশুদ্ধ সনদ, ইবনু খোযায়মাহ।

তিনি কখনও দুই রাকআতে ত্রিশ আয়াত পরিমাণ পড়তেন। যেমন সূরা সাজদাহ। আয়াত সংখ্যা ৩০। সাথে তো সূরা ফাতেহা থাকতোই। [১৬৯]

তিনি কখনও সূরা আত্‌-তারেক, সূরা আল-বুরূজ এবং সূরা আল-লাইল জাতীয় সূরা পড়তেন। [১৭০]

তিনি কখনও সূরা ইনশিক্বাক বা এ জাতীয় অন্য সূরা পড়েছেন। [১৭১]

যোহর ও আসরের নামাযে লোকেরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দাড়ির নড়াচড়া দেখে তাঁর কেরআত পড়া উপলব্ধি করতেন। [১৭২]

যোহরের শেষ দু' রাকআতে তিনি প্রথম দু' রাকআতের চাইতে সংক্ষিপ্ত কেরআত পড়তেন। অর্থাৎ প্রথম দুই রাকআতের অর্ধেক-পনের আয়াত পরিমাণ পড়তেন। [১৭৩] আবার কোন সময় শেষ দু' রাকআতে শুধু সূরা ফাতেহা পড়তেন। [১৭৪]

কখনও তিনি তাদেরকে শেষ দু' রাকআতে আয়াত শুনাতেন। [১৭৫]

সাহাবায়ে কেরাম রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কণ্ঠে এ দু রাকআতে সূরা আল-আলা এবং সূরা আল গাশিয়া পড়ার গুনগুন আওয়াজ শুনতেন। [১৭৬] কখনও সূরা বুরূজ, সূরা তারেক এবং এ জাতীয় অন্য সূরা পড়তেন। [১৭৭]

---

১৬৯. আহমদ, মুসলিম।

১৭০. আবু দাউদ, তিরমিযী এটাকে সহীহ বলেছেন। ইবনু খোযায়মাও একে সহীহ বলেছেন।

১৭১. ইবনু খোযায়মা-১/৬৭ পৃঃ।

১৭২. বোখারী, আবু দাউদ।

১৭৩. আহমদ, মুসলিম। এই হাদীস যোহরের শেষ দুই রাকআতে সূরা ফাতেহার সাথে কেরাআত পড়া সুন্নত বলে প্রমাণ করে। সাহাবায়ে কেরাম এরূপই করতেন। আবু বকর (রাঃ)-ও এরূপ করেছেন। যোহর সহ অন্যান্য নামাযে ইমাম শাফেঈও এরূপ করেছেন। পরবর্তী আলেমদের মধ্যে আবুল হাসানাত (লক্ষ্ণৌ) 'আত্‌তালীক আল-মোমাজ্জাদ আলা মোআত্তা মোহাম্মদ কিতাবের ১০২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, কি আশ্চর্যের বিষয় যে, আমাদের আলেমরা শেষ দুই রাকআতে সূরা পড়লে ভুলের সাজদাকে বাধ্যতামূলক করেন। ইবরাহীম হালাবী এবং ইবনু আসীর এর যথার্থ উত্তর দিয়েছেন। কোন সন্দেহ নেই, যারা এরকম বলেন, তাদের কাছে হয় হাদীস পৌছেনি, অথবা তারা হাদীসের প্রতি গুরুত্ব দেননি।

১৭৪. বোখারী, মুসলিম।

১৭৫. ইবনু খোযায়মাহ, যিয়া আল-মাকদেসীর মোখতারা গ্রন্থে সহীহ সনদ সহকারে বর্ণিত।

১৭৬. বোখারী কেরাআত অধ্যায়, তিরমিযী।

১৭৭. মুসলিম।

কখনও তিনি সূরা আল-লাইল কিংবা অনুরূপ সূরা পড়েছেন।[১৭৮]

৩. আসরের নামায

রসূলুল্লাহ (সঃ) প্রথম দুই রাকআতে সূরা ফাতেহার পর একটি করে অন্য সূরা পড়তেন। দ্বিতীয় রাকআতের তুলনায় প্রথম রাকআতে দীর্ঘ কেরাআত পড়েছেন।[১৭৯] সাহাবায়ে কেরামের ধারণা ছিল যে, তিনি লম্বা কেরাআতের মাধ্যমে চাইতেন যেন লোকেরা ঐ রাকআতটি পায়।[১৮০] তিনি প্রত্যেক রাকআতে ১৫ আয়াত করে পড়তেন, যা যোহরের নামাযের কেরাআতের অর্ধেক পরিমাণ ছিল।

তিনি কখনও শেষ দুই রাকআতে প্রথম দুই রাকআতের অর্ধেক পরিমাণ কেরাআত পড়তেন।[১৮১]

তিনি শেষ দুই রাকআতে কখনো শুধু সূরা ফাতেহা পড়েছেন।[১৮২] তিনি কখনও আসরের নামাযে এমনভাবে কেরাআত পড়তেন যে, সাহাবায়ে কেরাম তা শুনতে পেতেন।[১৮৩]

যোহরের নামাযে আমরা যেসব সূরার কথা উল্লেখ করেছি আসরের নামাযে তিনি সেসব সূরা পড়তেন।

৪. মাগরিবের নামায

রসূলুল্লাহ (সঃ) মাগরিবের নামাযে ছোট সূরা (কেসারে মোফাস্‌সাল) পড়তেন। লোকেরা তাঁর সাথে নামায পড়ে ঘরে গিয়ে ধনুকে তীরের স্থান নির্ধারণ করতে পারত।[১৮৪] অর্থাৎ অন্ধকার নেমে আসার আগেই নামায শেষ হয়ে যেত।

তিনি সফরে দ্বিতীয় রাকআতে সূরা তীন পড়েছেন।

---

১৭৮. বোখারী, মুসলিম।

১৭৯. আবু দাউদ, ইবনু খোযায়মাহ।

১৮০. আহমদ, মুসলিম।

১৮১. বোখারী ও মুসলিম।

১৮২. ঐ।

১৮৩. ঐ।

১৮৪. আহমদ, তায়ালিসী-সনদ সহীহ।

তিনি কখনও লম্বা এবং কখনও মাঝারি সূরা পড়তেন। তাই তিনি কোনো সময় সূরা মোহাম্মদ (সূরা নং ৪৭, আয়াত সংখ্যা ৩৮) পড়েছেন।[১৮৫] কখনও তিনি সূরা তূর পড়েছেন।[১৮৬] কখনও আবার সূরা আল মোরসালাত (সূরা নং ৭৭, আয়াত সংখ্যা ৫০) পড়েছেন। এটা তাঁর জীবনের সর্বশেষ মাগরিব পড়ার ঘটনা।[১৮৭]

কখনও তিনি মাগরিবের দুই রাকআতে বড়ো দুই সূরার [১৮৮] মধ্যে অপেক্ষাকৃত বড়ো সূরা আল-আরাফ (সূরা নং ৭, আয়াত সংখ্যা ২০৬) পড়েছেন।[১৮৯]

কখনও তিনি দুই রাকআতে সূরা আনফাল পড়েছেন। (সূরা নং ৮, আয়াত সংখ্যা ৭৫)[১৯০]

রসূলুল্লাহ (সঃ) মাগরিবের ফরয নামাযের পর সুন্নতে সূরা কাফেরূন এবং সূরা ইখলাস পড়েছেন।[১৯১]

৫. এশার নামায

রসূলুল্লাহ (সঃ) এশার ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকআতে মাঝারি ধরনের (ওয়াসাত মোফাস্‌সাল) সূরা পড়তেন।[১৯২] তিনি কখনও সূরা আশ-শামস (সূরা নং ৯১, আয়াত সংখ্যা ১৫) কিংবা এই জাতীয় অন্য সূরা পড়েছেন।[১৯৩]

তিনি কখনো সূরা ইনশিক্বাক পড়েছেন এবং ঐ সূরায় যে সাজদা আছে, তা আদায় করেছেন।[১৯৪]

---

১৮৫. ইবনু খোযায়মাহ, তাবারানী, আল-মাকদেসী-সনদ সহীহ।

১৮৬. বোখারী, মুসলিম।

১৮৭. ঐ।

১৮৮. সূরা আরাফ অপেক্ষাকৃত বড়ো এবং সূরা আনআম অপেক্ষাকৃত ছোট।

১৮৯. বোখারী, আবু দাউদ, ইবনু খোযায়মাহ, আহমদ, আস-সেরাজ, আল-মোখলেস।

১৯০. তাবারানী- সনদ সহীহ।

১৯১. আহমদ, আল-মাকদেসী, নাসাঈ, ইবনু নসর এবং তাবারানী।

১৯২. নাসাঈ, আহমদ-সনদ সহীহ।

১৯৩. আহমদ, তিরমিযী একে উত্তম হাদীস বলেছেন।

১৯৪. বোখারী, মুসলিম, নাসাঈ।

একবার তিনি সফরে প্রথম রাকআতে সূরা তীন পড়েছেন। (সূরা নং-৯৫, আয়াত সংখ্যা ৮) [১৯৫]

তিনি এশার ফরয নামাযে লম্বা কেরআত পড়তে নিষেধ করেছেন। কেননা, একবার সাহাবী মোআয বিন জাবাল নিজ লোকদেরকে নিয়ে এশার নামায পড়েন এবং তাতে লম্বা কেরাআত পড়েন। সেই জামাতে শরীক একজন আনসার সাহাবী নামায শেষে পুনরায় এশার ফরয নামায আদায় করেন। মোআয (রাঃ)-কে বিষয়টি জানানোর পর তিনি মন্তব্য করেন যে, ঐ আনসার সাহাবী মুনাফিক। আনসার সাহাবী ঐ মন্তব্য শুনার পর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে যান এবং মোআযের মন্তব্য সম্পর্কে তাঁকে জানান। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, হে মোআয! তুমি কি ফেতনা ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী হতে চাও? হে মোআয! তুমি লোকদেরকে নিয়ে নামাযের ইমামতি করলে সূরা আশ-শামস, (নং ৯১, আয়াত ১৫) সূরা আ'লা (নং ৭৭ আয়াত ১৯) সূরা আলাক (নং ৯৬, আয়াত ১৯) এবং সূরা আল-লাইল (নং ৯২, আয়াত ২১) পড়তে পার। কেননা, তোমার পেছনে বুড়ো, দুর্বল ও এমন লোক আছে, যাদের দ্রুত যাওয়া দরকার। [১৯৬]

৬. রাতের নামায

রসূলুল্লাহ (সঃ) রাতের নামাযে কেরাআত লম্বা এবং ছোট করতেন। কখনও তিনি অনেক লম্বা কেরাআত পড়তেন। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেন, 'আমি এক রাতে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে নামায পড়েছি। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়ে থাকায় আমি একটা খারাপ ইচ্ছা পোষণ করি। খারাপ ইচ্ছাটি কি ছিল—এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আমি বসে পড়া এবং রসূলুল্লাহর সাথে নামায ত্যাগ করার ইচ্ছা করি। [১৯৭]

হোযাইফা বিন ইয়ামান বলেন, আমি এক রাত্রে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে নামায পড়ি। তিনি সূরা বাকারা দিয়ে নামায শুরু করেন। আমি ধারণা করি যে, হয়তো একশত আয়াতের মাথায় তিনি রুকুতে যাবেন। কিন্তু না, তিনি কেরাআত অব্যাহত রাখেন। আমি ধারণা করি, হয়তো সূরাটি তিনি দুই রাকআতে পড়বেন। কিন্তু না, তিনি কেরাআত পড়া অব্যাহত রাখেন। তখন আমার ধারণা হয় যে, হয়তো সূরাটি শেষ করে রুকুতে যাবেন। কিন্তু না,

---

১৯৫. ঐ

১৯৬. বোখারী, মুসলিম, নাসাঈ।

১৯৭. বোখারী, মুসলিম।

তিনি সূরা নিসা শুরু করে তা শেষ করলেন। তারপর সূরা আলে-ইমরান শুরু করে তাও শেষ করেন। [১৯৮] তিনি আস্তে আস্তে এবং সাধারণভাবে কেরাআত পড়েন। যখন তাসবীহ্ পাঠের আয়াত আসে, তখন তাসবীহ্ পড়েন, চাওয়ার আয়াত আসলে প্রার্থনা করেন এবং আশ্রয়ের আয়াত আসলে আশ্রয় চান। তারপর তিনি রুকু করেন। [১৯৯]

তিনি একরাতে ৭টি লম্বা সূরা পাঠ করেন, অথচ তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন। [২০০]

তিনি কখনও প্রত্যেক রাকআতে একটি করে উপরোল্লিখিত সূরা পড়তেন। [২০১]

তিনি এক রাতে কখনও পুরো কোরআন পড়েছেন বলে জানা যায় না। [২০২] বরং তিনি আবদুল্লাহ্ বিন আমরের জন্য তাতে সম্মতি দেননি। আবদুল্লাহ্ বিন আমর বলেছেন, আমি প্রত্যেক মাসে কোরআন খতম করি। আমি বলি যে, আমার আরও শক্তি আছে। (অর্থাৎ আমি আরও বেশী পড়তে পারি।) রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, তাহ্‌লে ২০ রাতে এক খতম কর। আবদুল্লাহ্ বলেন, আমি আরও বেশী পড়ার শক্তি রাখি। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, তাহ্‌লে ৭ রাতে এক খতম কর, এর বেশী নয়। [২০৩] (অর্থাৎ ৭ দিনের কম সময়ে কোরআন খতম কর না)

তারপর তিনি তাকে ৫ দিনের মধ্যে কোরআন খতমের অনুমতি দিয়েছেন। [২০৪]

এরপর তাকে তিন দিনের মধ্যে কোরআন খতমের অনুমতি দিয়েছেন। [২০৫]

---

১৯৮. তিনি সূরা আলে-ইমরানের আগে সূরা নিসা পড়েছেন। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, কোরআনের সূরার ক্রমিক ধারা লংঘন করা জায়েয।

১৯৯. মুসলিম, নাসাঈ।

২০০. আবু ইয়া'লী। হাকেম ও আল্লামা যাহাবী একে সহীহ্ হাদীস বলেছেন। ৭টি লম্বা সূরা হচ্ছে—বাকারা, আলে-ইমরান, নিসা, মায়েদাহ, আনআ'ম, আ'রাফ এবং তাওবাহ।

২০১. আবু দাউদ, নাসাঈ-সনদ বিশুদ্ধ।

২০২. মুসলিম, আবু দাউদ।

২০৩. বোখারী, মুসলিম।

২০৪. নাসাঈ, তিরমিযী।

২০৫. বোখারী, আহমদ।

তিনদিনের কম সময়ে কোরআন খতম করতে তিনি তাকে নিষেধ করেছেন।[২০৬] তিনি এর কারণ বর্ণনা করে বলেন ঃ যে ব্যক্তি তিন দিনের কমে কোরআন খতম করে, সে কোরআন বুঝতে পারে না।[২০৭]

অন্য আরেক বর্ণনায় এসেছে, তিনি তাকে বলেছেন, সে ব্যক্তি কোরআন বুঝতে পারে না, যে তিন দিনের কম সময়ে কোরআন খতম করে।[২০৮]

রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে আরো বলেন, সকল ইবাদতকারীর রয়েছে হিম্মত ও তৎপরতা[২০৯] এবং প্রত্যেক হিম্মত ও তৎপরতার জন্য রয়েছে সময় বা যুগ সন্ধিক্ষণ। হয় তিনি সুন্নতে, না হয় বেদআতের দিকে মোড় নেবেন। যার কাল-সন্ধিক্ষণ সুন্নতের বিপরীত জিনিসের প্রতি মোড় নেয়, সে ধ্বংস হবে।[২১০]

সে কারণে রসূলুল্লাহ (সঃ) তিন দিনের কম সময়ে কোরআন শরীফ খতম করতেন না।[২১১]

তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি রাতে দুইশত আয়াত পড়ে, তাকে একনিষ্ঠ মোখলেস আনুগত্যকারীদের মধ্যে পরিগণিত করা হয়।[২১২]

রসূলুল্লাহ (সঃ) প্রত্যেক রাতের নামাযে সূরা বনী ইসরাঈল এবং সূরা যুমার পাঠ করতেন।[২১৩]

তিনি আরও বলতেন, যে ব্যক্তি রাতে একশত আয়াত পড়বে, তাকে গাফেলদের মধ্যে লেখা হবে না।[২১৪]

---

২০৬. সুনানে দারেমী, সুনান সাঈদ বিন মানসুর-সনদ বিশুদ্ধ।

২০৭. আহমদ-সনদ সহীহ।

২০৮. দারেমী। তিরমিযী এটিকে সহীহ বলেছেন।

২০৯. হিম্মত ও তৎপরতা বলতে বুঝায় সেই তেজীভাব, যা মুসলমানরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার জন্য প্রদর্শন করে। এই তেজীভাবের অপর অর্থ হল, নেক আমল করা এবং স্থায়ীভাবে তা করতে থাকা যে পর্যন্ত না আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হয়। তাই রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহর কাছে প্রিয়তম আমল হচ্ছে স্থায়ী আমল–যদিও সেটা কম হোক না কেন।

২১০. আহমদ, ইবনু হিব্বান।

২১১. ইবনু, সা'দ, ১ম খন্ড ৩৭৬ পৃঃ, আখলাকুন্নবী-আবুশ্ শেখ ২৮১ পৃঃ।

২১২. দারেমী, হাকেম। আল্লামা যাহাবী হাদীসটিকে ঠিক বলেছেন।

২১৩. আহমদ, ইবনে নসর-সনদ সহীহ।

২১৪. দারেমী, হাকেম এবং আল্লামা যাহাবী একে সহীহ বলেছেন।

তিনি কখনও প্রত্যেক রাকআতে ৫০ আয়াত কিংবা আরও বেশী পড়তেন।[২১৫] আবার কখনও সূরা মোয্‌যাম্মেল (নং ৭৩, আয়াত সংখ্যা ২০) পরিমাণ কেরাআতে পড়তেন।[২১৬] তিনি কখনও পুরো রাত জেগে নামায পড়তেন না।[২১৭] তবে কদাচিত পুরো রাত পড়েছেন।

বর্ণিত আছে, আবদুল্লাহ বিন খাব্বাব আল-আরত বদরের যুদ্ধে রসূলুল্লাহর সাথে অংশগ্রহণ করেন এবং রসূলুল্লাহকে সারা রাতভর নামায পড়তেন দেখেন। সোবহে সাদেক পর্যন্ত তিনি নামায পড়েছেন। তিনি নামায থেকে সালাম ফিরালেন। খাব্বাব জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল, আমার মা-বাপ আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, আপনি এই রাতে এমন নামায পড়লেন যা ইতিপূর্বে আর কখনও দেখিনি। তিনি উত্তরে বলেন, হাঁ, এটা ছিল আশা ও ভয়ের নামায, আমি আমার রবের কাছে তিনটি জিনিস চেয়েছি। তিনি দু'টো দিয়েছেন এবং একটি নিষেধ করেছেন। আমি চেয়েছি যে, আমার উম্মাতকে যেন অন্যান্য জাতির মত ধ্বংস করা না হয়। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, যেন দুর্ভিক্ষ দিয়ে ধ্বংস করা না হয়। এই দোআ আল্লাহ মনযুর করেছেন। আমি আমার রবের কাছে আমাদের উপর নিজেরা ছাড়া অন্য জাতিকে বিজয়ী না করার প্রার্থনা জানিয়েছি। তিনি ঐ দোআও মনযুর করেছেন। আমি আরও দোআ করেছি, আমাদের মধ্যে যেন বিভক্তি না হয়। তিনি তা কবুল করেননি।[২১৮]

এক রাতে তিনি বারবার ভোর পর্যন্ত শুধু নিম্নোক্ত আয়াতটি পড়ে রুকু, সাজদাহ ও দোআ করতে থাকেন। আয়াতটি হল ঃ

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ -

২১৫. বোখারী, আবু দাউদ।

২১৬. আহমদ, আবু দাউদ, সনদ সহীহ।

২১৭. মুসলিম, আবু দাউদ। এই হাদীস সহ অন্যান্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সর্বদা বা অধিকাংশ সময় পুরো রাত জাগা মাকরূহ। কেননা, তা উত্তম হলে রসূলুল্লাহ (সঃ) ছাড়তেন না। তিনি হচ্ছেন উত্তম আদর্শ ও চরিত্র। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) ৪০ বছর ব্যাপী ইশার উযু দিয়ে ফজর পড়েছেন বলে যে মিথ্যা ঘটনা বর্ণিত আছে, তা বিশ্বাস করা ঠিক নয়। আল্লামা ফিরোযাবাদী 'আর রাদ্দ আ'লাল মো'তারেদ' গ্রন্থের ১ম খন্ডের ৪৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, এটা ইমাম আবু হানীফার সম্মানের প্রতি ক্ষতিকর প্রকাশ্য মিথ্যা। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) প্রতি নামাযের জন্য নতুন উযু করা উত্তম তাই সেটা অবশ্যই করে থাকবেন।

২১৮. নাসাঈ, আহমদ, তাবারানী। তিরমিযী এটিকে সহীহ হাদীস বলেছেন।

অর্থ ঃ 'তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও, তবে তারা তো তোমারই বান্দাহ, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা কর, নিঃসন্দেহে তুমি শক্তিশালী ও বিজ্ঞ।'

(সূরা মায়েদাহ-১১৮)

ভোর হলে আবু যার (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! সারা রাত ভোর না হওয়া পর্যন্ত আপনি শুধু এই একটি মাত্র আয়াত পড়ে রুকু, সাজদাহ এবং দোআ করলেন, অথচ আল্লাহ আপনাকে পুরো কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন। আমাদের মধ্যে কেউ এরকম করলে আমরা তাকে পাকড়াও করতাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) জওয়াবে বললেন, আমি আল্লাহর কাছে আমার উম্মতের সুপারিশ প্রার্থনা করেছি, তিনি তা মনযুর করেছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করে না, সে ইন্‌শাআল্লাহ আমার সুপারিশ লাভ করবে।[২১৯]

এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার এক প্রতিবেশী রাতে নামায পড়েন। তবে তিনি তাতে সূরা ইখলাস ছাড়া আর কোন সূরা পড়েন না। তিনি বারবার কেবলমাত্র ঐ সূরাটিই পড়েন এবং আর কোন সূরা পড়েন না। প্রশ্নকর্তা সূরা ইখলাসকে যেন অপর্যাপ্ত বিবেচনা করে ঐ প্রশ্ন করেন। নবী (সঃ) বললেন, আল্লাহর কসম, এটা কোরআনের এক-তৃতীয়াংশ।[২২০]

৭. বিতরের নামায

রসূলুল্লাহ (সঃ) বিতরের নামাযে প্রথম রাকআতে সূরা আল-আ'লা (নং ৮৭, আয়াত ১৯), দ্বিতীয় রাকআতে সূরা কাফেরূন এবং তৃতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস পড়তেন।[২২১]

তিনি কখনও তৃতীয় রাকআতে সূরা ফালাক ও সূরা নাসসহ যোগ করে পড়তেন।[২২২]

একবার তিনি তৃতীয় রাকআতে সূরা নিসার একশত আয়াত পড়েছেন।[২২৩]

---

২১৯. নাসাঈ, ইবনু খোযায়মাহ, আহমদ, ইবনু নসর। হাকেম ও আল্লামা যাহাবী একে সহীহ বলেছেন।

২২০. বোখারী, আহমদ।

২২১. নাসাঈ। হাকেম এটাকে সহীহ বলেছেন।

২২২. তিরমিযী। হাকেম এটিকে সহীহ বলেছেন এবং আল্লামা যাহাবী এর সাথে একমত হয়েছেন।

২২৩. নাসাঈ, আহমদ-সনদ সহীহ।

তিনি বিতরের পরের দুই রাকআত নামাযে সূরা যিলযাল এবং সূরা কাফেরূন পড়েছেন। [২২৪]

৮. জুমআ'র নামায

তিনি কখনও জুমআ'র নামাযের প্রথম রাকআতে সূরা জুমআ' এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা মুনাফেকুন পড়েছেন। [২২৫] কখনও সূরা মুনাফেকুন-এর পরিবর্তে সূরা গাশিয়াহ্ পড়েছেন। [২২৬]

কখনও প্রথম রাকআতে সূরা আল আ'লা (নং ৮৭, আয়াত ১৯) পড়েছেন এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা গাশিয়া (নং ৮৮, আয়াত ২৬) পড়েছেন। [২২৭]

৯. দুই ঈদের নামায

তিনি ঈদের নামাযের প্রথম রাকআতে কখনও সূরা আল-আ'লা এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা আল-গাশিয়া পড়তেন। [২২৮]

কখনও সূরা কাফ (নং ৫০, আয়াত ৪৫) এবং সূরা কামার (নং ৫৪, আয়াত ৫৫) পড়েছেন। [২২৯]

---

২২৪. আহমদ, ইবনু নসর-সনদ সহীহ। বিতরের পরে দুই রাকআত নামাযের কথা মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, যা বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত অপর একটি হাদীসের বিপরীত। তাতে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, اِجْعَلُوْا اٰخِرَصَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتْرًا۔

অর্থ ঃ তোমরা রাত্রে বিতরকে সর্বশেষ নামায বানাও।' ওলামায়ে কেরাম হাদীস দু'টির বৈপরীত্য দূর করার উদ্দেশ্যে কিছু জওয়াব দিয়েছেন। কিন্তু কোনটাই প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য নয়। তাই আমার মতে, বিতরকে সর্বশেষ নামায বানানোর আদেশের প্রেক্ষিতে উক্ত দুই রাকআত নামায ত্যাগ করা উত্তম। বিতরের পর দুই রাকআত নামায পড়ার বিষয়েও আরেকটি আদেশসূচক হাদীস আছে। তাই প্রথম হাদীসের উপর আমল করা মোস্তাহাব হলে দ্বিতীয় হাদীসের সাথে কোন বিরোধ থাকে না।

২২৫. মুসলিম, আবু দাউদ।

২২৬. ঐ

২২৭. ঐ

২২৮. ঐ

২২৯. ঐ।

১০. জানাযার নামায

জানাযার নামাযে সূরা ফাতেহা [২৩০] এবং অন্য একটি সূরা পড়া সুন্নত। [২৩১] প্রথম তাকবীরের পর তিনি সূরা গোপনে পড়তেন। [২৩২]

সুন্দর আওয়াজ ও তারতীল সহকারে কেরাআত পাঠ

আল্লাহ্ তারতীল (ধীরে ধীরে ও সুন্দর করে) সহকারে কোরআন পড়ার যে নির্দেশ দিয়েছেন সেই আলোকে রসূল (সঃ) আস্তে আস্তে সুন্দর আওয়াযে কোরআন পাঠ করতেন। তিনি না খুব বেশী ধীরগতিতে পড়তেন, না দ্রুতগতিতে পড়তেন। বরং তিনি প্রতিটি অক্ষর সুস্পষ্ট করে পাঠ করতেন। তিনি এমন ভাবে তারতীল করে পাঠ করতেন তাতে যেন দীর্ঘ সূরা আরও অধিকতর দীর্ঘ হয়ে যেত। [২৩৩]

তিনি বলেন, কোরআনের পাঠককে বলা হবে, তুমি দুনিয়ায় যে রকম তারতীল সহকারে কোরআন পাঠ করেছ ঠিক তেমনি ভাবে কোরআন পড় এবং উপরে উঠো। তোমার পঠিত শেষ আয়াতের উপর তোমার মর্যাদা নির্ধারিত হবে। [২৩৪]

তিনি যেখানে মাদের অক্ষর আছে, সেখানে লম্বা করে টেনে পড়তেন। তিনি بِسْمِ اللّٰهِ - اَلرَّحْمٰنِ - اَلرَّحِيْمِ এজাতীয় শব্দের মাদ আদায় করে পড়তেন। তিনি মাদের হরফে মাদ আদায় করে লম্বা করে পড়তেন। [২৩৫]

তিনি প্রতিটি আয়াতের শেষে ওয়াক্ফ করতেন বা থামতেন। সূরা ফাতেহায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

---

২৩০. এটা শাফেঈ, আহমদ এবং ইসহাকের মত। পরবর্তী যুগের কিছু হানাফী বিশেষজ্ঞের মতও তাই। তবে সূরা ফাতেহার পর অন্য সূরা পড়ার বিষয়টি শুধু শাফেঈ মাযহাবের মত এবং এটি হক।

২৩১. বোখারী আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনুল যাযুদ। তোয়াইজিরী বলেছেন, একটি সূরা যোগ করা দুর্লভ মত নয়। (মোকালামা-৬৮ পৃঃ)

২৩২. নাসাঈ, তাহাবী-সনদ সহীহ।

২৩৩. মুসলিম, মালেক।

২৩৪. আবু দাউদ। তিরমিযী এটিকে সহীহ বলেছেন।

২৩৫. বোখারী, আবু দাউদ।

তিনি কখনও লম্বা ও গুনগুন সুরে কোরআনের আয়াত পাঠ করতেন। এটাকে 'তারজী' বলা হয় (যেমনটি আযানে দেখা যায়।) তিনি মক্কা বিজয়ের দিন উষ্ট্রীর পিঠে নরম সুরে তারজী' সহকারে সূরা ফাতহ পড়েছিলেন। [২৩৬]

আবদুল্লাহ বিন মোগাফ্‌ফাল রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর তারজী' নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন।

।।। (তিন আলিফ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন প্রথম হামজার উপর ফাতাহ্‌ এরপর আলিফ সাকিন এবং তারপর অন্য আরেকটি হামজাহ।মোল্লা আলী কারীও অন্য এক সূত্র থেকে একই কথা বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি বলেছেন, এটা পরিষ্কার যে, এখানে ৩টা লম্বা আলিফ রয়েছে।

রসূলুল্লাহ (সঃ)– সুন্দর আওয়াজে বা সুরে কোরআন পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ

زَيِّنُوا الْقُرْاٰنَ بِاَصْوَاتِكُمْ فَاِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيْدُ الْقُرْاٰنَ حَسَنًا ـ

অর্থ ঃ 'তোমরা কোরআনকে সুললিত কণ্ঠে পড়। সুন্দর সুর কোরআনের সৌন্দর্য বাড়ায় [২৩৭]

তিনি আরো বলেছেন,

اِنَّ مِنْ اَحْسَنِ النَّاسِ صَوْتًا بِالْقُرْاٰنِ اَلَّذِىْ اِذَا سَمِعْتُمُوْهُ يَقْرَاُ حَسِبْتُمُوْهُ يَخْشَى اللّٰهَ ـ

অর্থ ঃ সেই ব্যক্তির কোরআন পড়ার সুর সর্বোত্তম, যার কোরআন পড়া শুনলে তোমাদের ধারণা হবে যে, লোকটি আল্লাহকে ভয় করে। [২৩৮]

রসূলুল্লাহ (সঃ) গুনগুন সুরে কোরআন পড়ার আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'তোমরা আল্লাহর কিতাব শিখ, ভাল করে তা আঁকড়ে ধর ও অনুসরণ কর এবং ললিত-কোমল সুরে তা পড়। আল্লাহর শপথ, উটকে রশি দিয়ে বেঁধে রাখার চাইতেও কোরআন মনে রাখা আরও কঠিন। [২৩৯]

---

২৩৬. বোখারী, মুসলিম।

২৩৭. বোখারী, আবু দাউদ, দারেমী, হাকেম, তাম্মাম, আররাযী-সনদ সহীহ।

২৩৮. হাদীসটি সহীহ। ইবনু মোবারক, আয্‌যোহদ ১/১৬২, দারেমী, ইবনু নসর, তাবারানী, আবু নাঈম-আখবার ইসপাহান এবং আযযিয়া-আল্‌মোখতারা গ্রন্থে তা বর্ণনা করেছেন।

২৩৯. দারেমী, আহমদ-সনদ সহীহ।

তিনি বলেছেন لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْاٰنِ - “সে ব্যক্তি আমাদের নয়, যে সুন্দর সুরে কোরআন পড়ে না।” [২৪০]

তিনি আরও বলেছেন, ‘আল্লাহ কোন নবীর সুন্দর সুরে কিতাব পড়া অপেক্ষা অন্য কোন জিনিস বেশী শুনেন না। নবী শব্দ করে সুললিত কণ্ঠে কোরআন পড়বেন। [২৪১]

রসূলুল্লাহ (সঃ) আবু মূসা আশআরীকে বলেছেন, আমি গত রাতে তোমার কেরাআত শুনেছি, তুমি যদি আমাকে দেখতে! তোমাকে দাঊদ (আঃ)-এর মত সুন্দর কণ্ঠ বা সুর দেয়া হয়েছে। আবু মূসা বলেন, আমি আপনার উপস্থিতি টের পেলে আরও সুন্দর সুরে পাঠ করতাম। [২৪২]

ইমামের প্রতি লোকমা দেয়া

ইমাম কেরাআত ভুলে গেলে বা আটকে গেলে তা সংশোধন করে দেয়া সুন্নত। একবার রসূল (সাঃ) নামাযে কেরাআত পড়েন এবং কেরাআতে আটকে যান। নামায শেষ করে তিনি উবাইকে বলেন, তুমি কি আমাদের সাথে নামায পড়েছ? তিনি বলেন, হ্যাঁ। তিনি আবার বলেন, কোন্ জিনিস তোমাকে লোকমা দিতে বাধা দিয়েছে? [২৪৩]

শয়তানের ওয়াসওয়াসা দূর করার জন্য নামাযে আউযু বিল্লাহ পড়া ও থুথু নিক্ষেপ করা

উসমান বিন আবুল আ’স (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রসূল! শয়তান আমার ও আমার নামাযের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করে এবং আমার কেরাআতে ভুল-ভ্রান্তি ঘটায়। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, ঐটা হচ্ছে শয়তান এবং তার নাম হচ্ছে খেনযাব। তুমি যখন শয়তানের ওয়াসওয়াসা অনুভব করবে, তখন আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে। অর্থাৎ আউযু বিল্লাহ পড়বে এবং তোমার বাম দিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপ করবে। উসমান বলেন,

---

২৪০. আবু দাঊদ। হাকেম ও আল্লামা যাহাবী একে সহীহ বলেছেন।

২৪১. বোখারী, মুসলিম, তাহাবী, ইবনে মান্দাহ-আত-তাওহীদ ১/৮১ পৃঃ।

২৪২. আবদুর রায্‌যাক-আল-আমালী, বোখারী, মুসলিম, ইবনু নসর, হাকেম।

২৪৩. আবু দাঊদ, ইবনু হিব্বান, তাবারানী, ইবনু আসাকির, আয্‌যিয়া আলমোখতারা-সনদ সহীহ।

আমি ঐ রকম করি এবং আল্লাহ আমার কাছ থেকে শয়তানকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন।[২৪৪]

রুকু

রসূলুল্লাহ (সঃ) কেরাআত শেষ করার পর সামান্য একটু অপেক্ষা করতেন।[২৪৫] তারপর তিনি তাকবীরে তাহ্‌রীমার সময়ের মত উপরের দিকে দুই হাত তুলতেন এবং তাকবীর বলতেন ও রুকুতে যেতেন।[২৪৬]

তিনি ভুল নামায আদায়কারীকে বলেছিলেন ঃ আল্লাহর আদেশ মোতাবেক ভাল করে উযু না করলে তোমাদের নামায পরিপূর্ণ হবে না। .... তারপর তাকবীর বলবে এবং আল্লাহর হামদ ও মর্যাদা প্রকাশ করবে। এরপর আল্লাহ যেভাবে আদেশ দিয়েছেন, সেভাবে কোরআন থেকে কেরাআত পাঠ করবে। পরে তাকবীর বলবে ও রুকুতে যাবে।দু'হাত হাঁটুর উপর এমনভাবে রাখবে যেন জোড়াগুলো ঢিলা-ঢালা থাকে।[২৪৭]

রুকুর পদ্ধতি

রসূলুল্লাহ (সঃ) রুকুতে দুই হাঁটুর উপর দুই হাতের তালু রাখতেন।[২৪৮] এবং লোকদেরকেও অনুরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন।[২৪৯] তিনি ভুল নামায

---

২৪৪. মুসলিম, আহমদ। ইমাম নববী (রঃ) বলেছেন, এই হাদীস প্রমাণ করছে ওয়াসওয়াসার সময় শয়তান থেকে আশ্রয় চাওয়া এবং বাম দিকে ৩বার থুথু নিক্ষেপ করা মোস্তাহাব। আন-নেহায়া গ্রন্থে বলা হয়েছে, এখানে থুথু বলতে 'ফুঁ' বুঝানো হয়েছে, যাতে থুথুর বিন্দু থাকবে।

২৪৫. আবু দাউদ। হাকেম একে সহীহ হাদীস বলেছেন এবং আল্লামা যাহাবী তা সমর্থন করেছেন। ইবনুল কাইয়েম সহ অন্যরা ঐ অপেক্ষার পরিমাণ সম্পর্কে বলেছেন, তা শ্বাস নেয়ার পরিমাণ সমতুল্য।

২৪৬. বোখারী, মুসলিম,। রুকুতে যাওয়ার আগে এবং রুকু থেকে উঠার সময় দু'হাত তোলার ব্যাপারে মোতাওয়াতের বর্ণনা রয়েছে। অর্থাৎ বহু সংখ্যক বর্ণনাকারী দ্বারা তা বর্ণিত হয়েছে। তিন ইমাম, অধিকাংশ মোহাদ্দেস ও ফকীহ এবং ইমাম আবু ইউসুফের ছাত্র ইসাম বিন ইউসুফ আবু ইসমাহ বলখী সহ কিছু হানাফীর মাযহাবও এটাই। ওকবাহ বিন আমের হাত তোলার ব্যাপারে বলেছেন, প্রতি বারের ইশারায় ১০ নেকী পাওয়া যায়।

২৪৭. আবু দাউদ, নাসাঈ। হাকেম একে সহীহ বলেছেন এবং আল্লামা যাহাবী সমর্থন করেছেন।

২৪৮. বোখারী, আবু দাউদ।

২৪৯. ঐ

আদায়কারীকেও অনুরূপ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন বলে আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

তিনি দুই হাঁটু আঁকড়ে ধরতেন। [২৫০] তিনি আঙ্গুল ফাঁক করে রাখতেন।[২৫১] তিনি ভুল নামায আদায়কারীকেও অনুরূপ নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন ঃ তুমি যখন রুকুতে যাবে, তখন তোমার দুই হাত দুই হাঁটুর উপর রাখবে এবং আঙ্গুলগুলো ফাঁক রাখবে। তারপর একটু থামবে যে পর্যন্ত না প্রত্যেক অঙ্গ তার নিজ স্থান আঁকড়ে ধরে। [২৫২]

তিনি দুই কনুই দুই পাঁজর থেকে দূরে রাখতেন। [২৫৩] তিনি রুকুতে গেলে পিঠ সমান ভাবে বাঁকাতেন। [২৫৪] এমন কি পিঠে পানি ঢেলে দিলে তা যেন সমান ভাবে স্থির হয়ে থাকবে। [২৫৫] তিনি ভুল নামায আদায়কারীকে বলেছিলেন, তুমি যখন রুকুতে যাবে, তখন তোমার দুই হাত দুই হাঁটুর উপর রাখ, তোমার পিঠ সমানভাবে বাঁকাও এবং শক্তভাবে রুকু কর। [২৫৬]

তিনি পিঠ থেকে মাথা উঁচু-নীচু করতেন না। [২৫৭] বরং মাথা পিঠ বরাবর সমান রাখতেন। [২৫৮]

ধীরস্থিরভাবে রুকু করা ওয়াজিব

রসূলুল্লাহ (সঃ) ধীরস্থিরভাবে রুকু করতেন এবং ভুল নামায আদায়কারীকেও অনুরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, তোমরা রুকু ও সাজদাহ পরিপূর্ণ কর। আল্লাহর শপথ, আমি আমার পেছনে তোমাদের রুকু ও সাজদাহ দেখি। [২৫৯]

---

২৫০. বোখারী, মুসলিম।

২৫১. হাকেম এটিকে সহীহ বলেছেন এবং আল্লামা যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।

২৫২. ইবনু খোযায়মাহ, ইবনু হিব্বান।

২৫৩. তিরমিযী। ইবনু খোযায়মাহ একে সহীহ বলেছেন।

২৫৪. বায়হাকী-সনদ সহীহ, বোখারী।

২৫৫. আল-কবীর ওয়াস্‌সাগীর-তাবারানী, যাওয়ায়েদ আল-মোসনাদ আবদুল্লাহ বিন আহমদ, ইবনু মাজাহ।

২৫৬. আহমদ, আবু দাউদ-সনদ সহীহ।

২৫৭. আবু দাউদ, বোখারী-কেরাআত অধ্যায়-সনদ সহীহ।

২৫৮. মুসলিম, আবু আওয়ানাহ।

২৫৯. বোখারী, মুসলিম। নামাযের মধ্যে পেছনে দেখা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মোজেযা ছিল। অন্যান্য সময় পেছনে দেখার কথা এখানে বলা হয়নি।

তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে রুকু পরিপূর্ণ করছে না এবং সাজদাহ ঠিকমত না করে ঠোকর দিচ্ছে। তখন তিনি বললেন, ঐ ব্যক্তি ঐ অবস্থায় মারা গেলে উম্মতে মোহাম্মদ হিসেবে বিবেচিত হবে না। সে নামাযে কাকের মত ঠোকর দিচ্ছে। যে ব্যক্তি রুকু পরিপূর্ণ করে না এবং সাজদায় ঠোকর মারে, তার উদাহরণ হল সেই ক্ষুধার্ত ব্যক্তির মত, যে একটি বা দু'টি খেজুর খায়, কিন্তু তাতে তার কোন লাভ হয় না। [২৬০] (অর্থাৎ ক্ষুধা দূর হয় না)।

আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে নামাযে মোরগের মত ঠোকর দিতে, শিয়ালের মত এদিক-ওদিক তাকাতে এবং বানরের মত চার পায়ের উপর বসতে নিষেধ করেছেন। [২৬১.]

রসূলুল্লাহ (সঃ) আরও বলেছেন, নামায-চোর হচ্ছে সর্ব নিকৃষ্ট চোর। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করেন, কিভাবে নামায চুরি হয়? তিনি বলেন, রুকু ও সাজদাহ পরিপূর্ণ না করা। [২৬২.]

একবার রসূলুল্লাহ (সঃ) নামায পড়া অবস্থায় নিজ চোখের কোণ দ্বারা এমন এক ব্যক্তিকে ইশারা করলেন, যে রুকু ও সাজদায় পিঠ সমানভাবে সোজা করেনি। নামায শেষে তিনি বললেন, হে মুসলিম সমাজ! সে ব্যক্তির নামায হয় না, যে রুকু ও সাজদায় পিঠ সোজা করে না। [২৬৩]

অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, রুকু ও সাজদায় পিঠ সোজা ও সমান না করলে কোন ব্যক্তির নামায হয় না। [২৬৪]

রুকুর যিকর

রসূলুল্লাহ (সঃ) এই রোকনটি আদায়ের সময় বিভিন্ন রকম যিকর ও দোআ পাঠ করতেন। কোন সময় একটা, কোন সময় অন্যটা। তিনি যা বলতেন, তা হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

---

২৬০. মোসনাদ-আবু ইয়া'লী, বায়হাকী, তাবারানী, ইবনু আসাকির, ইবনু খোযায়মাহ। সনদ সহীহ।

২৬১. আহমদ, ইবনু আলী শায়বা, আত্‌তায়ালিসী। হাদীসটি উত্তম।

২৬২.ইবনু আবী শায়বা, তাবারানী। হাকেম এটিকে সহীহ হাদীস বলেছেন এবং আল্লামা যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।

২৬৩. ইবনু আবী শায়বা, ইবনু মাজাহ, আহমদ। সনদ সহীহ।

২৬৪. আবু আ'ওয়ানা, আবু দাউদ, আস্‌সাহমী। দারু কুতনী একে সহীহ বলেছেন।

১. তিন বার সোবহানা রাব্বিয়াল আযীম।[২৬৫] অর্থ ঃ 'আমার মহান রবের পবিত্রতা বর্ণনা করছি।' তিনি কখনও এ বাক্য তিন বারেরও বেশী পড়তেন।[২৬৬] একবার রাতের নামাযে তিনি এই তাসবীহটি এত বেশী পড়লেন রুকুর সময় প্রায় দাঁড়ানোর সময়ের সমান হয়ে যায়। ঐ রাকআতে তিনি তিনটি লম্বা সূরা পড়েছিলেন। সেগুলো হচ্ছে, সূরা বাকারা, সূরা নিসা ও সূরা আলে-ইমরান। সেই রাকাতে তিনি মাঝে মাঝে দোআ ও গুনাহ্ মাফ চেয়েছেন। রাতের নামায অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

২. তিনবার সোবহানা রাব্বিয়াল আযীম ওয়া বিহামদিহী[২৬৭] অর্থ ঃ আমার মহান রবের পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি।

৩. কখনও নিচের বাক্যটি তিনবার পড়তেন ঃ[২৬৮]

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ -

অর্থ ঃ 'আল্লাহ পবিত্র ও মোবারক, তিনি সকল ফেরেশতা এবং জিবরাঈলের রব।'

৪. তিনি এই দোআটি রুকু ও সাজদায় বেশি বেশি পড়তেন।[২৬৯]

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ -

অর্থ ঃ 'মহান আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা, হে আল্লাহ! আমাকে মাফ কর।'

---

২৬৫. আহমদ, আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ, দারু কুত্‌নী, তাহাবী, বায়যার। তাবারানী ৭জন সাহাবী থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। ইবনুল কাইয়েম সহ যারা তিন তাসবীহর সংখ্যা অস্বীকার করেন এই হাদীস তাদের জন্য উত্তম জওয়াব।

২৬৬. নবী করীম (সঃ) কর্তৃক কেয়াম, রুকু ও সাজদা সমানহারে দীর্ঘায়িত করার হাদীস থেকে একথা প্রমাণিত। হাদীসটি এ অনুচ্ছেদের শেষে বর্ণিত হবে।

২৬৭. আবু দাউদ, দারু কুতনী, আহমদ, তাবারানী, বায়হাকী।

২৬৮. মুসলিম, আবু আ'ওয়ানা।

২৬৯. তিনি সূরা নাসরের আদেশ অনুযায়ী এই দোআ পড়তেন। তাতে আদেশ করা হয়েছে, আপনি আপনার রবের পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করুন এবং ক্ষমা চান।

৫. কখনও পড়তেন ঃ [২৭০]

اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ اَنْتَ رَبِّىْ خَشَعَ لَكَ سَمْعِىْ وَبَصَرِىْ وَمُخِّىْ وَعَظْمِىْ وَعَصَبِىْ وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য রুকু করেছি তোমার প্রতি ঈমান এনেছি, তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছি, তোমার উপর নির্ভর করেছি, তুমি আমার রব! তোমার জন্য আমার কান, চোখ, মগয, হাড় ও শিরা বিনীত। আমার পা যতবার উপরের দিকে উঠে, তা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টির জন্যই উঠে।'

৬. তিনি এই দোয়াও পড়তেন ঃ [২৭১]

سُبْحَانَ ذِى الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ -

অর্থ ঃ "সেই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, যিনি শাস্তি, বাদশাহী, শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের অধিকারী।" তিনি রাতের নামাজে এ দোআ পড়েছেন।

রুকু দীর্ঘায়িত করা

রসূলুল্লাহ (সঃ) রুকু, রুকু থেকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সাজদাহ এবং দুই সাজদার মাঝখানে প্রায় সমপরিমাণ সময় ব্যয় করতেন। [২৭২]

---

২৭০. মুসলিম, আবু আওয়ানাহ, তাহাওয়ী দারু কুতনী।

২৭১. আবু দাউদ, নাসাঈ-সনদ সহীহ। একই রুকুতে উপরোল্লিখিত সকল দোআ' ও যিকর এক সাথে পড়া জায়েয কিনা তা নিয়ে মতভেদ আছে। ইবনুল কাইয়েম যাদুল মাআদ গ্রন্থে এব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্ব প্রকাশ করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম নববী বলিষ্ঠভাবে তাকে জায়েয বলেছেন। তিনি তাঁর 'আযকার' গ্রন্থে লিখেছেন, সম্ভব হলে সকল দোআ একই সাথে পড়া উত্তম। কিন্তু 'নায়লুল আবরার' গ্রন্থে আবুত্ তাইয়্যেব সিদ্দীক হাসান খান বলেছেন ঃ 'রসূলুল্লাহ (সঃ) এক সময় একটা পড়েছেন। সবগুলো একত্রে পড়েননি। বেশ-কম না করে তাঁর হুবহু অনুসরণ করাই উত্তম। একথা বিশুদ্ধ বলে আমার মনে হয়। তবে দীর্ঘ রুকু সহ রসূলুল্লাহর দীর্ঘ নামাযের যে বর্ণনা হাদীসে এসেছে, সে অনুযায়ী কেউ দীর্ঘ নামায পড়লে রুকুতে সকল দোআ না পড়ে তা সম্ভব নয়। যেমনটি বলেছেন ইমাম নববী। তবে একই যিকরের পুনরাবৃত্তি করা সুন্নতের বেশি নিকটবর্তী।

২৭২. বোখারী, মুসলিম।

রুকুতে কোরআন পড়া নিষেধ

রসূলুল্লাহ (সঃ) রুকু' ও সাজদায় কোরআন পড়তে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, আমাকে রুকু ও সাজদায় কোরআন পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। তোমরা রুকুতে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ কর এবং সাজদায় বেশী বেশী করে দোআ কর। সাজদা দোআ' কবুলের উপযুক্ত জায়গা। [২৭৩]

রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো এবং দোআ পড়া

রসূলুল্লাহ (সঃ) রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর সময় বলতেন ঃ

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ۔

অর্থ ঃ "আল্লাহ সেই ব্যক্তির কথা কবুল করেন, যে তাঁর প্রশংসা করে।"[২৭৪] তিনি ভুল নামায আদায়কারীকে বলেছেন, কোন ব্যক্তির নামায সে পর্যন্ত শুদ্ধ হয় না, যে পর্যন্ত না সে তাকবীর বলে রুকু থেকে সম্পূর্ণ সোজা হয়ে সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলে। [২৭৫]

তারপর তিনি দাঁড়িয়ে বলতেন ঃ رَبَّنَا (وَ) لَكَ الْحَمْدُ ـ

এখানে ওয়াও সহ বা তা ব্যতিত উভয় প্রকার পড়ার বর্ণনা আছে।

– (বোখারী, আহ্‌মদ)

অর্থঃ হে আমাদের রব! (এবং) তোমার জন্যই সকল প্রশংসা।

তিনি সকল ধরনের মুসল্লীকে অনুরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'তোমরা আমাকে যেরূপ নামায পড়তে দেখ, সেরূপ নামায পড়।' [২৭৬]

তিনি আরও বলেছেন, ইমামকে অনুসরণের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তিনি যখন سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলবে, তখন তোমরা বলবে, اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

---

২৭৩. মুসলিম, আবু আ'ওয়ানা। এই নিষেধাজ্ঞা ফরয ও নফল সকল নামাযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ইবনু আসাকির নফল নামাযে জায়েয বলে যে মন্তব্য করেছেন, তা দুর্বল।

২৭৪. বোখারী, মুসলিম।

২৭৫. আবু দাউদ। হাকেম এটিকে সহীহ বলেছেন এবং আল্লামা যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।

২৭৬. বোখারী, আহমদ।

আল্লাহ তোমাদের প্রশংসা শুনবেন। আল্লাহ তাঁর নবীর মুখে বলেছেন, যে আল্লাহর প্রশংসা করে, তিনি তা শুনেন। [২৭৭]

তিনি অন্য এক হাদীসে এর কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন, যার কথা ফেরেশতার দোআর সাথে একাকার হয়ে যাবে আল্লাহ্ তার অতীতের সকল গুনাহ্ মাফ করে দেবেন। [২৭৮]

তিনি রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর সময় দু'হাত উপরে উঠাতেন। তাকবীরে তাহরীমা অধ্যায়ে তা আলোচনা করা হয়েছে।

১. তারপর তিনি দাঁড়ানো অবস্থায় নীচে বর্ণিত দোআ পড়েছেন ঃ

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ [২৭৯]

২. কোনো সময় পড়তেন ঃ

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ [২৮০]

৩. কোনো সময় তিনি উপরোক্ত বাক্যগুলোর আগে اَللّٰهُمَّ শব্দ যোগ করে পড়তেন। [২৮১]

এই ভাবে পড়ার জন্য তিনি আদেশ করে বলেছেন।

৪. ইমাম যখন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলবে, তখন তোমরা বলবে, 'আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ'। যে ব্যক্তির কথা ফেরেশতার কথার সাথে মিলে যাবে, আল্লাহ্ তার অতীতের গুনাহ্ মাফ করে দেবেন। [২৮২]

৫. তিনি কখনও এর সাথে নিম্নোক্ত দোআ যোগ করতেন ঃ [২৮৩]

---

২৭৭. মুসলিম, আবু আ'ওয়ানা, আহমদ, আবু দাউদ।

২৭৮. বোখারী, মুসলিম। তিরমিযী একে সহীহ্ হাদীস বলেছেন।

২৭৯. বোখারী, মুসলিম। মোতাওয়ায়াতের রেওয়াতের দ্বারা হাত তোলার কথা বর্ণিত।

২৮০. ঐ।

২৮১. বোখারী, আহমদ। ইবনুল কাইয়েম তাঁর যাদুল মাআ'দ গ্রন্থে 'আল্লাহুম্মা' এবং 'ওয়াও' সম্বলিত বর্ণনাগুলোকে অস্বীকার করেছেন। অথচ এ সকল বর্ণনা বোখারী, মোসনাদে আহমদ এবং নাসাঈতে আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে, দারেমীতে ইবনু উমার থেকে, বায়হাকীতে আবু সাঈদ খুদরী থেকে এবং নাসাঈতে অন্য এক সূত্রে আবু মূসা আশআরী থেকে বর্ণিত আছে।

২৮২. বোখারী, মুসলিম। তিরমিযী একে সহীহ্ হাদীস বলেছেন।

২৮৩. মুসলিম, আবু আ'ওয়ানা।

مِلْءَ السَّمٰوٰتِ وَمِلْءَ الْاَرْضِ وَمِلْءَ مَاشِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

অর্থ ঃ আসমান ভরে, যমীন ভরে এবং তুমি আরও যা চাও তা ভরে (তোমার প্রশংসা)

৬. কিংবা তিনি যোগ করে পড়তেন ঃ [২৮৪]

مِلْءَ السَّمٰوٰتِ وَمِلْءَ الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَاشِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

৭. কখনও তিনি এই দোআটি যোগ করতেন ঃ [২৮৫]

اَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ لاَمَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَاالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ـ

অর্থ ঃ 'হে প্রশংসা ও মর্যাদার অধিকারী! তুমি যাকে দাও তা রোধকারী কেউ নেই, তুমি যাকে বঞ্চিত কর তাকে কোন দানকারী নেই এবং কোন বিত্তশালী ও ক্ষমতাধর ব্যক্তির শক্তি ও সম্পদ তোমার কাছ থেকে তাকে রক্ষা করে উপকার করতে পারে না। (একমাত্র নেক আমলই তাকে রক্ষা করতে পারে।)

৮. তিনি রাতের নামাযে কখনও বলতেন ঃ

لِرَبِّىَ الْحَمْدُ، لِرَبِّىَ الْحَمْدُ ـ

অর্থ ঃ আমার রবের সকল প্রশংসা, আমার রবের সকল প্রশংসা।

তিনি এটা বারবার পুনরাবৃত্তি করতেন। ফলে তাঁর এই কেয়াম বা সোজা হয়ে দাঁড়ানোর সময় প্রায় রুকুর সময়ের পরিমাণ হয়ে যেত। আর রুকুর সময়ের পরিমাণ ছিল প্রথম রাকআতের কেয়াম সমান, যে রাকআতে তিনি সূরা বাকারা পড়েছেন। [২৮৬]

৯. কখনও তিনি নীচের দোয়াটি যোগ করতেন ঃ

مِلْءَ السَّمٰوٰتِ وَمِلْءَ الْاَرْضِ وَمِلْءَ مَاشِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، اَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ اَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ اَللّٰهُمَّ لاَمَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَاالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ـ

২৮৪. ঐ।

২৮৫. ঐ।

২৮৬. আবু দাউদ, নাসাঈ-সনদ সহীহ।

অর্থ ঃ আসমান ভরে, যমীন ভরে এবং তুমি আরও যা চাও তা ভরে তোমার প্রশংসা। হে প্রশংসা ও মর্যাদার অধিকারী, বান্দার প্রশংসা পাওয়ার সর্বাধিক যোগ্য সত্তা! আমরা সবাই তোমার গোলাম। তুমি যাকে দাও তা রোধকারী কেউ নেই। তুমি যাকে বঞ্চিত কর তাকে কোন দানকারী নেই। কোনবিত্তশালী ও ক্ষমতাধর ব্যক্তির সম্পদ ও শক্তি তোমার কাছ থেকে তাকে রক্ষা করে উপকার করতে পারে না। [২৮৭]

১০. তিনি নিম্নের দোআ পড়েছেন ঃ

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ (مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضٰى)

অর্থ ঃ হে আমাদের রব! তোমার জন্যই প্রশংসা, অত্যধিক পবিত্র ও মোবারক প্রশংসা, (প্রশংসাকারীর জন্যও তা মোবারক হোক, যেভাবে আমাদের রব পসন্দ করেন ও সন্তুষ্ট থাকেন)।

রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পিছনে নামায আদায়কারী এক সাহাবী রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে দাঁড়ানোর পর ঐ দোআটি পড়েন। রসূলুল্লাহ (সঃ) নামায শেষ করে জিজ্ঞেস করলেন, কে ঐ দোআটি পড়েছিল? ব্যক্তিটি বলল, আমি ইয়া রসূলাল্লাহ! রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আমি ৩৩-এরও অধিক ফেরশতাকে প্রতিযোগিতা করতে দেখেছি, কে প্রথমে তা লিখবে! [২৮৮]

রুকু থেকে ধীরস্থিরভাবে দাঁড়ানো ওয়াজিব

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, রসূলুল্লাহ (সঃ) প্রায় রুকুর সমপরিমাণ সময় রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। তাঁর দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকার কারণে কেউ কেউ ধারণা করতেন তিনি সাজদায় যাবার কথা ভুলে গেছেন।[২৮৯]

তিনি ভুল নামায আদায়কারীকে প্রশান্তি সহকারে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিয়ে বলেছেন ঃ তারপর মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াও। অন্য এক রিওয়ায়াতে এসেছে, যখন তুমি মাথা তুলবে, তখন সোজা হয়ে দাঁড়াবে যেন হাড় তার

২৮৭. মুসলিম, আবু আ'ওয়ানা, আবু দাউদ।

২৮৮. মালেক, বোখারী, আবু দাউদ।

২৮৯. বোখারী, মুসলিম, আহমদ।

জোড়ার সাথে ঠিকমত খাপ খায়। [২৯০] তিনি তাকে বলেন, এরূপ না করলে তোমাদের নামায পরিপূর্ণ হবে না।

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ সেই ব্যক্তির নামাযের দিকে তাকান না, যে রুকু ও সাজদায় পিঠ সোজা করে না। [২৯১]

সাজদাহ্‌

রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকবীর বলে সাজদায় যেতেন। [২৯২] তিনি ভুল নামায আদায়কারীকে অনুরূপ আদেশ দিয়ে বলেছেন, তারপর তাকবীর বলে সাজদায় যাবে যেন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জোড়া শান্ত হয়। [২৯৩]

তিনি সাজদায় যাবার কালে তাকবীর বলতেন, দুই হাত দুই পাঁজর থেকে দূরে রেখে সাজদাহ্‌ করতেন। [২৯৪] তিনি কখনও কখনও সাজদাহ্‌ করার সময় দু'হাত উপরের দিকে উঠাতেন। [২৯৫]

---

২৯০. বোখারী, মুসলিম, দারেমী, হাকেম, শাফেঈ, আহমদ। এই হাদীসের উদ্দেশ্য হল, প্রশান্তির সাথে দাঁড়ানো। এই হাদীস দ্বারা হেজাযের কিছু আলেম রুকু থেকে দাঁড়িয়ে বুকের উপর হাত বাঁধার বৈধতা সম্পর্কে যা বলেছেন, তা রিওয়ায়াতের অর্থের মধ্যেই নেই। বরং এজাতীয় প্রমাণ বাতিল। এই কেয়ামে বুকে হাত বাঁধা যে বেদআত তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। এর কোন ভিত্তি থাকলে তা আমাদের পর্যন্ত পৌছত। অতীতের নেক লোকেরাও অনুরূপ করেছেন বলে কোন প্রমাণ নেই। হাদীসের কোন ইমামও এ প্রসঙ্গে অনুকূল কিছু বলেননি। শেখ তুয়াইজেরী ইমাম আহমদের বরাত দিয়ে বলেছেন, কেউ ইচ্ছা করলে হাত ছেড়ে দিতে পারে কিংবা বাঁধতে পারে। তিনি এটাকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাদীস বলেননি।

২৯১. আহমদ, আল কবীর-তাবারানী। – সনদ সহীহ।

২৯২. বোখারী, মুসলিম।

২৯৩. আবু দাউদ। হাকেম এটিকে সহীহ বলেছেন এবং আল্লামা যাহাবী একে সমর্থন করেছেন।

২৯৪. মোসনাদ, ২/২৮৪পৃঃ–আবু ইয়া'লী, সনদ ভাল, ইবনু খোযায়মাহ ১/৭৯/২, সনদ সহীহ।

২৯৫. নাসাঈ, দারু কুতনী, ফাওয়ায়েদ-আল মোখলেস। সনদ সহীহ। ১০ জন সাহাবী রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে উমার, ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী, তাউস, আবদুল্লাহ বিন তাউস, নাফে', সালিম বিন আবদুল্লাহ,কাসেম বিন মোহাম্মদ, আবদুল্লাহ বিন দীনার ও আতা এরূপ করাকে বৈধ বলেছেন। আবদুর রহমান বিন মাহদী একে সুন্নত বলেছেন। ইমাম আহমদ এর উপর আমল করেছেন এবং ইমাম শাফেঈ ও মালেকের মত এটাই।

হাত আগে মাটিতে রেখে সাজদায় যাওয়া

তিনি মাটিতে দুই হাঁটু রাখার আগে দুই হাত রাখতেন। [২৯৬]

দুই পায়ে তিনি এরূপ করার আদেশ দিয়ে বলেছেন, 'তোমাদের কেউ সাজদাহ্‌ করলে দুই পায়ে সে উটের মত না বসে, বরং হাঁটু রাখার আগে যেন দুই হাত মাটিতে রাখে। [২৯৭]

উটের বিরোধীতার উপায় হল, উট প্রথমে পেছনের দুই পায়ের উপর বসার উদ্যোগ নেয়। তাই প্রথমে দুই হাত মাটিতে রেখে সাজদা করলে উটের বসার বিরোধীতা হয়।

তিনি আরও বলেছেনঃ কপালের মত হাতও সাজদাহ্‌ করে। তোমাদের কেউ মাটিতে কপাল দিয়ে সীজদাহ করার আগে দুই হাত মাটিতে রাখবে। যখন সাজদাহ্‌ থেকে উঠবে, তখন দুই হাতও উঠাবে। [২৯৮]

তিনি দুই হাতের তালুর উপর ভর দিতেন এবং তা বিছিয়ে দিতেন। [২৯৯] তবে আঙ্গুলগুলো কেবলামুখী করে [৩০০] মিলিয়ে রাখতেন। [৩০১]

তিনি দুই হাতের তালু মাটিতে কাঁধ বরাবর রাখতেন [৩০২] এবং কখনও কখনও দুই কান বরাবর রাখতেন। [৩০৩]

তিনি নিজের কান ও কপাল মাটিতে মযবুত করে রাখতেন। তিনি ভুল নামায আদায়কারীকে বলেছিলেন, তুমি যখন সাজদাহ্‌ করবে, মযবুত ভাবে তা করবে। [৩০৪]

---

২৯৬. ইবনু খোযায়মাহ, দার কুতনী। হাকেম একে সহীহ বলেছেন এবং আল্লামা যাহাবী একে সমর্থন করেছেন। এ হাদীসের বিরোধী হাদীস সহীহ নয়। ইমাম মালেক, আহমদ ও আওযাঈর মতও এটাই।

২৯৭. আবু দাউদ, সোগরা ওয়া কোবরা-নাসাঈ, সনদ সহীহ।

২৯৮. ইবনু খোযায়মাহ, আহমদ, আস-সেরাজ। হাকেম একে সহীহ বলেছেন এবং আল্লামা যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।

২৯৯. আবু দাউদ। হাকেম একে সহীহ্‌ বলেছেন এবং আল্লামা যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।

৩০০.বায়হাকী-সনদ সহীহ, ইবনু আবী শায়বা ১/৮২/২, আস-সেরাজ।

৩০১. ইবনু খোযায়মাহ, বায়হাকী। হাকেম একে সহীহ বলেছেন এবং আল্লামা যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।

৩০২. ৩০৩. আবু দাউদ। তিরমিযী একে সহীহ বলেছেন।

৩০৪. আবু দাউদ, নাসাঈ–সনদ সহীহ।

অন্য এক রেওয়ায়াতে এসেছে, যখন তুমি সাজদাহ করবে, তখন কপাল ও হাত মযবুত ভাবে রাখবে এবং প্রত্যেক অঙ্গ যেন তার নিজ স্থানে প্রশান্তির সাথে বহাল হয়। [৩০৫]

তিনি আরো বলেছেন, সেই ব্যক্তির নামায হয় না, যার নাক ও কপাল মাটি স্পর্শ করে না। [৩০৬.]

তিনি দুই হাঁটু ও দুই পায়ের আঙ্গুল সুপ্রতিষ্ঠিত রেখে সাজদাহ করতেন।[৩০৭] পায়ের আঙ্গুলের মাথা কেবলামুখী করে রাখতেন, [৩০৮] পায়ের দুই গোঁড়ালি মিলিয়ে রাখতেন। [৩০৯] এবং দুই পা দাঁড় করিয়ে রাখতেন [৩১০] এবং অনুরূপ করার জন্য আদেশ করেছেন। [৩১১]

রসূলুল্লাহ (সঃ)সাত অঙ্গে সাজদাহ করতেন। অঙ্গগুলো হচ্ছে, দুই হাতের তালু, দুই হাঁটু, দুই পায়ের পাতা, কপাল ও নাক।

তিনি সাজদায় শেষের দু'টি অঙ্গকে (অর্থাৎ কপাল ও নাক) এক অঙ্গ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আরেক বর্ণনায় এসেছে, আমাকে সাত হাড়ে সাজদাহ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে দুই হাত। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, দুই হাতের তালু, দুই হাঁটু এবং দুই পায়ের আঙ্গুল। এই কথা বলে তিনি কপাল ও নাকের প্রতি ইঙ্গিত দেন। আর আমি যেন কাপড় ও চুল এলোমেলো হয়ে গেলে তা ঠিক না করি। রুকু ও সাজদায় এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে।[৩১২.]

তিনি বলেছেন, বান্দাহর সাজদার সময় তার সাতটি অঙ্গ এক সাথে সাজদাহ করে। সেই অঙ্গগুলো হচ্ছে, কপাল, দুই হাতের তালু, দুই হাঁটু ও দুই পা। [৩১৩]

---

৩০৫. ইবনু খোযায়মাহ-সনদ সহীহ।

৩০৬. দারু কুতনী, তাবারানী, আখবারে ইসপাহান-আবু নাঈম।

৩০৭. বায়হাকী- সনদ সহীহ।

৩০৮. বোখারী, আবু দাউদ।

৩০৯. তাহাবী, ইবনু খোযায়মাহ।

৩১০. বায়হাকী-সনদ সহীহ।

৩১১. তিরমিযী, হাকেম।

৩১২. বোখারী, মুসলিম।

৩১৩. মুসলিম, আবু আ'ওয়ানা, ইবনু হিব্বান।

এক ব্যক্তি নিজ চুল খোঁপার মত বেঁধে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পিছে নামায পড়েন। তিনি তাঁকে লক্ষ্য করে বলেন, 'তার উদাহরণ হল দুই হাত বাঁধা নামাযীর মত। [৩১৪] তিনি আরো বলেন, 'বাঁধা চুল শয়তানের আসন। [৩১৫]

তিনি দুই হাত মাটিতে লম্বা করে বিছিয়ে দিতেন না। [৩১৬] বরং তা যমীন থেকে উপরে এবং পেটের দুই পাশ থেকে দূরে রাখতেন এমন কি পেছন থেকে তাঁর বগলের নীচের শুভ্রতা দৃষ্টিগোচর হত। [৩১৭] কোন ছোট ভেড়া-বকরীর বাচ্চা তাঁর হাতের নীচ দিয়ে যেতে চাইলে যেতে পারত। [৩১৮]

এক সাহাবী একটু বাড়িয়ে বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন সাজদায় যান, তখন তাঁর দুই হাত পেটের দুই পাশ থেকে এতটুকু দূরত্বে থাকে যে, আমরা সেখানে আশ্রয় নিতে পারি। [৩১৯]

তিনি এরূপ করার আদেশ দিয়ে বলেছেন, তুমি যখন সাজদাহ করবে, তখন তোমার দুই হাতের তালু মাটিতে রাখবে এবং দুই কনুই উপরে রাখবে।[৩২০] তিনি আরো বলেছেন, তোমরা সাজদায় সোজা থাক এবং কুকুরের মত দুই হাত সামনের দিকে বিছিয়ে দিও না।[৩২১] তিনি অন্য এক হাদীসে বলেছেন, তোমরা কুকুরের মত দুই হাত বিছিয়ে দিও না।[৩২২] তিনি আরও বলেছেন, তোমরা হিংস্র প্রাণীর মত হাত বিছিয়ে দিও না, দুই হাতের তালুর উপর ভর রাখ এবং দুই বাহুকে আলাদা রাখ। এই ভাবে করলে তোমার সকল অঙ্গ সাজদাহ করবে।[৩২৩]

---

৩১৪. হাদীসটির অর্থ হল, চুল খোলা থাকলে সাজদার সময় তা মাটিতে পড়ত এবং নামাযীকে এর সওয়াব দেয়া হত। কিন্তু চুল বাঁধা থাকার অর্থ হল, চুলের সাজদাহ না করা। একে দুই হাত বাঁধা নামাযীর সাথে তুলনা করা হয়েছে। কেননা, হাত বাঁধা থাকলে সাজদার সময় হাত মাটিতে পড়ে না। আমার মতে এই হুকুম পুরুষের জন্য, মেয়েদের জন্য নয়। শাওকানী ইবনু আরাবী থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩১৫. আবু দাঊদ। তিরমিযী এটিকে উত্তম হাদীস এবং ইবনু খোযায়মাহ ও ইবনু হিব্বান একে সহীহ হাদীস বলেছেন।

৩১৬. বোখারী, আবু দাঊদ।

৩১৭. বোখারী, মুসলিম।

৩১৮. মুসলিম, আবু আওয়ানা, ইবনু হিব্বান।

৩১৯. আবু দাঊদ, ইবনু মাজাহ-সনদ ভাল।

৩২০. মুসলিম, আবু আওয়ানা।

৩২১ বোখারী, মুসলিম, আবু দাঊদ, আহমদ।

৩২২ আহমদ। তিরমিযী এটিকে সহীহ বলেছেন।

৩২৩. ইবনু খোযায়মাহ। আলমোখতারাহ আল-মাকদেসী, হাকেম এটিকে সহীহ বলেছেন এবং আল্লামা যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।

সাজদায় প্রশান্তি লাভ করা

রসূলুল্লাহ (সঃ) রুকু ও সাজদাহ পরিপূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি রুকু ও সাজদাহ অপূর্ণকারীকে ঐ ক্ষুধার্ত ব্যক্তির মতো বলেছেন, যে ক্ষুধার সময় একটি বা দু'টো খেজুর খায়, কিন্তু তাতে তার ক্ষুধা দূর হয় না। তিনি আরো বলেছেন, এ জাতীয় লোক খুবই নিকৃষ্ট চোর।

তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি রুকু ও সাজদায় পিঠ সোজা করে না, তার নামায বাতিল। রুকু অধ্যায়ে এ সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও তিনি ভুল নামায আদায়কারী ব্যক্তিকে প্রশান্তির সাথে ধীরস্থিরভাবে নামায পড়ার আদেশ দিয়েছেন।

সাজদার যিকর

রসূলুল্লাহ (সঃ) নামাযের এই গুরুত্বপূর্ণ রোকনটিতে বিভিন্ন প্রকার দোআ ও যিকর করেছেন। অর্থাৎ একেক সময় একেকটা পাঠ করেছেন। তিনি সাজদায় যা পড়েছেন, তা হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

১. سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى - তিনবার পড়তেন।৩২৪

আবার কখনও আরও বেশী পড়তেন।৩২৫ তিনি একবার রাতের নামাযে তা এত বেশী সময় পড়েছেন যা কেয়ামের সময়ের সমান ছিল। তিনি ঐ নামাযের কেয়ামে তিনটি লম্বা সূরা পড়েছেন এবং সেগুলোর মাঝে মাঝে দোআ এবং এস্তেগফার করেছেন। সূরাগুলো হল, সূরা বাকারা, সূরা নিসা এবং সূরা আলে-ইমরান। 'রাতের নামায' অধ্যায়ে তা আলোচনা করা হয়েছে।

২. سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ তিনবার পড়তেন।৩২৬

৩. سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ - কখনও এরূপ পড়তেন।৩২৭

অর্থ ঃ আল্লাহ পবিত্র মোবারক, সকল ফেরেশতা এবং জিবরীলের প্রতিপালক।

---

৩২৪. আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারু কুতনী, তাহাবী, বাযযার। তাবারানী ৭জন সাহবী থেকে তা বর্ণনা করেছেন।

৩২৫. ঐ।

৩২৬. আবু দাউদ, দারু কুতনী, আহমদ, তাবারানী, বায়হাকী। হাদিসটি সহীহ।

৩২৭. মুসলিম, আবু আ'ওয়ানাহ।

৪. سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, হে আমাদের রব! তোমার পবিত্রতা ও প্রশংসা। হে আল্লাহ্! আমাকে মাফ কর।

তিনি এটি রুকু ও সাজদায় অনেক বেশী পড়তেন।[৩২৮] আগেও এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে

৫. اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ وَاَنْتَ رَبِّيْ سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ فَاَحْسَنَ صُوَرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ -

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার জন্যই সাজদাহ করছি, তোমার প্রতিই ঈমান এনেছি, তোমার কাছেই আত্মসমর্পণ করেছি। তুমি আমার রব। যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, সুন্দর আকৃতি দান করেছেন এবং চোখ ও কান দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, আমার মুখমণ্ডল তাঁর কাছে সাজ্দা অবনত। আল্লাহ বরকতময় এবং সর্বোত্তম স্রষ্টা। ৩২৯

৬. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهُ وَدِقَّهُ وَجِلَّهُ وَاَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমার সকল সূক্ষ্ম ও বাহ্যিক, প্রথম ও শেষ এবং প্রকাশ্য ও গোপন গুনাহ মাফ কর।৩৩০

৭. سَجَدَ لَكَ سَوَادِيْ وَخِيَالِيْ وَاٰمَنَ بِكَ فُؤَادِيْ اَبُوْءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ هٰذِهٖ يَدِيْ وَمَا جَنَيْتُ عَلٰى نَفْسِيْ

অর্থ ঃ আমার মন-মগয তোমার উদ্দেশ্যে সাজদাহ করছে, আমার অন্তর তোমার প্রতি ঈমান এনেছে, আমি আমার উপর তোমার নেয়ামত স্বীকার করি। এই আমার হাত, আমি যে সকল অপরাধ করেছি তাও স্বীকার করি।৩৩১

---

৩২৮. বোখারী, মুসলিম।

৩২৯. মুসলিম, আবু আওয়ানাহ, তাহাবী, দারু কুতনী।

৩৩০. মুসলিম, আবু আওয়ানাহ।

৩৩১. ইবনু নসর, বাযযার। হাকেম এটিকে সহীহ বলেছেন।

৮. سُبْحَانَ ذِى الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ

অর্থঃ সেই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা, যিনি ক্ষমতা, বাদশাহী শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের অধিকারী।৩৩২

নিম্নলিখিত দোআগুলো রাত্রের নামাযে পড়তেন–

৯. سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তোমার পবিত্রতা ও প্রশংসা, তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই।৩৩৩

১০. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ مَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমার গোপন ও প্রকাশ্য গুনাহ মাফ কর।৩৩৪

১১. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَفِيْ لِسَانِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ مِنْ تَحْتِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِيْ نُوْرًا وَعَنْ يَمِيْنِيْ نُوْرًا وَعَنْ يَسَارِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ اَمَامِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ خَلْفِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِيْ نَفْسِيْ نُوْرًا وَاعْظِمْ لِيْ نُوْرًا ـ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমার অন্তর, জিহবা, কান, চোখ, নীচে, উপরে, ডানে-বাঁয়ে, সামনে- পিছে এবং দেহে নূর (আলো) দান কর এবং আমার নূরকে মহান করে দাও।৩৩৫

১২. اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَاَعُوْذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْكَ لَااُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ ـ

---

৩৩২. আবু দাউদ, নাসাঈ– সনদ সহীহ

৩৩৩. মুসলিম, আবু আওয়ানা, নাসাঈ, ইবনু নসর।

৩৩৪. ইবনু আবী শায়বাহ, নাসাঈ। হাকেম এটাকে সহীহ বলেছেন এবং আল্লামা যাহাবী এর প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন।

৩৩৫. মুসলিম, আবু আ'ওয়ানা, ইবনু আবী শায়বা।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার সন্তুষ্টির বিনিময়ে তোমার অসন্তোষ থেকে পানাহ চাই, তোমার ক্ষমা দ্বারা তোমার শাস্তি থেকে আশ্রয় চাই এবং তোমার ওসীলায় তোমার কাছে পানাহ চাই। তুমি নিজে নিজের যে রকম প্রশংসা করেছ আমি তোমার সে রকম প্রশংসা করতে অপারগ।৩৩৬

সাজদায় কোরআন পড়া নিষিদ্ধ

রসূলুল্লাহ (সঃ) রুকু ও সাজদায় কোরআন পড়তে নিষেধ করেছেন। বরং তিনি সাজদায় অধিকতর দোআ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এমর্মে একটি হাদীস রুকু অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

তিনি বলেছেন, বান্দাহ সাজদাহ অবস্থায় আল্লাহর বেশী নিকটবর্তী হয়। তোমরা সাজদায় বেশী বেশী করে দোআ কর।৩৩৭

সাজদাহ দীর্ঘায়িত করা

রসূলুল্লাহ (সঃ) রুকুর মত দীর্ঘ সাজদাও করতেন। কখনো কখনো আকস্মিক কারণে সাজদাহ তিনি অতিমাত্রায় দীর্ঘায়িত করতেন।

এক সাহাবী বর্ণনা করেন, একবার রসূলুল্লাহ (সঃ) বিকেলের (আসর কিংবা মাগরিব) নামাযের জন্য সাথে হাসান কিংবা হোসাইনকে নিয়ে বেরিয়ে আসেন। নবী (সঃ) ইমামতির জন্য অগ্রসর হন এবং তাকে ডান পায়ের কাছে রাখেন। তারপর তাকবীর বলে নামায শুরু করেন। তিনি সাজদাহ করেন এবং তা খুব দীর্ঘায়িত করেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি মুসল্লীদের মাঝে মাথা তুলে দেখি, শিশুটি রসূলুল্লাহ্‌র পিঠের উপর এবং তিনি সাজদারত। আমি পুনরায় সাজদায় ফিরে যাই। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নামায শেষে লোকেরা জিজ্ঞেস করে, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আপনার এই নামাযের মধ্যে একটি দীর্ঘ সাজদাহ দিয়েছেন যার ফলে আমাদের মনে দুর্ঘটনার আশংকা জেগেছে, কিংবা ধারণা করেছিলাম যে, আপনার উপর ওহী নাযিল হচ্ছিল। তিনি উত্তরে বলেন, এগুলো কিছুই ঘটেনি। আমার সন্তানটি আমার উপর আরোহণ করায় আমি তাকে তার সখ পূরণের আগে দ্রুত নামিয়ে দিতে পছন্দ করিনি।৩৩৮

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন নামায পড়েন, তখন হাসান ও হোসাইন তাঁর পিঠে আরোহন করে। লোকেরা যখন শিশু

---

৩৩৬. ঐ।

৩৩৭. মুসলিম, আবু আ'ওয়ানা, বায়হাকী।

৩৩৮. নাসাঈ, ইবনু আসাকির। হাকেম এটিকে সহীহ বলেছেন এবং আল্লামা যাহাবী একে সমর্থন করেছেন।

দু'টিকে আরোহণ করতে নিষেধ করেন, তখন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ইশারা দেন যে, তাদের বিষয়টা ছেড়ে দাও। নামায শেষে তিনি দুজনকে নিজের কোলে বসান এবং বলেন, যে আমাকে ভালবাসে, সে যেন এই দুজনকেও ভালবাসে।[৩৩৯]

সাজদার ফযীলত

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলতেন, আমার উম্মাহর মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যাকে আমি কেয়ামতের দিন চিনতে পারবো না। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রসূল! এত সৃষ্টির মধ্যে আপনি কি করে তাদেরকে চিনবেন ? তিনি প্রশ্ন করেন, ঐ বিষয়ে তোমার রায় কি, তুমি যদি কোনো আস্তাবলে প্রবেশ করো আর সেখানে যদি কালো ঘোড়ার মধ্যে এমন একটি ঘোড়া থাকে যার পায়ের নীচের অংশ, হাত ও মুখ সাদা, তুমি কি তাকে পৃথক করে চিনতে পারবে না ? সাহাবী জওয়াবে বললেন, 'জী হাঁ।' তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, ঐ দিন আমার উম্মতের সাজদার কারণে সাদা ধবধবে চেহারা এবং উযুর কারণে হাত-পা উজ্জ্বল সাদা হবে।[৩৪০]

রসূলুল্লাহ (সঃ) আরও বলেছেন, আল্লাহ যদি কোন দোযখবাসীকে দয়া করার ইচ্ছে করেন, তখন তিনি ফেরেশতাদেরকে আদেশ দেবেন এবং বলবেন, আল্লাহর ইবাদতকারীকে বের করে নিয়ে আস। ফেরেশতারা তাকে দোযখ থেকে বের করে নিয়ে আসবে। তারা তাকে তার সাজদার চিহ্নের কারণে চিনতে পারবে। আল্লাহ দোযখের উপর সাজদার চিহ্নকে জ্বালানো হারাম করে দিয়েছেন। তাকে দোযখ থেকে বের করে নিয়ে আসা হবে। আগুন আদম সন্তানের শরীরের সকল অংশ খেলেও সাজদার অংশ খেতে পারবে না।[৩৪১]

মাটি ও চাটাইতে সাজদাহ করা

রসূলুল্লাহ (সঃ) মাটিতেই অধিংকাশ সর্ময় সাজদাহ করেছেন।[৩৪২]

সাহাবায়ে কেরাম কঠোর ও প্রখর রোদে তাঁর সাথে নামায আদায় করতেন। যারা তাপের কারণে কপাল মাটিতে রাখতে পারতেন না, তারা কাপড় বিছিয়ে সাজদাহ করতেন।[৩৪৩]

---

৩৩৯. ইবনু খোযায়মাহ, বায়হাকী। বোখারী ও মুসলিম শরীফে এ বিষয়ে আরও হাদীস আছে।

৩৪০. আহমদ- সনদ সহীহ, তিরমিযী- এ হাদীসে, হাত, পা ও মুখে উযুর চিহ্নকে ঘোড়ার হাত, পা ও মুখের শুভ্রতার সাথে তুলনা করা হয়েছে যে, এগুলোও অনুরূপ শুভ্র হবে।

৩৪১. বোখারী, মুসলিম।

৩৪২. কেননা, তাঁর মসজিদে তখন চাটাই বা অন্য কিছু ছিল না। এ প্রসঙ্গে অনেক হাদীস আছে।

৩৪৩. মুসলিম, আবু আ'ওয়ানাহ।

তিনি আরও বলতেন; গোটা যমীন আমার উম্মতের জন্য মসজিদ ও পবিত্র করা হয়েছে। যখন এবং যেখানে নামাযের সময় হবে, সেখানেই তার মসজিদ ও সেখানেই পবিত্রতা। আমার পূর্বের লোকদের জন্য এ বিষয়ে কঠিন নিয়ম ছিল। তারা কেবল গীর্জায় নামায পড়ত।[৩৪৪]

কদাচিত তিনি কাদা মাটি ও পানিতে সাজদাহ করেছেন। একবার একুশে রমযানের ফজরের নামাযে তা ঘটেছিল। আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের ফলে মসজিদের খেজুর পাতার চাল বেয়ে মসজিদে পানি পড়ে কাদা হয়ে যায়। তিনি সেই কাদাতে নামায পড়েন। আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) বলেন, আমি নিজ চোখে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কপাল ও নাকে কাদা দেখেছি।[৩৪৫]

তিনি কখনও খোমরা এবং কখনও চাটাইর উপর নামায পড়তেন।[৩৪৬]

পরিধানের কাপড়ের এক অংশ বিছিয়ে দীর্ঘ সময় নামায পড়ায় তা কালো হয়ে গেছে। এ হাদীস প্রমাণ করে যে পরিধানের কাপড়ের অংশ বিশেষ বিছিয়ে নামায পড়া জায়েয। তবে সিলেকর কোন জিনিসের উপর বসা জায়েয নেই। এ বিষয়ে পরিষ্কার নিষেধাজ্ঞা আছে। (বোখারী, মুসলিম)

সাজদাহ থেকে উঠা

তিনি তাকবীর বলে সাজদাহ থেকে মাথা তুলতেন[৩৪৭] এবং এভাবে করার জন্য ভুল নামায আদায়কারীকে আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ কোন মানুষের নামায পরিপূর্ণ হয় না যে পর্যন্ত না সে সাজদাহ করে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জোড়াগুলো প্রশান্ত হয়, তারপর আল্লাহু আকবার বলে মাথা তোলে এবং সোজা হয়ে বসে।[৩৪৮] তিনি কোন কোন সময় এই তাকবীরের সাথে দু'হাত উপরে তুলতেন।[৩৪৯] ইমাম আহমদ এ তাকবীরসহ সকল তাকবীরে হাত তোলার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। ইবনুল কাইয়েম আল বাদায়ে গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ৮৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, ইবনু আসরাম বর্ণনা করেছেন, একবার তাকে দু'হাত তোলার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়। তিনি উত্তরে বলেন, প্রত্যেক বার উঠা-নামার সময় দু'হাত তুলতে হবে। ইবনু আসরাম

৩৪৪. আহমদ, আস-সেরাজ, বায়হাকী– সনদ সহীহ।

৩৪৫. বোখারী, মুসলিম।

৩৪৬. ঐ। খোমরা হচ্ছে সাজদার জন্য নাক ও কপাল রাখার ছোট মতো জায়নামায।

৩৪৭. বোখারী, মুসলিম।

৩৪৮. আবু দাঊদ। হাকেম এটিকে সহীহ বলেছেন এবং আল্লামা যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।

৩৪৯. আহমদ, আবু দাউদ– সনদ সহীহ।

বলেন, আমি নামাযে আবু আবদুল্লাহকে প্রত্যেক উঠা-নামায় দু' হাত তুলতে দেখেছি। ইবনুল মোনযের এবং শাফেঈ' মাযহাবের আবু আলীসহ ইমাম মালেক ও শাফেঈর (রঃ)-ও একই মত। (তারহুত্ তাসরীব)। আনাস, ইবনে উমার, নাফে, তাউস, হাসান বসরী, ইবনে সিরীন এবং আইউব সাখতিয়ানীও হাত তোলার পক্ষে ছিলেন। সহীহ সনদ সহকারে মোসান্নাফে ইবনে আবী শায়বায় তা বর্ণিত আছে।

তারপর তিনি বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর প্রশান্তির সাথে বসতেন।[৩৫০] তিনি ভুল নামায আদায়কারীকে অনুরূপ আদেশ দিয়ে বলেছেন, তুমি যখন সাজদায় যাবে, মযবুতভাবে সাজদাহ করবে এবং যখন সাজদাহ থেকে উঠবে, তখন বাম রানের উপর বসবে।[৩৫১] তিনি ডান পা দাঁড় করিয়ে[৩৫২] আঙ্গুলকে কেবলামুখী রাখতেন।[৩৫৩]

দুই সাজদার মাঝে দুই পায়ের গোড়ালি দাঁড় করানো

রসূলুল্লাহ (সঃ) কখনও দু' সাজদার মাঝে দু' পায়ের গোড়ালি ও দু' পায়ের আঙ্গুল দাঁড় করিয়ে বসতেন।[৩৫৪]

দুই সাজদার মধ্যবর্তী সময় প্রশান্তি ওয়াজিব

রসূলুল্লাহ (সঃ) দু' সাজদার মধ্যবর্তী সময় এমনভাবে সোজা হয়ে প্রশান্তভাবে বসতেন যে, সকল হাড় নিজ নিজ স্থানে বহাল হত।[৩৫৫] তিনি ভুল

---

৩৫০. বোখারী, রাফউল ইয়াদাইন অধ্যায়, আবু দাঊদ- সনদ সহীহ, মুসলিম, আওয়ানাহ।

৩৫১. আহমদ, আবু দাউদ- সনদ ভাল।

৩৫২. বোখারী, বায়হাকী।

৩৫৩. নাসাঈ- সনদ সহীহ।

৩৫৪. মুসলিম, আবু আওয়ানা, আবুশ শেখ, বায়হাকী। ইবনুল কাইয়েম দুই সাজদার মাঝে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পা বিছানোর বর্ণনা উল্লেখ করে বলেন, তিনি এই একটি মাত্র বৈঠক ছাড়া আর কোথাও পায়ের গোড়ালি দাঁড় করিয়ে বসার বর্ণনা দেখতে পাননি। এটা ইবনুল কাইয়েমের ভুল। কেননা, মুসলিম, আবু দাঊদ, তিরমিযী সহ অন্যারা ইবনে আব্বাস থেকে পায়ের গোড়ালির উপর বসার বর্ণনা দিয়েছেন। বায়হাকী ইবনে উমার থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে হাজার তাকে সমর্থন করেছেন। তাউস বলেছেন, তিনি ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমারকে অনুরূপ বসতে দেখেছেন। একদল সাহাবী ও তাবেঈ পায়ের গোড়ালির উপর বসেছেন।

৩৫৫. আবু দাঊদ, বায়হাকী সনদ সহীহ।

নামায আদায়কারীকে অনুরূপ করার আদেশ দিয়ে বলেছেন, তোমাদের কেউ অনুরূপ না করলে তার নামায পরিপূর্ণ হবে না।[৩৫৬]

তিনি দুই সাজদার মাঝখানে প্রায় সাজদার সমপরিমাণ সময় বসতেন।[৩৫৭] কখনও কখনও তিনি এত দীর্ঘ সময় বসে থাকতেন যে, কেউ কেউ বলত, তিনি ভুলে গেছেন।[৩৫৮]

দুই সাজদার মধ্যবর্তী বৈঠকের দোআ ও যিকর

তিনি এই বৈঠকে বলতেন ঃ

رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَارْفَعْنِيْ অন্য বর্ণনায় اَللّٰهُمَّ

وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ -[৩৫৯]

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে মাফ কর, দয়া কর, আমার অবস্থা পরিশুদ্ধ করে দাও, আমার মর্যাদা বাড়িয়ে দাও, আমাকে হেদায়াত দাও, সুস্থতা দাও, রিযক দাও।

তিনি কখনও বলতেন ঃ رَبِّ اغْفِرْلِيْ اِغْفِرْلِيْ [৩৬০]

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে মাফ কর, আমাকে মাফ কর।

তিনি রাতের নামাযেও এই দুই দোআ পড়েছেন।[৩৬১]

তারপর তিনি তাকবীর বলে দ্বিতীয় সাজদায় যেতেন।[৩৬২] তিনি ভুল নামায আদায়কারীকে অনুরূপ করার আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তুমি আল্লাহু আকবার বলবে এবং সাজদায় যাবে যেন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জোড়াগুলো

---

৩৫৬. আবু দাঊদ, হাকেম।

৩৫৭. বোখারী, মুসলিম।

৩৫৮. ঐ।

৩৫৯. আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, হাকেম।

৩৬০. ইবনু মাজাহ– সনদ সহীহ। ইমাম আহমদ এই দোআটি মনোনীত করেছেন। ইসহাক বিন রাহওয়ায়হ বলেছেন, এটা তিনবার বলা যায় কিংবা 'আল্লাহুম্মাগফিরলি'ও বলা যায়। রসূলুল্লাহ (সঃ) উভয়টাই দুই সাজদার মাঝে পড়েছেন।

৩৬১. নফল নামাযের দোআ ফরয নামাযে পড়া যায়। ইমাম শাফেঈ, আহমদ ও ইসহাকের মত এটাই। তিরমিযীও তাই বর্ণনা করেছেন। ইমাম তাহাবীও তাই বলেছেন।

৩৬২. বোখারী, মুসলিম।

প্রশান্ত হয়। সকল নামাযে এভাবেই করবে।[৩৬৩] তিনি কখনও কখনও তাকবীরের সাথে হাত তুলতেন।[৩৬৪]

তিনি প্রথম সাজদায় যা করতেন দ্বিতীয় সাজদায়ও অনুরূপ করতেন। তারপর তাকবীর বলে মাথা তুলতেন।[৩৬৫] তিনি ভুল নামায আদায়কারীকে আদেশ দিয়ে বলেছেন, তারপর মাথা তুলবে ও তাকবীর বলবে[৩৬৬] এবং প্রত্যেক রাকআত ও সাজদায় এরূপ করবে। এভাবে করলে তোমার নামায পরিপূর্ণ হবে। যদি তা থেকে কিছু কম হয়, তাহলে তোমার নামায অপূর্ণ হবে।[৩৬৭]

তিনি কখনও সাজদাহ থেকে উঠার সময় দু'হাত তুলতেন।[৩৬৮]

বিশ্রামের বৈঠক

তিনি দ্বিতীয় সাজদাহ থেকে সোজা হয়ে বাম পায়ের উপর বসতেন এবং প্রত্যেক হাড় তার স্ব স্ব স্থানে বহাল হওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম নিতেন।[৩৬৯]

পরবর্তী রাকআতের উদ্দেশ্যে উঠার জন্য দুই হাতের উপর ভর দেয়া

রসূলুল্লাহ (সঃ) দ্বিতীয় রাকআতের উদ্দেশ্যে উঠার সময় মাটিতে ভর দিয়ে উঠতেন।[৩৭০]

তিনি উপরে উঠার সময় দুই হাতের উপর ভর দিয়ে উঠতেন।[৩৭১]

---

৩৬৩. আবু দাঊদ। হাকেম এটিকে সহীহ বলেছেন এবং আল্লামা যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।

৩৬৪. আবু আওয়ানহ, আবু দাউদ, সনদ সহীহ। ইমাম আহমদ, মালেক এবং শাফেঈ (রঃ)-ও একই মত পোষণ করেন।

৩৬৫. মুসলিম, বোখারী।

৩৬৬. আবু দাঊদ, হাকেম।

৩৬৭. আহমদ, তিরমিযী- সনদ সহীহ।

৩৬৮. আবু আওয়ানা, আবু দাঊদ,- সনদ সহীহ। ইমাম আহমদ, শাফেঈ ও মালেক এই মতের সমর্থক।

৩৬৯. বোখারী, আবু দাঊদ। ইমাম শাফেঈ ও আহমদ এই সুন্নতের উপর আমল করেছেন। এটাই সঠিক, সুন্নত পালনের আগ্রহ থাকা দরকার। নবী (সঃ) বৃদ্ধ ও যৌবনকালে হাতের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতেন।

৩৭০. বোখারী, শাফেঈ।

৩৭১. আবু ইসহাক আল হারবী, -সনদ সহীহ। এক হাদীসে এসেছে যে, তিনি তীরের মত সোজা হয়ে দাঁড়াতেন, দু'হাতের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতেন না। এটি জাল হাদীস।

রসূলুল্লাহ (সঃ) দ্বিতীয় রাকআতের জন্য উঠে প্রথমে সূরা ফাতেহা পড়তেন এবং চুপ থাকতেন না।[৩৭২]

তিনি দ্বিতীয় রাকআতে তাই করতেন যা প্রথম রাকআতে করেছেন। তবে তিনি প্রথম রাকআতের চাইতে দ্বিতীয় রাকআতকে অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত করতেন।

প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতেহা পড়া ওয়াজিব

তিনি ভুল নামায আদায়কারীকে প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতেহা পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। প্রথম রাকআত শেষ হলে তিনি ভুল নামায আদায়কারীকে বলেছেন, 'তুমি তোমার প্রত্যেক নামাযে এভাবে করবে।'[৩৭৩] অন্য এক রেওয়ায়াতে এসেছে, 'প্রত্যেক রাকআতে'।[৩৭৪]

তিনি বলেছেন, 'প্রত্যেক রাকআতে কেরাআত পড়তে হবে।'[৩৭৫]

প্রথম তাশাহ্‌হুদ

দ্বিতীয় রাকআত শেষে নবী (সঃ) তাশাহ্‌হুদ পড়ার জন্য বসতেন। তিনি ফজরের মত দুই রাকআত বিশিষ্ট নামাযের শেষ বৈঠক[৩৭৬] কিংবা তিন ও চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযের প্রথম বৈঠকে পা বিছিয়ে বসতেন[৩৭৭] যেমন করে দুই সাজদার মাঝে বসতেন। তিনি ভুল নামায আদায়কারীকে অনুরূপ আদেশ দিয়ে বলছিলেন, তুমি যখন নামাযের মাঝামাঝি বসবে, তখন প্রশান্তি সহকারে বসবে এবং বাম উরু বিছিয়ে দেবে ও পরে তাশাহ্‌হুদ পড়বে।[৩৭৮]

---

৩৭২. মুসলিম, আবু আওয়ানাহ। অর্থাৎ প্রথম রাকআতের মতো সোবহানাকা পড়ার জন্য চুপ থাকতেন না। বরং সূরা ফাতেহা পড়া শুরু করতেন। তবে আউযুবিল্লাহ পড়তেন না। প্রথম রাকআত ব্যতীত অন্যান্য রাকআতে আউযুবিল্লাহ পড়ার বিষয়ে ওলামাদের ২টি মত আছে। আমার মতে, তা প্রত্যেক রাকআতে পড়া বৈধ।

৩৭৩. বোখারী, মুসলিম।

৩৭৪. আহমদ- সনদ ভাল।

৩৭৫. ইবনু মাজাহ, ইবনু হিব্বান, আহমদ। জাবের বলেছেন, যে ব্যক্তি নামাযের প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতেহা না পড়ে তার নামায হয়নি, তবে ইমামের পেছনে নামায পড়া এর ব্যতিক্রম (মোআত্তা মালেক)।

৩৭৬. নাসাঈ- সনদ সহীহ।

৩৭৭. বোখারী, আবু দাউদ।

৩৭৮. আবু দাউদ, বায়হাকী- সনদ ভাল।

আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আমার বন্ধু রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে কুকুরের মত বসতে নিষেধ করেছেন।[৩৭৯]

অন্য এক হাদীসে এসেছে, তিনি শয়তানের মত পায়ের গোড়ালির উপর বসতে নিষেধ করেছেন।[৩৮০]

তিনি তাশাহ্‌হুদের জন্য বসলে উরুর উপর ডান হাতের তালু রাখতেন। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, ডান হাঁটুর উপর রাখতেন এবং বাম হাতের তালু নিজ উরুর উপর রাখতেন। অন্য আরেক বর্ণনায় এসেছে, বাম হাঁটুর উপর রাখতেন।[৩৮১]

নবী (সঃ) ডান কনুইর নীচ অংশ ডান উরুর উপর রাখতেন।[৩৮২]

এক ব্যক্তি বাম হাতের উপর ভর করে নামাযে বসা ছিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে অনুরূপ করতে নিষেধ করে বলেছেন, এটা ইহুদীদের নামায (পদ্ধতি)।[৩৮৩] অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, 'এরকম বস না, এটা হচ্ছে শাস্তিযোগ্য লোকদের নামায।[৩৮৪] অন্য আরেক হাদীসে এসেছে, এটা অভিশপ্তদের নামায।[৩৮৫]

তাশহ্‌হুদের মধ্যে আঙ্গুল নাড়ানো

রসূলুল্লাহ (সঃ) বাম হাতের তালু বাম হাঁটুর উপর বিছিয়ে দিতেন, ডান হাতের সকল আঙ্গুল মুষ্টিবদ্ধ করে রেখে কেবল তর্জনী বা শাহাদত অঙ্গুলির দ্বারা কেবলার দিকে ইঙ্গিত দিতেন এবং এর দিকে চোখ দিয়ে তাকিয়ে থাকতেন।[৩৮৬] তিনি যখন আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করতেন, তখন বৃদ্ধাঙ্গুলিকে মধ্যমার উপর রাখতেন[৩৮৭] এবং কখনও তাকে গোলাকার কুন্ডলীর মত করতেন।[৩৮৮]

---

৩৭৯. আহমদ, ইবনু আবী শায়বাহ, আত-তায়ালিসী। আবু ওবায়দাহসহ অন্যরা বলেছেন, কুকুরের মত বসার অর্থ হল, মাটিতে দুই পাছা বিছিয়ে হাঁটু দাঁড় করিয়ে দুই হাত মাটিতে রাখা। দুই সাজদার মাঝে উল্লিখিত বসা বর্তমান বসা থেকে ভিন্ন।

৩৮০, ৩৮১. মুসলিম, আবু আওয়ানা, ইত্যাদি।

৩৮২. আবু দাউদ, নাসাঈ- সনদ সহীহ। এ কথার অর্থ হল, তিনি নিজ কনুই দুই পাঁজর থেকে দূরে রাখতেন না।

৩৮৩. বায়হাকী, হাকেম একে সহীহ বলেছেন এবং আল্লামা যাহাবী একে সমর্থন করেছেন।

৩৮৪. আহমদ, আবু দাউদ- সনদ ভাল।

৩৮৫. আবদুর রাযযাক। আবদুল হক একে সহীহ বলেছেন।

৩৮৬. মুসলিম, আবু আওয়ানাহ, ইবনু খোযায়মাহ্।

৩৮৭. মুসলিম, আওয়ানাহ।

৩৮৮. আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনু খোযায়মাহ, ইবনু হিব্বান।

তিনি যখন আঙ্গুল (তর্জনী) উঠাতেন, তখন তা নাড়তে থাকতেন ও দোআ করতেন।[৩৮৯] তিনি আরও বলেন, এই আঙ্গুল অর্থাৎ তর্জনী শয়তানের জন্য লোহার চেয়েও কঠিন।[৩৯০]

রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবীগণ দোআয় ইশারা করার সময় এক আঙ্গুল দিয়ে অন্য আঙ্গুল ধরতেন।[৩৯১]

রসূলুল্লাহ (সঃ) দুই তাশাহ্হুদেই অনুরূপ করতেন।[৩৯২]

রসূলুল্লাহ (সঃ) এক ব্যক্তিকে দুই আঙ্গুল দিয়ে দোআ করতে দেখে নিজ তর্জনী দিয়ে ইশারা করে বলেন, এভাবে এক প্রকাশ কর, এক প্রকাশ কর।[৩৯৩]

প্রথম তাশাহ্হুদ ওয়াজিব ও তাতে দোআ পড়া

রসূলুল্লাহ (সঃ) প্রতি দুই রাকআত শেষে আত্তাহিয়্যাহ্ পড়তেন।[৩৯৪] তিনি বসে প্রথম যা পড়তেন তা হচ্ছে, আত্তাহিয়্যাতু।[৩৯৫]

তিনি প্রথম দুই রাকআতের পর তা পড়তে ভুলে গেলে সহু সাজদাহ (ভুলের সাজদাহ) করতেন।[৩৯৬]

---

৩৮৯. ইমাম তাহাবী বলেন, 'দোআ করেন' এ কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, এটা তিনি নামাযের শেষে করতেন। কিন্তু আমি বলবো, আঙ্গুল নাড়া ও ইশারা অব্যাহত রাখা সুন্নত। কেননা, দোআ হচ্ছে, এর আগে। এটা ইমাম মালেকসহ অন্যদের মত। ইমাম আহমদকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, নামাযী কি আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত করবে ? তিনি বলেন, অবশ্যই। (মাসায়েল আনিল ইমাম আহমদ– ইবনু হানী)

আমি বলি, এর দ্বারা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তাশাহ্হুদে আঙ্গুল নাড়ানো, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছ থেকে প্রমাণিত সুন্নত। ইমাম আহমদসহ হাদীসের অন্যান্য ইমামরা তা আমল করেছেন। যারা এটাকে বেহুদা কাজ মনে করে, তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে। তারা বেহুদা মনে করে আঙ্গুল নাড়ে না। অথচ তারা জানে না যে, এটা প্রমাণিত এবং তারা এর বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা দেয়, যা আরবী ভাষার নিয়ম বিরোধী এবং ইমামদের বুঝ-জ্ঞানের পরিপন্থী। যারা এই জিনিসকে ঠাট্টা করে, তারা মূলত সুন্নতকেই ঠাট্টা করে এবং যা শেষ পর্যায়ে রসূলুল্লাহকে ঠাট্টা করার নামান্তর। কেননা, তিনিই তো এই সুন্নতটি চালু করেছেন। তিনি আঙ্গুল নাড়াতেন না মর্মে বর্ণিত, হাদীসের সনদ ভিত্তিহীন।

৩৯০. আহমদ, বায্যার, বায়হাকী।

৩৯১. ইবনু আবী শায়বা– সনদ উত্তম।

৩৯২. নাসাঈ, বায়হাকী– সনদ সহীহ।

৩৯৩. ইবনু আবী শায়বা, নাসাঈ, হাকেম।

৩৯৪. মুসলিম, আবু আওয়ানাহ।

৩৯৫. বায়হাকী আয়েশা (রাঃ) থেকে উত্তম সনদ সহকারে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৯৬. বোখারী, মুসলিম।

তিনি আত্তাহিয়্যাতু পড়ার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, তোমরা যখন প্রতি দ্বিতীয় রাকআতে বসবে, তখন আত্তাহিয়্যাতু... বলবে এবং আকর্ষণীয় দোআ নির্ধারণ করে আল্লাহর কাছে সেই দোআ করবে।[৩৯৭] অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, 'প্রত্যেক বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়বে।'[৩৯৮] তিনি ভুল নামায আদায়কারীকে অনুরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

রসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবায়ে কেরামকে কোরআনের সূরার মত তাশাহ্‌হুদ শিক্ষা দিয়েছেন।[৩৯৯] তবে তা চুপে চুপে পড়া সুন্নত।[৪০০]

তাশাহ্‌হুদের শব্দাবলী ঃ

রসূলুল্লাহ (সঃ) কয়েক প্রকারের তাশাহ্‌হুদ শিক্ষা দিয়েছেন।

১. ইবনে মাসঊদের তাশাহ্‌হুদ ঃ

ইবন মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে তাশাহ্‌হুদ শিক্ষা দিয়েছেন যেমন করে তিনি আমাকে কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন। সেটি হচ্ছে ঃ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ- اَشْهَدُ اَنْ لَّاۤاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.

অর্থ ঃ 'আল্লাহর জন্য সালাম, শান্তি, স্থায়িত্ব, তিনি দোআয় ব্যবহৃত সকল সম্মানজনক সম্বোধনের উপযুক্ত এবং সকল পবিত্রতা তাঁরই জন্য। হে নবী! আপনার উপর শান্তি এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত নাযিল হোক। আমাদের উপর এবং সকল নেক লোকের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। (একথা বললে আসমান ও জমীনের সকল নেক লোকের কাছে পৌঁছে।)

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মোহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।"

---

৩৯৭. নাসাঈ, আহমদ, আল কাবীর– তাবারানী– সনদ সহীহ।

৩৯৮. নাসাঈ– সনদ সহীহ।

৩৯৯. বোখারী, মুসলিম।

৪০০. আবু দাউদ, হাকেম এটাকে সহীহ বলেছেন এবং আল্লামা যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।

(তিনি তখন আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। তাঁর ইন্তেকালের পর আমরা বলতামঃ اَلسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ

অর্থ ঃ নবীর উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরাম। اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ এর পরিবর্তে اَلسَّلَامُ عَلَى النَّبِيْ বলতেন। (হে নবী, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক-এর পরিবর্তে বলতেন, নবীর উপর শান্তি বর্ষিত হোক)[৪০১]

২. ইবনে আব্বাসের তাশাহ্‌হুদ ঃ

ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে তাশাহ্‌হুদ শিক্ষা দিয়েছেন, যেমন করে তিনি আমাদেরকে কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি শিখিয়েছেন ঃ

اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ۔

অন্য বর্ণনায় রসূলুল্লাহর স্থলে এসেছে[৪০২] . عبده ورسوله

৩. ইবনে উমরের তাশাহ্‌হুদ ঃ

ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) তাশাহুদে বলতেন ঃ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ۔ [৪০৩]

৪০১. আয়েশা (রাঃ)-ও এভাবে তাশাহ্‌হুদ শিক্ষা দিয়েছেন। মোসনাদে সেরাজ, আল-ফাওয়ায়েদ-মোখাল্লাস, উভয় সনদ সহীহ।

৪০২. মুসলিম, আবূ আওয়ানা, শাফেঈ, নাসাঈ।

৪০৩. আবু দাউদ, দারু কুতনী।

৪. আবূ মূসা আশআরীর তাশাহ্‌হুদ ঃ

আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ বৈঠকে বসলে সে যেন প্রথমে বলে ঃ

اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ـ [৪০৪]

৭টি শব্দ নামাযের তাহিয়্যাহ

৫. উমার বিন খাত্তাবের তাশাহ্‌হুদ ঃ

উমার (রাঃ) মিম্বার থেকে লোকদেরকে তাশাহ্‌হুদ শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তোমরা বল ঃ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ الزَّاكِيَاتُ لِلّٰهِ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ . . . . .

অবশিষ্টাংশ আবদুল্লাহ বিন মাসউদের তাশাহ্‌হুদের অনুরূপ।[৪০৫]

রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর দুরূদ পাঠ, দুরূদের স্থান ও শব্দাবলী

রসুলুল্লাহ (সঃ) প্রথম তাশাহ্‌হুদে নিজের উপর এবং অন্যদের উপর দুরূদ পড়েছেন।[৪০৬] তিনি নিজ উম্মতকেও তাঁর উপর দুরূদ পড়তে বলে গেছেন। তিনি তাঁর উপর সালাম শেষে দুরূদ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন।[৪০৭] তিনি তাঁদেরকে দুরূদের বিভিন্ন শব্দাবলী শিক্ষা দিয়েছেন। সেগুলো হচ্ছে ঃ

---

৪০৪. মুসলিম, আবু আওয়ানাহ, আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ।

৪০৫. মালেক, বায়হাকী, সনদ সহীহ। এটি সাহাবী থেকে বর্ণিত হলেও রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসের মর্যাদা সম্পন্ন। কেননা, তিনি নিজের থেকে একথা বলেননি।

৪০৬. আবু আওয়ানা, নাসাঈ।

৪০৭. সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনার উপর সালাম পাঠের পদ্ধতি শিখেছি, কিন্তু দুরূদ কিভাবে পাঠ করবো? তখন তিনি তাঁদেরকে দুরূদ শিক্ষা দেন। এই হাদীসসহ অন্যান্য হাদীস দ্বারা প্রথম তাশাহ্‌হুদেও দুরূদ পড়া প্রমাণিত হয়। কেননা, তাতে বিশেষ কোন তাশাহ্‌হুদকে নির্দিষ্ট করা হয়নি। এটা ইমাম শাফেঈসহ হাম্বলী মাযহাবের কিছু আলেমের মত। যারা প্রথম তাশাহ্‌হুদের পর দুরূদ পড়া মাকরূহ বলেন, তাদের সপক্ষে হাদীসের কোন দলীল– প্রমাণ নেই। বরং তারা হাদীসের বিরোধী কথাই বলেন।

১

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ وَعَلٰى اَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ بَيْتِهٖ وَعَلٰى اَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! মুহাম্মদ (সঃ), তাঁর পরিবার, স্ত্রী ও সন্তান-সন্তুতির উপর দুরূদ পাঠাও যেমন করে তুমি ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধরের উপর দুরূদ পাঠিয়েছ।[৪০৮] তুমি নিঃসন্দেহে প্রশংসিত ও সম্মানিত। মুহাম্মদ (সঃ), তাঁর পরিবার, স্ত্রী ও সন্তানদের উপর বরকত নাযিল কর, যেমন করে তুমি ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশের উপর বরকত নাযিল করেছ।[৪০৯] নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত।'

রসূলুল্লাহ (সঃ) এই দুরূদ পড়ে নিজের জন্যে দোআ করতেন।[৪১০]

২

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى[৪১১] اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ [৪১২]

---

৪০৮. আবুল আলিয়া সালাত (দূরূদ) অর্থ প্রসঙ্গে বলেছেন, নবীর উপর আল্লাহর দুরূদ পড়ার অর্থ হল প্রশংসা ও সম্মান করা। নবীর উপর ফেরেশতাসহ অন্যদের দুরূদ পড়ার অর্থ হল, সম্মান ও প্রশংসা বাড়িয়ে দেয়ার দোআ করা। (আল-ফাতহ-হাফেয) তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দুরূদের প্রসিদ্ধ অর্থ রহমতকে অস্বীকার করে উপরোক্ত অর্থ গ্রহণ করেছেন। ইবনুল কাইয়েম বিষয়টি 'জালাউল ইফহাম' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

৪০৯. বরকত অর্থ বৃদ্ধি ও প্রাচুর্য। বরকতের দোআর অর্থ হল, ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধরকে যত কল্যাণ দেয়া হয়েছে, মুহাম্মদ (সঃ)-কেও যেন সে রকম বহুগুণ কল্যাণ দান করা হয়।

৪১০. আহমদ, তাহাবী-সনদ সহীহ।

৪১১. বোখারী, তাহাবী, বায়হাকী, আহমদ, নাসাঈ। ইবনুল কাইয়েম ইবনে তাইমিয়ার অনুসরণে 'ইবরাহীম ওয়াআলা আলে ইবরাহীম' এক সাথে বর্ণিত নেই বলে যে দাবী করেছেন তা ঠিক নয়। বরং এটা ভুল। ৩ ও ৭ নং দুরূদেও তা আছে যা বিভিন্ন সনদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে।

৪১২. বোখারী, মুসলিম, হোমায়দী। ইবনু মান্দাহ এটাকে সহীহ হাদীস বলেছেন।

৩

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ [৪১৩]

৪

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فِى الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ [৪১৪]

৫

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ [৪১৫]

৬

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ [৪১৬]

৭

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ [৪১৭]

---

৪১৩. আহমদ, নাসাঈ, আবু ইয়ালী– সনদ সহীহ।

৪১৪. মুসলিম, আবু আওয়ানাহ্‌, ইবনু আবী শায়বা, আবু দাউদ। হাকেম এটাকে সহীহ বলেছেন।

৪১৫. বোখারী, নাসাঈ, তাহাবী, আহমদ।

৪১৬. বোখারী, মুসলিম।

৪১৭. তাহাবী, আল মো'জাম– আবু সাঈদ বিন আল আরাবী- সনদ সহীহ। আল জালা– ইবনুল কাইয়েম। মুহাম্মদ বিন ইসহাক এটাকে সহীহ বলেছেন। আমি বলি, এই দুরূদে 'ইবরাহীম' ও আলে ইবরাহীম' এক সাথে বর্ণিত আছে। অথচ ইবনুল কাইয়েম ইবনে তাইমিয়ার অনুসরণে তা অস্বীকার করেছেন।

পবিত্র কোরআন মজীদে 'আল্ ইমরান', 'আল লুত' এবং হাদীসে 'আলে আবি আওফা' একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কোন কোন দুরূদে ইবরাহীম (আঃ)-কে পরিবার থেকে আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, তাঁর পরিবারে প্রধানতঃ তাঁর উপরই সালাম ও দুরূদ পাঠানো হয়। তখন পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা তাঁর অধীন হিসেবে সালাম-দুরূদ লাভ করেন।

ওলামায়ে কেরামের মধ্যে প্রশ্ন জেগেছে, রসূলুল্লাহর উপর সালাম ও দুরূদকে ইবরাহীম কিংবা আলে ইবরাহীমের সাথে কেন তুলনা করা হয়েছে? সাধারণতঃ তুলনীয়ের চেয়ে তুল্য শ্রেষ্ঠ হয়। সেই নিয়মে মুহাম্মদ (সঃ) থেকে ইবরাহীম (আঃ)-কে শ্রেষ্ঠ বুঝানো হয়েছে। অথচ, এটা সর্বজনস্বীকৃত যে, মুহাম্মদ (সঃ) ইবরাহীম (আঃ) থেকে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং শ্রেষ্ঠ দুরূদ ও সালাম তাঁরই পাওয়ার কথা। এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের ১০টি জওয়াব আছে। আল জালা এবং আল্‌ফাতহ কিতাবে তা বিস্তারিত আছে। এর মধ্যে শেখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া এবং ইবনুল কাইয়েম যে জওয়াবটি পছন্দ করেছেন। তা হচ্ছে–

ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশে নবীরা রয়েছেন যা মোহাম্মদ (সঃ)-এর বংশে নেই। যখন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্য ইবরাহীমের বংশের অনুরূপ দুরূদ সালামের প্রার্থনা জানানো হয় তখন মোহাম্মদ (সঃ)-এর বংশধররা তাঁদের উপযোগী দোআ' লাভ করে। যদিও তারা নবীদের মর্যাদা লাভ করে না। কিন্তু নবীদের মর্যাদা পাবেন মুহাম্মাদ (সঃ)। তাই অন্যদের পক্ষে যে মর্যাদা লাভ করা সম্ভব নয় তিনি সে মর্যাদা পাবেন।

অন্য এক জওয়াবে বলা হয়েছে, মোহাম্মদ (সঃ) ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশের লোক। আলী বিন তালহা ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইবরাহীমের বংশের শ্রেষ্ঠ লোক। তিনি সূরা আল-ইমরানের ৩৩ নং আয়াতের তাফসীরে ঐ কথা বলেন। আয়াতটিতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ আদম, নূহ, আল-ইবরাহীম ও আল-ইমরানকে গোটা বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নির্বাচন করেছেন।' ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশের অন্যান্য নবীরা যদি 'আল-ইবরাহীম'-এর অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে, মোহাম্মদ (সঃ)-ও সেই বংশের অন্তর্ভুক্ত হবেন। এটাই স্বাভাবিক। ফলে 'আল ইবরাহীমের উপর প্রেরিত দোআয় তিনিও শরীক। আল্লাহ আমাদেরকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর এই পরিমাণ দুরূদ ও সালাম পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন যেই পরিমাণ গোটা 'আল-ইবরাহীমের উপর পাঠানো হয়েছে এবং মোহাম্মদ (সঃ) নিজেও সেই বংশের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তাঁর বংশধররা সেখান থেকে প্রাপ্ত অংশ পাওয়ার পর

অবশিষ্টাংশ পাবেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মূল কথা হল, আল ইবরাহীম সহ মোহাম্মদ (সঃ)-এর উপর পঠিত দুরূদ ও সালাম একা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর পঠিত দোআ দুরূদের চেয়ে ব্যাপক। ফলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইবরাহীম (আঃ) থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়ার বিষয়ে কোন জটিলতা থাকেনা।এই জাওয়াবের চাইতে আগের জওয়াবটি উত্তম।

২য় বিষয় ঃ পাঠকরা দেখছেন যে, দুরূদের বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা রসূলুল্লাহ (সঃ), তাঁর স্ত্রী ও বংশধরের উপর সালাম ও দুরূদ পাঠ করা উদ্দেশ্য। তাই শুধু 'আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ বললে দুরূদের ক্ষেত্রে সুন্নাহ পালন হয় না। বরং উপরে বর্ণিত যে কোন একটি পূর্ণ দুরূদ পড়া জরুরী। প্রথম তাশাহ্হুদ কিংবা দ্বিতীয় তাশাহ্হুদে এর কোন পার্থক্য হবে না। ইমাম শাফেঈ তার 'আল উম্ কিতাবে লিখেছেন, 'প্রথম ও দ্বিতীয় তাশাহ্হুদের শব্দের কোন পার্থক্য নেই। এখানে আমার কাছে তাশাহ্হুদের অর্থ হচ্ছে, তাশাহ্হুদ এবং নবীর উপর দুরূদ পাঠ। একটা পড়লে অন্যটা অনাদায় থাকবে। উভয়টিই পড়তে হবে।'

এই যুগের আশ্চর্য বিষয় এবং বিশৃঙ্খল বিদ্যার উদাহরণ হল, মোহাম্মদ এসতাফ নাশাশিবী তার 'আল ইসলাম আস সাহীহ' বইতে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পরিবার-পরিজনের উপর দুরূদ পড়াকে অস্বীকার করেছেন। অথচ বোখারী ও মুসলিম শরীফসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে একদল সাহাবা থেকে তা বর্ণিত আছে। তাদের মধ্যে কা'ব বিন ওজরাহ, আবু হোমাইদ আস-সায়েদী, আবু সাঈদ আল-খুদ্‌রী, আবু মাসউদ আল-আনসারী, আবু হোরায়রা, তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, আমরা আপনার উপর কিভাবে দুরূদ ও সালাম পড়বো ? তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদেরকে উপরোক্ত দুরূদগুলো শিক্ষা দেন। নাশাশিবীর যুক্তি হল, আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতে শুধু রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর দুরূদ ও সালাম পাঠ করতে বলেছেন, তাঁর বংশধরের উপর নয়। আয়াতটি হচ্ছে ঃ

صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ـ

অর্থ ঃ "তোমরা তাঁর (নবীর) উপর দুরূদ ও সালাম পাঠ কর।" তারপর নাশাশিবী আরো বাড়াবাড়ি করে প্রশ্ন করেছেন, সাহাবারা রসূলুল্লাহকে ঐ প্রশ্ন করেননি। কেননা তাদের কাছে দুরূদের অর্থ যে দোআ' তা পরিস্কার। কিভাবে তাঁরা ঐ প্রশ্ন করে থাকবেন ? এটা নাশাশিবীর প্রকাশ্য ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা, তাঁরা তাঁকে দুরূদের (সালাতের) অর্থ জিজ্ঞেস করেননি বরং দুরূদের পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আগে উল্লেখিত বর্ণনাগুলো তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। ফলে, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। পদ্ধতিগত বৈধতা

জানার জন্য শরীয়তের বাহককে জিজ্ঞেস করাই স্বাভাবিক। যেমনভাবে 'তোমরা নামায কায়েম কর।' এই আয়াতের মর্মানুযায়ী নামাযের পদ্ধতি সম্পর্কে জানার জন্য প্রশ্ন করা স্বাভাবিক। কেননা, তাদের কাছে সালাতের মূল অর্থ জানা থাকা সত্বেও সালাত কায়েমের নির্দেশ নাজিলের পর এর পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশ্ন না করে উপায় ছিল না।

নাশিশিবীর উপরোল্লিখিত যুক্তির কোন মূল্য নেই। কেননা, মুসলমানরা জানে, নবী (সঃ) আল্লাহর বাণীর ব্যাখ্যাদাতা। আল্লাহ্ কোরআনে বলেছেন ঃ "আমি আপনার কাছে কোরআন নাজিল করেছি, আপনি লোকদের কাছে অবতীর্ণ বিষয়সমূহের ব্যাখ্যা করবেন।" (সূরা নাহল-৪৪) সুতরাং রসূলুল্লাহ (সঃ) নামাযের পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে দুরূদের মধ্যে আল-মোহাম্মদ' শিক্ষা দিয়েছেন। ফলে এটা গ্রহণ করা ওয়াজিব। কেননা, আল্লাহ্ বলেছেন ঃ "রসূল তোমাদের কাছে যা নিয়ে আসে তা গ্রহণ কর" (সূরা হাশর-৭) হাদীসে মশহুরে আছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আমাকে কোরআন এবং এর সমতুল্য আরেকটি জিনিসও দেয়া হয়েছে। (মেশকাত)

আমি জানিনা, নাশিশিবী সহ তার কথায় বিভ্রান্ত লোকেরা নামাযে তাশাহুদকে অস্বীকারকারী কিংবা ঋতুবর্তী মহিলার নামায-রোযা প্রয়োজন নেই এই কথা অস্বীকারকারীর কি জবাব দেবেন ? কেননা, অস্বীকারকারীর যুক্তি হল, কোরআনে তাশাহ্হুদের কথা উল্লেখ নেই, শুধু কেয়াম, রুকু ও সাজদার উল্লেখ আছে। আল্লাহ্ কোরআনে ঋতুবতী রমনীর নামাজ-রোযা বাদ দেয়ার কথা উল্লেখ করেননি। তাই ঋতুবতী মহিলার উচিত, নামায-রোযা করা। তারা কি উপরোক্ত অস্বীকারকারীর সাথে একমত হবেন, নাকি দ্বিমত পোষণ করবেন ? তারা যদি ১ম মত পোষণ করেন তাহলে তারা গোমরাহ্ ও মুসলমানের দল থেকে বেরিয়ে যাবেন। আর যদি ২য় মত পোষণ করেন তাহলে, তারা সত্যের উপর আছেন। তারা অস্বীকারকারীকে যে জওয়াব দেবেন, নাশিশিবীর জন্য আমাদেরও একই জওয়াব। আমরা এর কারণ, বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। হে মুসলমানগণ! হাদীসকে বাদ দিয়ে কোরআন বুঝার চেষ্টা ত্যাগ করুন। আপনাদের পক্ষে তা সম্ভব নয়। এমনকি আপনি আরবী ভাষায় যুগের সিবওয়াই হলেও তা সম্ভব নয়। আপনাদের সামনে এই উদাহরণটি যথেষ্ট। কেননা, নাশাশিবী বর্তমান শতাব্দীর বড় আলেমদের অন্যতম। তিনি আরবী ভাষায় পাণ্ডিত্যের কারণে গোমরাহ হয়ে গেছেন। তিনি কোরআন বুঝার জন্য হাদীসের সাহায্য নেননি। বরং তিনি হাদীসকে অস্বীকার করেছেন।

৩য় বিষয় ঃ পাঠকরা লক্ষ্য করে থাকবেন, উপরোল্লিখিত দুরূদের মধ্যে 'সাইয়েদ' শব্দের উল্লেখ নেই। সেজন্য পরবর্তী যুগের আলেমরা দুরূদে ইবরাহীমির মধ্যে এই শব্দের সংযোজনের ব্যাপারে মতভেদ পোষণ করেছেন। যারা এই শব্দ যোগ করাকে নাজায়েয বলেছেন, তাদের যুক্তি হল, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আদেশের পূর্ণ অনুসরণের স্বার্থেই ঐ শব্দটি যোগ করা যাবেনা। কেননা, তাঁকে যখন দুরূদ পাঠের পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় তখন তিনি ঐ শব্দটি ব্যতীত দুরূদ পড়ার নির্দেশ দেন।

কাদী আয়ায তাঁর 'আশ-শিফা' কিতাবে সাহাবা ও তাবেঈন থেকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর দরুদ পাঠের কয়েকটা বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তাতে সাইয়েদ শব্দের উল্লেখ নেই।

আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাদেরকে নিম্নোক্ত দুরূদ পড়া শিক্ষা দিয়েছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ دَاحِيَ الْمَدْحُوَّاتِ وَبَارِيَ الْمَسْمُوْكَاتِ اجْعَلْ سَوَابِقَ صَلَوَاتِكَ وَنَوَامِيَ بَرَكَاتِكَ وَزَائِدَ تَحِيَّتِكَ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ الْفَاتِحِ لِمَا اَغْلَقَ ـ

আলী (রাঃ) থেকে আরেকটি হাদীস বর্ণিত, আছে। তিনি পড়তেন ঃ

صَلَوَاتُ اللّٰهِ الْبِرِّ الرَّحِيْمِ وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَالنَّبِيِّيْنَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ الصّٰلِحِيْنَ وَمَا سَبَّحَ لَكَ مِنْ شَيْءٍ يَّارَبَّ الْعَالَمِيْنَ عَلٰى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَاِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ ـ......

(হাদীসের শেষ পর্যন্ত)

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি পড়তেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ اِمَامِ الْخَيْرِ وَرَسُوْلِ الرَّحْمَةِ ....

(হাদীসের শেষ পর্যন্ত)

হাসান বসরী থেকে বর্ণিত ঃ তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি রসলুল্লাহ (সঃ)-এর হাউজে কাওসার থেকে পানি পান করতে চায় সে যেন বলে ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَاَوْلَادِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ وَاَصْهَارِهٖ وَاَنْصَارِهٖ وَاَشْيَاعِهٖ وَمُحِبِّيْهِ ـ

তবে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ থেকে ইবনে মাজায় সাইয়েদ শব্দের উল্লেখসহ একটি দুরূদ বর্ণিত হয়েছে এর সনদ দুর্বল। দুরূদটি হচ্ছে ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فَضَائِلَ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ـ

উপরোক্ত আলোচনায় পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, কোন দুরূদে সাইয়েদ শব্দের উল্লেখ নেই। যেমন,

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ অথবা عَلٰى سَيِّدِ الْخَلْقِ অথবা

وعلى سيد ولد ادم

ইত্যাদি নেই। যদি 'সাইয়েদ' শব্দের উল্লেখ মোস্তাহাব বা পছন্দনীয় হত তাহলে, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈ ও ইমামদের কাছে তা গোপন থাকত না। সঠিক অনুসরণের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। অথচ সাহাবা ও তাবেঈ কিংবা অন্য কারোর কাছ থেকে ঐ জাতীয় কোন হাদীস বা বর্ণনা পাওয়া যায় না। যদিও দুরূদের ব্যাপারে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে।

কিন্তু শাফেঈ' মাযহাবের পরবর্তী আলেমদের মধ্যে দুরূদে সাইয়েদ শব্দের সংযোজন দেখতে পাওয়া যায়। অথচ, শাফেঈ' মাযহাবের বড় আলেম ইবনে হাজার আসকালানী তাকে নাজায়েয বলেছেন। হানাফী মাযহাবের মতও তাই। আর এটাকেই আঁকড়ে ধরা দরকার। কেননা, এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রতি সত্যিকার ভালবাসা। আল্লাহ বলেছেন ঃ 'হে নবী! আপনি বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তাহলে, আমাকে অনুসরণ কর, ফলে, আল্লাহও তোমাদেরকে ভালবাসবেন। (আল-এমরান-৩১)

তাই ইমাম নওয়ী বলেছেন, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর উপর সর্বাধিক পরিপূর্ণ দুরূদ উপরে বর্ণিত ৩নং দুরূদ। তাতে 'সাইয়্যেদ' শব্দের উল্লেখ নেই।

(আর্‌রাওদাহ– ১ম খণ্ড, ২৬৫ পৃঃ)

৪র্থ বিষয় ঃ উপরে বর্ণিত ১ম ও ৪র্থ দুরূদ রসূলুল্লাহ (সঃ) শিক্ষা দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম যখন প্রশ্ন করেন, আমরা কিভাবে আপনার উপর দুরূদ পাঠ করবো। তখন তিনি তাদেরকে ঐ দুরূদ শিক্ষা দেন। এই কারণে এই দু'টো দুরূদকে সর্বোত্তম দুরূদ বলা হয়। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের জন্য এবং নিজের জন্য সর্বোত্তম দুরূদটিই নির্বাচন করবেন। তাই ইমাম নওয়ী তাঁর 'আর-রাওদাহ' কিতাবে বলেছেন। কেউ যদি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর উপর সর্বোত্তম দুরূদ পড়ার কসম করে তাহলে, উপরোক্ত ২টি দুরূদের যে কোন একটা না পড়লে তার কসম পুরো হবে না। আল্লামা আস্‌সাবকী বলেছেন, যে উপরোল্লিখিত দুরূদ পাঠ করে, সে নিশ্চিতভাবেই রসূলূল্লাহ (সঃ)-এর উপর দুরূদ পাঠ করেছে। আর যারা অন্য দুরূদ পাঠ করে তাদের দুরূদ আদায়ের ব্যপারে সন্দেহ আছে। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম যখন জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কিভাবে দুরূদ পাঠ করবো, তখন তিনি তাদেরকে এই পদ্ধতি শিক্ষা দেন এবং বলেন, এভাবে .... পাঠ করবে। তিনি তাঁর উপর কিভাবে দুরূদ পাঠ করতে হবে তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

আল্লামা আল-হায়সামী 'আদদোর্‌রুল মানদুদ' কিতাবের ২য় খণ্ডের ২৫ পৃষ্ঠায় এবং ১ম খণ্ডের ২৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে উপরে বর্ণিত, যে কোন দুরূদ পাঠ করলে তা আদায় হয়ে যাবে।

৫ম বিষয় ঃ উপরে বর্ণিত, দুরূদগুলোর মধ্যে যে কোন একটাকে নির্দিষ্ট করে নেয়া বৈধ নয়। অনুরূপভাবে তাশাহ্‌হুদের ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। বরং তা হচ্ছে, বিদ্‌আহ। সুন্নাহ হচ্ছে, এটা একবার এবং অন্যাটা আরেকবার পড়া। শেখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া দুই ঈদের তাকবীর অধ্যায়ে অনুরূপ রায় দিয়েছেন। (মাজমুউল ফাতাওয়া-১ খণ্ড ২৫৩ পৃঃ)

৬ষ্ঠ বিষয় ঃ আল্লামা সিদ্দিক হাসান খান তাঁর নুযুলুল আবরার বিল এলমিল মাসুর মিনাল আদইয়া ওয়াল আজকার' বইয়ের ১১৬ পৃষ্ঠায় রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর দুরূদ পড়ার ফযীলত এবং অধিক দুরূদ পড়া সংক্রান্ত অনেক হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন ঃ মোহাদ্দেস এবং হাদীসের বর্ণনাকারীরাই রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর সর্বাধিক দুরূদ পাঠ করেন। তাঁরা প্রত্যেক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর উপর দুরূদ পাঠ করেন। তাদের জিহবা সর্বদা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর স্মরণে ভিজা থাকে। প্রত্যেক হাদীসের কিতাবে হাজার হাজার হাদীস উল্লেখিত আছে। সবচেয়ে ছোট হাদীসের কিতাব হচ্ছে, আল্লামা সুয়ূতীর 'আল-জামে' আস সাগীর'। তাতে ১০ হাজার হাদীস আছে। এর উপর অন্যান্য হাদীসের কিতাবের অনুমান করা যায়। কেয়ামতের দিন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে হাদীসের সেবাকারী এই মুক্তিপ্রাপ্ত দলটি সুপারিশ

লাভ করে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান হবে। কোন লোক তাদের সমান ফযীলত লাভ করতে পারেন না। তবে তাদের চেয়ে উত্তম কাজের লোকেরাই শুধু তা লাভ করতে পারে। হে কল্যাণকামী ও মুক্তি অন্বেষণকারী! তুমি মোহাদ্দেসীনদের কাছে হাস্যকর হয়ো না। তা না হয় তোমার .... । এতে তোমার কল্যাণ নেই।

আমি আল্লাহর কাছে দোআ করি তিনি যেন আমাকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে উত্তম মোহাদ্দেসদের অন্তর্ভূক্ত করেন। এই কিতাবটি এই বিষয়ের সুন্দর পথপ্রদর্শক।

তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতের কেয়াম

রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকবীর বলে তৃতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়াতেন।[৪১৮] তিনি ভুল নামায আদায়কারীকেও অনুরূপ করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, 'প্রত্যেক রুকু ও সাজদায় এরূপ কর।'

তিনি বসা থেকে দাঁড়ানোর সময় তাকবীর বলতেন এবং দাঁড়াতেন।[৪১৯] তিনি এই তাকবীরের সাথে কখনও কখনও হাত তুলতেন।[৪২০]

তিনি চতুর্থ রাকআতের উদ্দেশ্যে দাঁড়ানোর সময়ও আল্লাহু আকবার বলতেন[৪২১] এবং ভুল নামায আদায়কারীকেও এরূপ করার আদেশ দিয়েছেন।

তিনি এ তাকবীরের সময়ও কখনও কখনও হাত তুলতেন।[৪২২] তারপর তিনি বাম পায়ের উপর এমনভাবে সোজা হয়ে বসতেন যে, প্রত্যেকটি হাড় তার স্ব স্ব স্থানে বহাল হতো। তারপর তিনি দাঁড়াতেন। তিনি দুই হাতের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতেন।[৪২৩]

রসূলুল্লাহ (সঃ) তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতে সূরা ফাতেহা পড়তেন এবং ভুল নামায আদায়কারীকেও অনুরূপ করার আদেশ দিয়েছেন। কখনও তিনি যোহরের নামাযে সূরা ফাতেহার সাথে কিছু আয়াত মিলিয়ে পড়তেন। যোহরের নামাযের কেরাআত অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

---

৪১৮. বোখারী, মুসলিম।

৪১৯. মোসনাদে আবু ইয়ালী–সনদ ভাল।

৪২০. বোখারী, আবু দাউদ।

৪২১. ঐ।

৪২২. আবু আওয়ানাহ, নাসাঈ– সনদ সহীহ।

৪২৩. গরীবুল হাদীস-আল-আরবী। এই অর্থবোধক হাদীস বর্ণিত হয়েছে বোখারী ও আবু দাউদ। 'হাতের উপর ভর দেয়া নিষিদ্ধ' মর্মে বর্ণিত হাদীসটি প্রত্যাখ্যাত।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে দীর্ঘ দোআ কুনূতে নাজেলা

রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন কারোর উপর বদ দোআ কিংবা কারোর জন্য দোআ করার ইচ্ছা করতেন, তখন শেষ রাকআতে রুকু থেকে মাথা উঠাবার এবং সামি-আল্লাহু লিমান হামিদাহ ও আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ বলার পর তা করতেন।[৪২৪] তিনি আওয়াজ করে দোআ করতেন,[৪২৫] দু'হাত তুলতেন[৪২৬] এবং পেছনের লোকেরা আমীন বলতেন।[৪২৭]

তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযেই দোআ কুনূত পড়েছেন।[৪২৮] তিনি কারো জন্য নেক দোআ কিংবা বদ দোআ করার উদ্দেশ্যেই নামাযে দোআ কুনূত বা দোআ করেছেন।[৪২৯] তিনি কখনও কখনও বলেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ وَسَلَمَةَ بْنَ هَاشِمٍ وَعَيَّاشَ بْنَ اَبِىْ رَبِيْعَةَ
اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطَأَتَكَ عَلٰى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا سِنِيْنَ كَسِنِىْ يُوْسُفَ
اَللّٰهُمَّ الْعِنْ لِحْيَانَ وَرَعْلاً وَذَكْوَانَ وَعَصِيَّةَ عَصَتِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ -

অর্থঃ হে আল্লাহ! ওয়ালিদ, সালামাহ বিন হাশেম এবং আইয়াশ বিন আবী রাবীআ'হকে রক্ষা কর। হে আল্লাহ! তুমি মোযার সম্প্রদায়কে শক্ত করে পাকড়াও কর এবং তাদের উপর ইউসুফ (আঃ)-এর কাওমের মত বছরের পর বছর দুর্ভিক্ষ দাও। হে আল্লাহ! লেহইয়ান,রা'ল, যাকওয়ান এবং আ'সিয়্যা

---

৪২৪. বোখারী আবু দাউদ।

৪২৫. ঐ।

৪২৬. আহমদ, তাবারানী– সনদ সহীহ। এটা ইমাম আহমদ ও ইসহাকের মাযহাব। আল-মাসায়েল- আল-মুরুজী, পৃঃ ২৩। তবে দু'হাত দিয়ে মুখ মোছার সপক্ষে কোন বর্ণনা নেই। তাই এতে হাত দিয়ে মুখ মোছা বিদআত। নামাযের বাইরেও হাত দিয়ে মুখ মোছা ঠিক নয়। মুখ মোছার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসগুলো দুর্বল এবং কিছু আছে অত্যধিক দুর্বল। আমি আবু দাউদের দুর্বল হাদীস (২৬২) এবং সহীহ হাদীসে (৫৯৭) তা বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। ইযয বিন আবদুস সালাম এক ফতোয়ায় বলেছেন, অজ্ঞ লোকেরা ব্যতীত তা কেউ করে না।

৪২৭. আবু দাউদ, আস-সেরাজ। হাকেম এটিকে সহীহ বলেছেন এবং আল্লামা যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।

৪২৮. আবু দাউদ. আস-সেরাজ, দারু কুতনী-সনদ দু'টোই সহীহ।

৪২৯. ইবনু খোযায়মাহ, কিতাবুল কুনুত-আল খাতীব–সনদ সহীহ।

সম্প্রদায়ের উপর অভিশাপ নাযিল কর। তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করেছে।৪৩০

তিনি দোআ শেষ করে আল্লাহু আকবার বলে সাজদায় যেতেন।৪৩১

বিতরের নামাযে কুনূত

রসূলুল্লাহ (সঃ) কখনও কখনও বিতরের নামাযে দোআ কুনূত পড়তেন।৪৩২

তিনি রুকুর আগে কুনূত পড়তেন।৪৩৩ তিনি সর্বদা বিতরে কুনূত পড়েননি। (আবু দাউদ, নাসাঈ, আহমদ, বায়হাকী শায়বা, তাবরানী-সনদ সহীহ)

বিতরের নামাযে কেরাআত শেষ হলে নিম্নোক্ত কুনূত (দোআ') পড়ার জন্য তিনি হাসান বিন আলী (রাঃ)-কে শিক্ষা দিয়েছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِىْ شَرَّمَا قَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِىْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ وَاِنَّهُ لَايَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ لَا مَنْجَا مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ ـ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি যাদেরকে হেদায়াত করেছ আমাকে হেদায়াত দিয়ে তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কর। আমাকে সুস্থতা ও শান্তি দিয়ে ঐ জাতীয় সুস্থতা ও শান্তিপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে গণ্য কর। তুমি যাদের দায়িত্বভার গ্রহণ

---

৪৩০. বোখারী, আহমদ, মুসলিম।

৪৩১. নাসাঈ, আহমদ, আস-সেরাজ, মোসনাদে আবু ইয়ালী–সনদ ভাল।

৪৩২. ইবনু নসর, দার কুতনী– সনদ সহীহ।

আমরা বলেছি, রসূলুল্লাহ (সঃ) কখনও কখনও বিতরের নামাযে কুনুত পড়েছেন। যদি তিনি সর্বদা কুনুত পড়তেন, তাহলে সাহাবায়ে কেরাম তা দেখতেন এবং বর্ণনা করতেন। একমাত্র উবাই বিন কা'ব একা এক বর্ণনায় তা বলেছেন। সর্বদা করলে অন্যান্য সহাবায়ে কেরামও তা দেখে বর্ণনা করতেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি কখনও কখনও তা করেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, কুনুত ওয়াজিব নয়। অধিকাংশ ওলামার মত এটাই। তাই ইবনুল হাম্মাম তাঁর ফাতহুল কাদীরে লিখেছেন, যারা বলেন, এটা ওয়াজিব, তাদের একথা দুর্বল। তিনি নিজ মাযহাবের বিপরীত কথাকে নিরপেক্ষভাবে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

৪৩৩. ইবনু আবী শায়বা, আবু দাউদ, নাসাঈ– সুনানে কোবরা, আহমদ, তাবারানী, বায়হাকী, ইবনু আসাকির– সনদ সহীহ।

করেছ, আমাকে তাদের মধ্যে শুমার কর। তুমি যা দান করেছ তাতে আমাকে বরকত দাও। ভাগ্যের মন্দ লিখন থেকে আমাকে মুক্তি দাও। তুমিই ফয়সালাকারী, তোমার উপর কোন ফয়সালাকারী নেই। তুমি যাকে বন্ধু বানিয়েছ, সে কখনও লাঞ্ছিত হয় না এবং তুমি যার সাথে শত্রুতা কর সে সম্মান লাভ করতে পারে না। হে আমাদের রব! তুমি বরকতময় ও সুমহান, তুমি ছাড়া মুক্তির কোন স্থান নেই।[৪৩৪]

শেষ তাশাহ্‌হুদ

তাশাহ্‌হুদ ওয়াজিব। রসূলুল্লাহ (সঃ) চার রাকআতের পর শেষ তাশাহ্‌হুদের জন্য বসতেন। তিনি এতে প্রথম তাশাহ্‌হুদের অনুরূপ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং প্রথমটিতে যা করেছেন শেষটাতেও তা করেছেন। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, তিনি শেষ বৈঠকে পাছার উপর বসেছেন।[৪৩৫] তিনি মাটির উপর বাম নিতম্ব বা পাছা বিছিয়ে দুই পা একদিকে বের করতেন।[৪৩৬] এবং বাম পা ডান রান ও পায়ের নলার নীচে রেখে[৪৩৭] ডান পা দাঁড় করাতেন।[৪৩৮] কখনও ডান পা বিছিয়ে দিতেন।[৪৩৯] তিনি বাম হাতের তালু দিয়ে হাঁটু ধরতেন এবং এর মাধ্যমে শক্তি লাভ করতেন।[৪৪০]

প্রথম তাশাহ্‌হুদের মত শেষ তাশাহুদেও দুরূদ পড়া সুন্নাত। দুরূদের ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসে বিস্তারিত বাক্য ও শব্দাবলীর আলোচনা করা হয়েছে।

রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর দুরূদ পাঠ করা ওয়াজিব

রসূলুল্লাহ (সঃ) নামাযে এক ব্যক্তিকে আল্লাহর প্রশংসা এবং রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর দুরূদ না পড়ে দোআ করতে শুনে বলেন, তাড়াতাড়ি শেষ কর। তারপর তিনি তাকে ডাকেন এবং তাকে ও অন্যদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, তোমাদের কেউ নামায পড়লে সে যেঁন প্রথমে আল্লাহর হামদ ও সানা (প্রশংসা) আদায় করে, নবীর উপর দুরূদ পড়ে এবং পরে যা ইচ্ছা চেয়ে যেন

---

৪৩৪. ইবনু খোযায়মাহ, ইবনু আবী শায়বা।

৪৩৫. বোখারী। ফজরের নামাযের মত দুই রাকআত বিশিষ্ট নামাযে পা বিছিয়ে দিতেন। ইমাম আহমদের মত তাই।

৪৩৬. আবু দাউদ, বায়হাকী-সনদ সহীহ।

৪৩৭. মুসলিম, আবু আওয়ানাহ।

৪৩৮. বোখারী। ফজরের মত দুই রাকআত বিশিষ্ট নামাযে পা বিছিয়ে দেয়া সুন্নত।

৪৩৯. মুসলিম, আবু আওয়ানাহ।

৪৪০. ঐ।

দোআ করে।[৪৪১] তিনি এক ব্যক্তিকে নামাযে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব, প্রশংসা এবং নবীর উপর দূরূদ পড়তে শুনে বলেন, দোআ কর কবুল হবে এবং চাও দেয়া হবে।[৪৪২]

দোআ'র আগে ৪টি বিষয় থেকে আশ্রয় চাওয়া ওয়াজিব

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলতেন ঃ তোমাদের কেউ যখন শেষ তাশাহহুদ থেকে অবসর হবে, তখন সে যেন ৪টি বিষয় থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায় ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ مَسِيْحِ الدَّجَّالِ ـ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নামের আযাব, কবরের আযাব, জীবন ও মৃত্যুর পরীক্ষা এবং দাজ্জালের মন্দ ফেতনা থেকে। তারপর সে যেন নিজের জন্য যা ইচ্ছা দোয়া করে।[৪৪৩]

রসূলুল্লাহ (সঃ) নিজেও এ তাশাহ্‌হুদের মধ্যে দোআ করতেন।[৪৪৪]

তিনি সাহাবায়ে কেরামকে এই দোআটি এমনভাবে শিক্ষা দিয়েছেন যেমন করে তিনি তাদের কোরআন শিক্ষা দিতেন।[৪৪৫]

সালামের আগের বিভিন্ন প্রকার দোআ

রসূলুল্লাহ (সঃ) নামাযের মধ্যে বিভিন্ন রকম দোআ করতেন। একেক সময় একেক দোআ করতেন।[৪৪৬]

---

৪৪১. আহমদ, আবু দাউদ, ইবনু খোযায়মাহ। হাকেম এটিকে সহীহ বলেছেন এবং আল্লামা যাহাবী তা সমর্থন করেছেন। এ হাদীস প্রমাণ করে, দুরূদ পড়ার আদেশের কারণে এই তাশাহ্‌হুদে দুরূদ পড়া ওয়াজিব। ইমাম শাফেঈ ও আহমদের মতে দুরূদ ওয়াজিব। একদল সাহাবায়ে কেরামের মতেও তা ওয়াজিব। আল্লামা আজরী তাঁর শরীয়াহ গ্রন্থে লিখেছেন, যে শেষ তাশাহ্‌হুদের দুরূদ পড়েনি তার উপর নামায পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব।

৪৪২. নাসাঈ–সনদ সহীহ।

৪৪৩. মুসলিম, আবু আওয়ানাহ, নাসাঈ, মোন্তাকা-ইবনে জারূদ।

৪৪৪. আবু দাউদ, আহমদ। সনদ সহীহ।

৪৪৫. মুসলিম, আবু আওয়ানাহ।

৪৪৬. এখানে তাশাহ্‌হুদ না বলে নামায বলার কারণ হল, হাদীসের শব্দ হুবহু এরকম। এতে নামায শব্দের উল্লেখ থাকায় তা নামাযের দোআ'র উপযুক্ত প্রত্যেক স্থানকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। যেমন, সাজদাহ, তাশাহ্‌হুদ ইত্যাদি। আগেই এগুলোতে দোআর নির্দেশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে

তিনি মুসল্লীদেরকে এ সকল দোআর যে কোন একটা নির্বাচন করার আদেশ দিয়েছেন।৪৪৭ দোআগুলো হচ্ছে ঃ

১

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَاْثَمِ وَالْمَغْرَمِ -

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কবর আযাব, দাজ্জালের বিপদ, জীবন ও মৃত্যুর পরীক্ষা থেকে পানাহ চাই। হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে গুনাহ ও ঋণ ৪৪৮ থেকে আশ্রয় চাই।" ৪৪৯

২

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّمَا لَمْ اَعْمَلْ بَعْدُ -

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আমার অতীত আমলের অনিষ্ট থেকে পানাহ চাই এবং ভবিষ্যতে নেক আমল না করার মন্দ থেকেও পানাহ চাই।৪৫০

৩

اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَّسِيْرًا -

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! আমার হিসাব নিও সহজ করে।৪৫১

৪

اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ اَحْيِنِىْ مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِّىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِّىْ اَللّٰهُمَّ

৪৪৭. বোখারী, মুসলিম। আসরাম বলেছেন, আমি ইমাম আহমদকে জিজ্ঞেস করি, তাশাহ্‌হুদের পর কি দোআ' পড়বো ? তিনি উত্তর দেন, হাদীসে বর্ণিত দোআ'। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করি, রসূলুল্লাহ (সঃ) কি একথা বলেননি যে, যে কোন একটি দোআ নির্বাচন কর ? তিনি বলেন, হাদীসের একটি দোআ' নির্বাচন কর। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করি, হাদীসে কোন্ দোআ' আছে ? ইবনে তাইমিয়া তাঁর মজমুউল ফাতাওয়া গ্রন্থে এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, হাদীসের দোআ হচ্ছে উত্তম।

৪৪৮. আয়েশা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহকে প্রশ্ন করেন, আপনি কেন ঋণ থেকে এত বেশী পানাহ চান ? রসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বলেন, মানুষ ঋণগ্রস্ত হলে কথা বলার সময় মিথ্যা বলে এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে।

৪৪৯. বোখারী, মুসলিম।

৪৫০. নাসাঈ– সনদ সহীহ, কিতাবুস সুন্নাহ–ইবনু আবী আসেম।

৪৫১. আহমদ। হাকেম এটিকে সহীহ বলেছেন এবং আল্লামা যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।

وَاَسْاَلُكَ خَشْيَتَكَ فِى الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَاَسْاَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ وَالْعَدْلِ فِى الْغَضَبِ وَالرِّضٰى وَاَسْاَلُكَ الْقَصْدَ فِى الْفَقْرِ وَالْغِنٰى وَاَسْاَلُكَ نَعِيْمًا لَايَبِيْدُ وَاَسْاَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْفَدُ وَلَا تَنْقَطِعُ وَاَسْاَلُكَ الرِّضٰى بَعْدَ الْقَضَاءِ وَاَسْاَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَاَسْاَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ اِلٰى وَجْهِكَ وَاَسْاَلُكَ الشَّوْقَ اِلٰى لِقَائِكَ فِىْ غَيْرِ ضَرَّاءٍ مُّضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اَللّٰهُمَّ زَيِّنَّا بِزِيْنَةِ الْاِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُّهْتَدِيْنَ -

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তোমার গায়েব সম্পর্কিত জ্ঞান এবং সৃষ্টির উপর তোমার শক্তি দ্বারা আমাকে ততদিন জীবিত রেখো যতদিন আমার জন্য হায়াতকে তুমি উত্তম মনে কর এবং যখন আমার জন্য মৃত্যুকে উত্তম মনে করবে, তখন মৃত্যু দান করিও। হে আল্লাহ! আমি তোমার উপস্থিতি ও অনুপস্থিতিতে আল্লাহভীতি কামনা করি, রাগ ও সন্তুষ্টির মুহূর্তে আমি সত্য কথা বলা ও ইনসাফ করার তাওফীক প্রার্থনা করি। অভাব ও প্রাচুর্যের মধ্যে মিতব্যয়িতা চাই, তোমার কাছে ধ্বংসহীন নেয়ামত চাই, চোখের অবিচ্ছিন্ন শীতলতা কামনা করি, তাকদিরের পরে তোমার সন্তুষ্টি প্রার্থনা করি। মৃত্যুর পর জীবনের শীতলতা চাই, তোমার চেহারার প্রতি দৃষ্টি লাভের আনন্দ প্রার্থনা করি, তোমার সাক্ষাতের জন্য আগ্রহ কামনা করি, কোন ক্ষতিকর বিষয় এবং পথভ্রষ্টকারী ফেতনা ছাড়া। হে আল্লাহ! আমাদেরকে ঈমানের রং-এ রঙ্গীন কর এবং আমাদেরকে হেদায়াতকারী ও হেদায়াতপ্রাপ্ত বানিয়ে দাও।৪৫২

৫. রসূলুল্লাহ (সঃ) নামাযে পড়ার জন্য আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে নিম্নের দোআ শিক্ষা দিয়েছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ -

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আমার নফসের উপর বিরাট যুলুম করেছি, তুমি ছাড়া আর কেউ তা মাফ করতে পারবে না। তুমি আমাকে তোমার কাছ থেকে

---

৪৫২. নাসাঈ, হাকেম এটিকে সহীহ বলেছেন এবং আল্লামা যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।

ক্ষমা দান কর এবং আমাকে রহম কর। নিশ্চয়ই তুমি অত্যধিক ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।৪৫৩

৬. রসূলুল্লাহ (সঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে নিম্নের দোআ শিক্ষা দেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْاَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهٖ عَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَالَمْ اَعْلَمْ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهٖ عَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَالَمْ اَعْلَمْ وَاَسْاَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ وَمَاقَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْعَمَلٍ وَاَسْاَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ مَا سَاَلَكَ عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ مُحَمَّدٌ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّمَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ مُحَمَّدٌ وَاَسْاَلُكَ مَا قَضَيْتَ لِیْ مِنْ اَمْرٍ اَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهٗ لِیْ رُشْدًا ـ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দ্রুত আমার জানা-অজানা সকল কল্যাণ প্রার্থনা করি। আমি তোমার কাছে দ্রুত ও বিলম্বিত সকল মন্দ যা আমি জানি এবং যা জানি না তা থেকে পানাহ চাই। আমি তোমার কাছে বেহেশত ও তা লাভ করতে সহায়ক কথা ও কাজ কামনা করি এবং তোমার কাছে দোযখ এবং যে কথা ও কাজ দোযখের নিকটবর্তী করে, তা থেকে পানাহ চাই। আমি তোমার কাছে তোমার বান্দাহ ও রসূল মোহাম্মদ (সঃ) যে কল্যাণ কামনা করেছেন সে কল্যাণ কামনা করি। তোমার কাছে যে মন্দ ও অকল্যাণ থেকে তোমার বান্দাহ ও রসূল মোহাম্মদ (সঃ) আশ্রয় চেয়েছেন আমি সে সকল মন্দ ও অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চাই। আমি তোমার কাছে আমার ভাগ্যে নির্ধারিত বিষয়সমূহের ভাল পরিণাম কামনা করি।৪৫৪

৭. রসূলুল্লাহ (সঃ) এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি নামাযে কি (দোআ') কর? লোকটি জওয়াব দিল, আমি তাশাহ্‌হুদ পড়ি, আল্লাহ্‌র কাছে বেহেশত চাই এবং দোযখ থেকে পানাহ চাই। আল্লাহর কসম, আমি আপনার এবং মোআ'যের অস্পষ্ট দোআ'র গুনগুন শব্দ বুঝতে পারি না। তিনি তাঁকে বলেন, তুমি আমাদের দোআকে তোমার দোআর কাছাকাছি কর।৪৫৫

---

৪৫৩. বোখারী, মুসলিম।

৪৫৪. আহমদ, আত্‌তায়ালিসী, বোখারী, আল্‌আদাব আল-মোফরাদ, ইবনু মাজাহ। হাকেম এটিকে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।

৪৫৫. আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ-সনদ সহীহ।

৮. রসূলুল্লাহ (সঃ) এক ব্যক্তিকে তাশাহ্‌হুদে নিম্নোক্ত দোআ পড়তে শুনেছেনঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ يَا اَللّٰهُ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ اَنْ تَغْفِرَلِىْ ذُنُوْبِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ -

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি, হে আল্লাহ! তুমি এক ও একক, কারোর মুখাপেক্ষী তুমি নও, তুমি সেই সত্তা যিনি কোন সন্তান জন্ম দেননি এবং নিজে জন্ম নেননি, যার কোন সমকক্ষ নেই, আমার গুনাহ মাফ কর, তুমি নিশ্চয়ই সর্বাধিক ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।"

তা শুনার পর রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, একে মাফ করে দেয়া হয়েছে, একে মাফ করে দেয়া হয়েছে।৪৫৬

৯. রসূলুল্লাহ (সঃ) অন্য একজনকে তাশাহ্‌হুদে নিম্নের দোআ পড়তে শুনেনঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ الْمَنَّانُ يَابَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَاذَالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَاحَىُّ يَاقَيُّوْمُ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ -

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি, সকল প্রশংসা তোমার জন্য, তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তুমি এক ও একক, তোমার কোন শরীক নেই। হে মান্নান, আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, হে মহান ও সম্মানিত, হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী! আমি তোমার কাছে বেহেশত চাই এবং দোযখ থেকে পানাহ চাই।"

তার এ দোআ শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি জান সে কি দিয়ে দোআ করেছে? তাঁরা জওয়াব দেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূল সর্বাধিক জানেন। তিনি বলেন, আমার প্রাণ যার হাতে তাঁর শপথ করে বলছি, সে আল্লাহর মহান নাম সহকারে দোআ করেছে। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, সে আল্লাহর 'ইসমে আযম' সহকারে দোআ করেছে। ঐ

৪৫৬. আবু দাউদ, নাসাঈ, আহমদ, ইবনু খোযায়মাহ্, হাকেম এটিকে সহীহ বলেছেন এবং আল্লামা যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।

নামে তাঁকে ডাকা হলে তিনি জওয়াব দেন এবং কোন কিছু চাওয়া হলে তিনি দান করেন।[৪৫৭]

১০. রসূলুল্লাহ (সঃ) তাশাহ্হুদ ও সালামের মাঝে সর্বশেষ যা বলতেন, তা হচ্ছে।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَااَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَااِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ـ

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! আমার আগের ও পরেরর গুনাহ, গোপন ও প্রকাশ্য গুনাহ, অপচয় এবং যা সম্পর্কে তুমি আমার চাইতে সর্বাধিক জান সে-সকল গুণাহ মাফ কর। তুমিই প্রথম এবং তুমিই সর্বশেষ। তুমি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই।[৪৫৮]

সালাম

তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ) 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বলে সালাম ফিরাতেন। তখন তাঁর ডান গালের সাদা অংশ দেখা যেত। তারপর বামদিকে সালাম ফিরাতেন। তখনও গালের বাম অংশের শুভ্রতা দেখা যেত।[৪৫৯] তিনি কখনও কখনও প্রথম সালামে 'ওয়া বারাকাতুহু' যোগ করতেন।[৪৬০]

তিনি কখনও কখনও ডানদিকে সালাম ফিরানোর সময় বামদিকের আসসালামু আলাইকুমের তুলনায় সংক্ষিপ্তভাবে আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলতেন,[৪৬১] কখনও তিনি মাত্র একটি সালাম বলতেন। তখন মুখ সোজা থাকত, তবে সামান্য ডানদিকে ঝুঁকে যেত।[৪৬২]

---

৪৫৭. আবু দাঊদ, আহমদ, আল-আ্যাবুল মোফরাদ-বোখারী, তাবারানী, আত্-তাওহীদ- ইবনু মানদাহ। সনদ সহীহ।

৪৫৮. মুসলিম, আবু আওয়ানাহ।

৪৫৯. আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী এটিকে সহীহ বলেছেন।

৪৬০. আবু দাউদ, ইবনু খোযায়মাহ- সনদ সহীহ। আবদুল হক তাঁর আহকাম গ্রন্থে এটিকে সহীহ বলেছেন। অনুরূপভাবে, ইমাম নববী এবং হাফেয ইবনু হাজারও একে সহীহ বলেছেন। মোসান্নাফ- আবদুর রায্‌যাক, মোসনাদ আবূ ইয়ালী আল কবীর- তাবারানী, আল আওসাত দারু কুতনী।

৪৬১. নাসাঈ, আহমদ, আস- সেরাজ- সনদ সহীহ।

৪৬২. ইবনু খোযায়মাহ, বায়হাকী, আল মোখতারাহ- আয্‌যিয়াহ্, আস সুনান-আবদুল গনী মাকদেসী- সনদ সহীহ। আহমদ, আল-আওসাত- তাবারানী, হাকেম এটিকে সহীহ বলেছেন এবং আল্লামা যাহাবী ও ইবনুল মোলাক্কান তা সমর্থন করেছেন।

'সাহাবায়ে কেরাম ডান ও বাম দিকে সালাম ফিরাবার সময় হাত দিয়ে ইশারা করতেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তা লক্ষ্য করে বলেন, তোমরা পলায়নকারী তেজী ঘোড়ার লেজের (নড়াচড়ার) মত হাত দিয়ে ইশারা কর কেন? তোমাদের কেউ সালাম ফিরালে সে যেন তার সাথীর দিকে তাকায় এবং হাত দিয়ে ইশারা না করে। তারপর তাঁরা যখন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে নামায পড়েছেন, তখন আর ঐরূপ করেননি।

অন্য এক বর্ণনা এসেছে, তোমাদের যে কোন লোকের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে রানের উপর হাত রাখবে, তারপর ডান ও বাম দিকে নিজ ভাইয়ের সালাম দেবে।[৪৬৩]

সালাম ফিরানো ওয়াজিব

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

'পবিত্রতা হচ্ছে, নামাযের চাবি, তাকবীরের মাধ্যমে নামাযে অন্যান্য কাজ হারাম হয়ে যায় এবং সালামের মাধ্যমে নামায থেকে হালাল হয়ে বের হতে হয়।[৪৬৪]

নামাযে নারী-পুরুষের পদ্ধতিগত কোন পার্থক্য নেই

উপরে বর্ণিত রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নামাযের পদ্ধতি নারী-পুরুষ সবার জন্য সমান। হাদীসে পুরুষদের নামায থেকে মহিলাদের নামাযের কোন ব্যতিক্রম বর্ণনা করা হয়নি। বরং 'তোমরা আমাকে যে পদ্ধতিতে নামায পড়তে দেখ সে পদ্ধতিতে নামায পড়' রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এই হাদীস নারী-পুরুষ সবার জন্য সমান। ইবরাহীম নাখঈ এই মত পোষণ করেন। তিনি বলেছেন ঃ পুরুষরা নামাযে যা করে মহিলারাও তাই করবে। (ইবনে শায়বাহ-সনদ সহীহ)

বোখারী আত্‌তারীখ আস্-সাগীর গ্রন্থের ৯৫ পৃষ্ঠায় সহীহ সনদ সহকারে প্রখ্যাত মহিলা সাহাবী উম্মুদ্ দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, 'তিনি নামাযে পুরুষের মত বসতেন এবং তিনি ছিলেন ফকীহ্।' অর্থাৎ ফিক্‌হ সম্পর্কিত জ্ঞানের অধিকারীণী।

আবু দাউদ 'আল-মারাসীল' গ্রন্থে ইয়াযীদ বিন আবী হাবীব থেকে বর্ণনা করছেন, 'সাজদায় মহিলারা পাঁজরের সাথে হাত মিলিয়ে রাখবে এবং এ

---

৪৬৩. মুসলিম, আবূ আওয়ানাহ, আস্-সিরাজ, ইবনু খোযায়মাহ, তাবারানী।

৪৬৪. আবু দাউদ, তিরমিযী। হাকেম এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন এবং আল্লামা যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।

ক্ষেত্রে তারা পুরুষদের মত নয়' এটি মোরসাল হাদীস এবং তা সহীহ নয়। (তাই এর উপর আমল না করা ভাল)

ইমাম আহমদ মাসায়েল গ্রন্থের ৭১ পৃষ্ঠায় ইবনে উমার থেকে নিজ স্ত্রীদের এক পায়ের উপর অন্য পা আড়াআড়ি করে বসার আদেশসূচক যে বর্ণনা উল্লেখ করেছেন সেটির সনদ সহীহ নয়। কেননা, ঐ সনদের মধ্যে আবদুল্লাহ বিন উমরী নামক বর্ণনাকারী দুর্বল। তাই এর উপরও আমল করা ঠিক নয়।

সমাপ্তি

তাকবীর তাহরীমা থেকে সালাম ফিরানো পর্যন্ত রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নামায পদ্ধতি সম্পর্কে আমার পক্ষে শেষ পর্যন্ত যা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তা হচ্ছে এইটুকু।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন এই বইকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ইখলাস ও নিষ্ঠাপূর্ণ করেন এবং রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সুন্নাতের দিকে পথ প্রদর্শনকারী বানান।

মজলিশ শেষে হাদীসে বর্ণিত নিম্নোক্ত দোআ এবং পরে দূরূদ পড়ে শেষ করছি। ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ ـ

দূরূদ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

গ্রন্থপঞ্জী

ক. আল কোরআন

১. আল কোরআনুল করীম

খ. আত তাফসীর

২. ইবনে কাসীর (৭০১-৭৭৪) ঃ তাফসীরুল কোরআনিল আযীম

গ. সুন্নাহ

৩. মালেক ইবনে আনাস (৯৩-১৭৯ হিঃ) আল মুয়াত্তা

৪. আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (১১৮ - ১৮১ হিঃ) ঃ আযযোহ্‌দ

৫. মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশশায়বানী (১৩১-১৮৯ হিঃ) ঃ আল মুয়াত্তা

৬. আত্‌তায়ালিসী (১২৪-২০৪ হিঃ) ঃ আল মুসনাদ

৭. আবদুর রায্‌যাক ইবনে হুমাম (১২৬-২১১ হিঃ) ঃ আল আমালী

৮. আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর আল হুমায়দী (... -২১৯ হিঃ) ঃ আল মুসনাদ

৯. মুহাম্মদ ইবনে সাআদ (১৬৮-২৩০ হিঃ) ঃ আত্‌তাবাকাতুল কুবরা

১০. ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে মুঈন (... - ২৩৩ হিঃ) ঃ তারীখুর রিজাল ওয়াল ইলাল

১১. আহমাদ ইবনে হাম্বল (১৬৪-২৪১ হিঃ) ঃ আল মুসনাদ

১২. ইবনে আবী শায়বা আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আবু বাকর (... - ২৩৫ হিঃ) ঃ আল মুসান্নাফ

১৩. আদদারেমী (১৮১-২৫৫ হিঃ) ঃ আস সুনান

১৪. আল বোখারী (১৯৪-২৫৬ হিঃ) ঃ আল জামেউস সহীহ

১৫. আল বোখারী (১৯৪-২৫৬ হিঃ) ঃ আল আদাবুল মুফরাদ

১৬. আল বোখারী (১৯৪-২৫৬ হিঃ) ঃ খালকু আফ্‌আলুল ইবাদ

১৭. আল বোখারী (১৯৪-২৫৬ হিঃ) ঃ আত্‌তারীখুস সগীর

১৮. আল বোখারী (১৯৪-২৫৬ হিঃ) ঃ জুযউল কেরাআত

১৯. আবু দাউদ (২০২-২৭৫ হিঃ) ঃ আস সুনান

২০. মুসলিম (২০৪-২৬১ হিঃ) ঃ আস সহীহ

২১. ইবনে মাজা (২০৯-২৭৯ হিঃ) ঃআস সুনান

২২. আত্‌তিরমিযী (২০৯-২৭৩ হিঃ) ঃ আস সুনান

২৩. আত্‌তিরমিযী (২০৯-২৭৯ হিঃ) ঃ আশ শামায়েল

২৪. আল হারেছ ইবনে আবী উসামা (১৭৬-২৮২ হিঃ) ঃ আল মুসনাদ

২৫. আবু ইসহাক আল হারাবী ইবরাহীম ইবনে ইসহাক (১৯৮-২৮৫ হিঃ)
ঃ গারীবুল হাদীস।
২৬. আলবাযযার আবু বাকর আহমদ ইবনে আমর আল বসরী (...-২৯২ হিঃ)
ঃ আল মুসনাদ।
২৭. মুহাম্মদ বিন নাসর (২০২-২৯৪ হিঃ) ঃ কিয়ামুল লাইল
২৮. ইবনে খোযায়মা (২২৩-৩১১ হিঃ) ঃ আস্‌সহীহ
২৯. আননাসায়ী (২২৫-৩০৩ হিঃ) ঃ আসসুনানন্‌
৩০. আননাসায়ী (২২৫ – ৩০৩ হিঃ) ঃ আসসুনানুল কুবরা।
৩১. আল কাসেমুল সারকাসতী (২৫৫-৩০২ হিঃ) ঃ গারীবুল হাদীস
৩২. ইবনুল জারূদ (... - ৩০৭ হিঃ) ঃ আল মুনতাকা
৩৩. আবু ইয়ালী আল মুসেলী (... - ৩০৭ হিঃ) ঃ আল মুসনাদ
৩৪. আররুয়ানী মুহাম্মদ ইবনে হারূন (...- ৩০৭ হিঃ) ঃ আল মুসনাদ
৩৫. আসসেরাজ আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (২১৬-৩১৩ হিঃ)
ঃ আল মুসনাদ
৩৬. আবূ আওয়ানা (...- ৩১৬ হিঃ) ঃ আসসহীহ
৩৭. ইবনে আবু দাউদ আব্দুল্লাহ ইবনে সুলায়মান (২৩০-৩১৬ হিঃ)
ঃ আল মাসাহিফ
৩৮. আত্‌তাহাবী (২৩৯-৩২১ হিঃ) ঃ শরহে মাআনি আল-আছার
৩৯. আত্‌তাহাবী (২৩৯-৩২১ হিঃ) ঃ মুশকিলুল আছার
৪০. মুহাম্মদ ইবনে আমর আল ওকাইলী (... - ৩২২ হিঃ) ঃ আদ-দোয়াফা
৪১. ইবনে আবী হাতিম (২৪০-৩২৭ হিঃ) ঃ ইলালুল হাদীস
৪২. ইবনে আবী হাতিম (২৪০ – ৩২৭ হিঃ) ঃ আলজারহু ওয়াত তাদীল।
৪৩. আবু জা'ফর আল বাখতারী মুহাম্মাদ বিন আমর আররাযায
(... -৩২৯ হিঃ)
ঃ আল আমালী
৪৪. আবু সাঈদ ইবনুল আবী আহমাদ বিন যিয়াদ (২৪৬-৩৪০ হিঃ)
ঃ আল মু'জাম
৪৫. ইবনুস সাম্মাক উছমান ইবনে আহমাদ (... - ৩৪৪ হিঃ) ঃ হাদীসাহ
৪৬. আবুল আব্বাস আল আসেম মুহাম্মদ বিন ইয়াকুব (২৪৭-৩৪৬ হিঃ) হাদীসুহু
৪৭. ইবনে হিববান (... - ৩৫৪ হিঃ) ঃ আসসহীহ
৪৮. আত্‌তাবারানী (২৬০-৩৬০ হিঃ) ঃ আল মু'জামুস সগীর

৪৯. আত্‌তাবারানী (২৬০-৩৬০ হিঃ) ঃআল মু'জামুল কাবীর

৫০. আত্‌তাবারানী (২৬০-৩৬০ হিঃ) ঃ আল মু'জাম আল-আওসাত

৫১. আবু বাকর আল আজরী (...- ৩৬০ হিঃ) ঃআল আরবায়ীন

৫২. আবু বাকর আল আজরী (..- ৩৬০ হিঃ) ঃ আদাবু হামালাতিল কুরআন

৫৩. ইবনুস সুন্নী (... - ৩৬৪ হিঃ) ঃ আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলে

৫৪. আবুশ শায়খ ইবনে হাইয়ান (২৭৪-৩৬৯ হিঃ) ঃ তাবাকাতুল আসবাহানীন

৫৫. আবুশ শায়খ ইবনে হাইয়ান (২৭৪-৩৬৯ হিঃ)
ঃ মারাওয়াহু আবুয্ যোবায়র আন গাইরি যাবির

৫৬. আবুশ শায়খ ইবনে হাইয়ান (২৭৪-৩৬৯ হিঃ) আখলাকুন্নবী (সঃ)

৫৭. আদদারা কুতনী (৩০৬-৩৮৫ হিঃ) ঃ আস সুনান

৫৮. আল খাত্তাবী (৩১৭-৩৮৮ হিঃ) ঃ মাআলিমু আস্ সুনান।

৫৯. আলমুখলিস (৩০৫-৩৯৩ হিঃ) ঃ আল ফাওয়ায়িদ

৬০. ইবনে মানদাহ আবু আবুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (৩১৬-৩৯৫ হিঃ) ঃ আততাওহীদ ওয়া মা'রিফাতু আসমায়িল্লাহি তাআলা

৬১. আল হাকিম (৩২০-৩০৫ হিঃ) ঃ আল মুসতাদরাক

৬২. তাম্মামুর রাযী (৩৩০ – ৪১৪ হিঃ) ঃ আল ফাওয়ায়িদ

৬৩. আসসাহমী হামযাতু ইবনে ইউসুফ আলজুরজানী (.... ৪২৭ হিঃ)
ঃ তারীখু জুরজান

৬৪. আবু নোআইম (৩৩৬-৪৩০ হিঃ) ঃ আখবারু ইসবাহান

৬৫. ইবনে বুশরান (৩৩৯-৪৩০ হিঃ) ঃ আল আমালী

৬৬. আল বায়হাকী (৩৮৪-৪৫৮ হিঃ) ঃ আস সুনানুল কুবরা

৬৭. আল বায়হাকী (৩৮৪ – ৪৫৮ হিঃ) দালায়িলুন নুবুয়াহ

৬৮. ইবনে আবদুল বাররু (৩৬৮-৪৬৩ হিঃ) ঃ জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলুহু

৬৯. ইবনে মানদাহ্ আবুল কাসেম (৩৮১-৪৭০ হিঃ) ঃ আররাদ্দু আলা মাহইয়ানফিল হারফ মিনাল কোরআন।

৭০. আলবাজী (৪০৩-৪৭৭ হিঃ) ঃ শরহে আল মুয়াত্তা

৭১. আবদুল হক আল্ আশ্বীলী (৫১০-৫৮১ হিঃ) ঃ আল আহকামুল কুবরা

৭২. আবদুল হক আল আশবীলী (৫১০-৫৮১ হিঃ) ঃ আত্তাহাজ্জুদ।

৭৩. ইবনে আজজাওযী (৫১০-৫৯৭ হিঃ)

ঃ আততাহকীক আলা মাসাইলিত তা'লীক।

৭৪. আবু হাফদ আল মুয়াদ্দিবু ওমার ইবনে মুহাম্মদ (৫১৬-৬০৭ হিঃ)

ঃ আল মুনতাকা মিন আমালী আবিল কাসিম আস সামারকানদী।

৭৫. আবদুল গনী ইবনে আবদুল ওয়াহিদ আল মাকদিসী (৫৪১-৬০০)

৭৬. আদদিয়াউল মাকদিসী (৫৬৯-৬৪৩ হিঃ) ঃ আল আহাদীসুল মুখতারাহ।

৭৭. আদদিয়াউল মাকদিসী (৫৬৯-৬৪৩ হিঃ) ঃ আল মুনতাকা মিনাল আহাদীসিস সেহাহে ওয়াল হেসান।

৭৮. আদদিয়াউল মাকদিসী (৫৬৯-৬৪৩ হিঃ) ঃ জুয্‌উন ফী ফাদলিল হাদীসে ওয়া আহলিহী।

৭৯. আল মোনজেরী (৫৮১-৬৫৬ হিঃ) ঃ আত্‌তারগীব ওয়াত্‌তারহীব।

৮০. আয্‌যায়লাঈ (... - ৭৬২ হিঃ) ঃ নসবুর রাইয়াহ।

৮১. ইবনে কাছীর (৭০১-৭৭৪ হিঃ) ঃ জামেউল মাসানীদ।

৮২. ইবনুল মুলাক্কান আবু হাফস ওমার ইবনে আবিল হাসান
(৭২৩-৮০৪ হিঃ)
ঃ খুলাসাতুল বাদরিল মুনীর।

৮৩. আল ইরাকী (৭২৫-৮০৬ হিঃ) ঃ তাখরীজুল এহ্‌ইয়াহ্‌।

৮৪. আল ইরাকী (৭২৫-৮০৬ হিঃ) ঃ তারহুত্‌ তাছরীব।

৮৫. আল হাইছামী (৭৩৫-৮০৭ হিঃ) ঃ মাজমাউয যাওয়ায়িদ।

৮৬. আলহাইছামী (৭৩৫-৮০৭ হিঃ) ঃ মাওয়ারিদুয যামআন ফী যাওয়ায়িদি ইবনে হিব্বান।

৮৭. আল হাইছামী (৭৩৫-৮০৭ হিঃ) ঃ যাওয়ায়িদুল মু'জামিস সাগীর ওয়াল আওসাতু লিততাবারানী।

৮৮. ইবনে হাজার আল আসকালানী (৭৭৩-৮৫২ হিঃ) ঃ তাখরীজু আহাদীসুল হিদায়াহ।

৮৯. ইবনে হাজার আল আসকালানী (৭৭৩-৮৫২ হিঃ) ঃ তালখীসুল হোবাইর।

৯০. ইবনে হাজার আল আসকালানী (৭৭৩ – ৮৫২ হিঃ) ফাতহুল বারী।

৯১. ইবনে হাজার আল আসকালানী (৭৭৩-৮৫২ হিঃ) ঃ আল আহাদীসুল আলিয়াত।

৯২. আস্‌সুয়ুতী (৮৭৯-৯১১ হিঃ) ঃ আল জামিউল কাবীর।

৯৩. আলী আলকারী (... - ১০১৪ হিঃ) ঃ আল আহাদীসুল মাওদুআহ।

৯৪. আল মানাওয়া (৯৫২-১০৩১ হিঃ) ঃ ফাইদুল কাদীর শারহুল জামিইস সাগীর।

৯৫. আযযারকানী (১০৫৫-১১২২ হিঃ) ঃ শরহুল মাওয়াহিবি আললাদানিয়াহ্।

৯৬. আশ্‌শাওকানী (১১৭১-১২৫০ হিঃ) ঃ আলফাওয়াইদুল মাজমুআ ফিল আহাদীছিল মাওদুয়াহ্।

৯৭. আবদুল হাই লাখনুবী (১২৬৪-১৩০৪ হিঃ) ঃ আত্‌তালীকুল মুমাজ্জাদ আলা মুয়াত্তা মুহাম্মাদ।

৯৮. আবদুল হাই লাখনুবী (১২৬৪-১৩০৪ হিঃ) ঃ আল আছারুল মারফূআ ফিল আখবারিল মাওদুআ।

৯৯. মুহাম্মদ বিন সাঈদ আল হালাবী (... - ....) মুসালসালাতুহু।

১০০. আল মুয়াললিফ ঃ তাখরীজু সিফাতিস সালাহ।

১০১. গ্রন্থকার ঃ ইরওয়াউল গালীলে ফী তাখরীজি মানারিস সাবীল।

১০২. গ্রন্থকার ঃ সহীহ আবু দাউদ।

১০৩. গ্রন্থকার ঃ আত্‌তালীক আলা আহকামি আবদিল হক।

১০৪. গ্রন্থকার ঃ তাখরীজু আহাদিস শরহিল আকীদা আত-তাহাওইয়াহ।

১০৫. গ্রন্থকার ঃ সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দায়ী'ফাহ্।

ঘ. ফিকহ

১০৬. মালিক ইবনে আনাস (৯৩-১৭৯ হিঃ) মোদাওয়ানাহ।

১০৭. আশ শাফেঈ (১৫০-২০৪ হিঃ) আল উম্মু।

১০৮. ইসহাক ইবনে মানসূর ঃ আল মারুযী (... - ২৫১ হিঃ) মাসাইলুল ইমাম আ-হমাদ ওয়া ইসহাক ইবনে রাহ্‌ওয়ায়হ

১০৯. ইবনে হানী ঃ ইবরাহীম আন্ নিসাবুরী (..... ২৬৫ হিঃ) মাসাইলুল ইমাম আহমদ

১১০. আল মুযানী (১৭৫-২৬৪ হিঃ) মুখতাসের ফিকহ শাফেঈ।

১১১. আবু দাউদ (২০২-২৭৫ হিঃ) মাসাইলুল ইমাম আহমাদ।

১১২. আবদুল্লাহ ইবনে ইমাম আহমাদ (২০৩-২৯০ হিঃ) মাসায়িলু ইমাম আহমাদ

১১৩. ইবনে হাযম (৩৮৪-৪৫৬ হিঃ) আল মুহাল্লা।

১১৪. আল ইয্যু ইবনে আবদিস সালাম (৫৭৮-৬৬০ হিঃ) আলফাতাওয়া।

১১৫. আন্‌নববী (৬৩১-৬৭৬ হিঃ)
১১৬. আল মাজমুউ শরহিল মোহায্‌যাব ঃ রাওদাতুত তালেবীন।
১১৭. ইবনে তাইমিয়া (৬৬১-৭২৮ হিঃ) আল ফাতাওয়া।
১১৮. ইবনে তাইমিয়া (৬৬১-৭২৮ হিঃ) মান কালামুন লাহু ফিততাকবীরে ফিল ঈদাইনে ওয়া গাইরিহি।
১১৯. ইবনুল কাইয়িম (৬৯১-৭৫১ হিঃ) ইলামুল মুকিঈন।
১২০. আসসাবকী (৬৮৩-৭৫৬ হিঃ) আল ফাতাওয়া।
১২১. ইবনুল হাম্মাম (৭৯০-৮৬৯ হিঃ) ফাতহুল কাদীর।
১২২. ইবনু আবদিল হাদী ইউসুফ (৮৪০-৯০৯ হিঃ) ইরশাদুস সালিক।
১২৩. ইবনু আবদিল হাদী ইউসুফ (৮৪০-৯০৯ হিঃ) আল ফুরূউ।
১২৪. আস্‌সুয়ূতী (৮৮৯-৯১১ হিঃ) আলহাওয়ী লিল ফাতাওয়া।
১২৫. ইবনে নোজাইম আলমিসরী (... - ৯৭০ হিঃ) আলবাহ্‌রুর রায়িক।
১২৬. আশ্‌শা'রানী (৮৯৮-৯৭৩ হিঃ) আল মীযান।
১২৭. আলহাইতামী (৯০৯-৯৭৩ হিঃ) আদদুররুল মানযুদ ফিস্‌সালাতি ওয়াস সালামি আলা সাহেবিল মাকামিল মাহমূদ।
১২৮. আল হাইতামী (৯০৯-৯৭৩ হিঃ) আসমাল মাতালেব।
১২৯. ওয়ালীউল্লাহ আদ্‌দেহলভী (১১১০-১১৭৬ হিঃ) হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা।
১৩০. ইবনু আবিদীন (১১৫১-১২০৩ হিঃ) আল হাশিয়াতুল আলাদ্‌দুররিল মুখতার।
১৩১. ইবনু আবিদীন (১১৫১-১২০৩ হিঃ) হাশিয়াতু আলাল বাহরির রায়িক।
১৩২. ইবনু আবিদীন (১১৫১-১২০৩ হিঃ) রাসমুল মুফতী।
১৩৩. আবদুল হাই আললাখনোভী (১২৬৪-১৩০৪ হিঃ) ইমামুল কালাম ফী মা ইয়াতাআল্লাকু বিল কিরআতি খালফিল ইমাম।
১৩৪. আবদুল হাই আললাখনোভী (১২৬৪-১৩০৪ হিঃ) আন্‌নাফিউল কাবীরে লিমাইয়ুতালিউল জামিউস সাগীরে।

ঙ. আসসীরাতু ওয়াত্‌তারাজিম

১৩৫. ইবনু আবী হাতিম আবদুর রহমান (২৪০-৩২৭ হিঃ) তাকদোমাতুল মারিফাতে লিকিতাবিল জারহি ওয়াত্‌তাদীল।
১৩৬. ইবনু হিব্বান (.. - ৩৫৪ হিঃ) আছ্‌ছিকাত।

১৩৭. ইবনু আদী (২৭৭-৩৬৫ হিঃ) আল কামিল।

১৩৮. আবু নোআ'ইম (৩৩৬-৪৩০ হিঃ) হিলইয়াতুল আওলিয়া।

১৩৯. আল খাতীবুল বাগদাদী (৩৯২-৪৬৩ হিঃ) তারীখে বাগদাদ।

১৪০. ইবনু আবদিল বার্‌র (৩৬৮-৪৬৩ হিঃ) আল ইনতিকা ফী ফাদাইলিল ফুকাহা।

১৪১. ইবনু আসাকির (৪৯৯-৫৭১ হিঃ) তারীখে দামিশ্‌ক।

১৪২. ইবনুল জাওযী (৫০৮-৫৯৭ হিঃ) মানাকিবুল ইমাম আহমাদ।

১৪৩. ইবনুল কাইয়িম (৬৯১-৭৫১ হিঃ) যাদুল মাআদ।

১৪৪. আবদুল কাদের আলকোরাশী (৬৯৬-৭৭৫ হিঃ) আলজাওয়াহিরুল মুদীয়াহ।

১৪৫. ইবনু রাজাব আল হাম্বলী (৭৩৬-৭৯৫ হিঃ) যায়লুত্‌-তাবাকাত।

১৪৬. আবদুল হাই আল লাখনোভী (১২৬৪-১৩০৪ হিঃ) আলফাওয়াইদুল বাহিয়া ফী তারাজিমিল হানাফিয়াহ্‌।

চ. আল লুগাত

১৪৭. ইবনুল আছীর (৫৪৪-৬০৬ হিঃ) আন্‌নিহাইয়াতু ফী গারীবিল হাদীসে ওয়াল আছার।

১৪৮. ইবনু মানযুর (৬৩০-৭১১ হিঃ) লিসানুল আরাব।

১৪৯. আল ফিরোযাবাদী (৭২৯-৮১৭ হিঃ) আলকামুসুল মুহীত।

ছ. উসূলুল ফিকহ

১৫০. ইবনু হাযাম (৩৮৪-৪৫৬ হিঃ) আল এহকামু ফী উসূলিল আহকাম।

১৫১. আস্‌সাবকী (৬৮৩-৮৫৬ হিঃ) মানা কাওলিশ শাফেঈ আল মাতলাবী ইযা সাহ্‌হা হাদীসু ফাহুয়া মাযহাবী

১৫২. ইবনু কাইয়িম (৬৯১-৮৫৬ হিঃ) বাদাইউল ফাওয়াইদ।

১৫৩. ওয়ালিউল্লাহ আদ্‌-দেহলভী (১১১০-১১৭৬ হিঃ) ইকদুল জীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদ ওয়াত্‌তাকলীদ।

১৫৪. আল ফালানী (১১৬৬-১২১৮ হিঃ) ইকাযুল হিমাম।

১৫৫. আয্‌যারকা আশ শেখ মুসতাফা ঃ আল মাদখাল ইলা ইলমি উসূলিল ফিক্‌হ।

জ. আল আযকার

১৫৬. ইসমাঈল কাযী আলজাহ্‌দামী (১৯৯-২৮২ হিঃ) ফাদলুস সালাতি আলান নাবীয়্যি (সঃ)।

১৫৭. ইবনুল কায়্যিম (৬৯১-৭৫১ হিঃ) জালাউল আফহামি ফিসসালাতি আলা খাইরিল আনাম।

১৫৮. সিদ্দীক হাসান খান (১২৪৮-১৩০৭ হিঃ) নুযুলুল আবরার।

জ. মোতানাওয়েআত

১৫৯. ইবনু বাত্তাহ আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ (৩০৪-৩৮৭ হিঃ) আল-ইবানাহ্‌ আন শারীআতিল ফিরকাতিন-নাজিয়াহ্‌।

১৬০. আবু আমর আদদানী উসমান ইবনু সাঈদ (৩৭১-৪৪৪ হিঃ) আল মুকতাফী ফী মারিফাতিল ওয়াকফিত্‌তাম

১৬১. আল খাতীবুল বাগদাদী (৩৯২-৪৬৩ হিঃ) আল ইহতিজাজু বিশশাফেঈ ফীমা উসনিদা ইলাইহি.....।

১৬২. আল হারাবী ঃ আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ আনসারী (৩৯৬-৪৮১ হিঃ) যাম্মুল কালাম ওয়া আহলুহু

১৬৩. ইবনুল কায়্যিম (৬৯১-৭৫১ হিঃ) শিফাউল আলীল ফী মাসাইলিল কাদায়ে ওয়াল কাদরি ওয়াত্‌তা'লীল

১৬৪. আল ফীরোযাবাদী (৭২৯-৮১৭ হিঃ) আররাদ্‌দু আলাল মো'তারেদ আলা ইবনি আরাবী।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামায

দ্বিতীয় ভাগ

[হাদীসের আলোকে নামায ও অযূ-গোসলের প্রচলিত ভুল সংশোধন]

এ, এন, এম, সিরাজুল ইসলাম

মুখবন্ধ

রসূলুল্লাহ (সাঃ) কিভাবে নামায পড়েছেন এ বিষয়টি জানার পর তাঁর নামায এবং সহীহ হাদীসের আলোকে নামায এবং অযূ-গোসলের ক্রটি-বিচ্যুতিগুলোও আলোচনার দাবী রাখে। আমরা সচরাচর নামাযে অনেক ক্রটি-বিচ্যুতি দেখি যা জানলে তার পুনরাবৃত্তি হবে না। নামায সহীহ-শুদ্ধ হোক এটা সবারই কামনা। কেননা, বিশুদ্ধ নামাযই আল্লাহর দরবারে কবুল হয়, ক্রটিপূর্ণ নামায কবুল হয় না। অনুরূপভাবে, অজু-গোসলের ক্রটি-বিচ্যুতিগুলোও আলোচনা হওয়া দরকার।

ক্রটি-বিচ্যুতিগুলো হাদীসের পরিপন্থী। যদি বিরাট সংখ্যক লোকও সে ভুল করে তাহলেও সেটা ভুল। আর একজনও যদি হক বা সত্যকে অবলম্বন করে তাহলে তা-ই সত্য এবং এ ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। আল্লামা ইবনুল কাইয়েম (রঃ) বলেন ঃ হক বা সত্যের অনুসারী একজন আলেমও সংখ্যাগরিষ্ঠতা, দলীল-প্রমাণ ও এজমা'র দাবী করতে পারেন, যদিও গোটা দুনিয়া তার বিরোধীতা করে।[১]

নাঈম বিন হাম্মাদ বলেন ঃ কোন দল বা সমষ্টি নষ্ট হয়ে গেলে তুমি তাদের খারাপ হওয়ার পূর্বের অবস্থা অনুসরণ করবে যদিও তুমি একা। তখন তুমিই মূলতঃ সমষ্টি।[২]

ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের সময় তিনি ছাড়া অন্য সবাই যেমন, খলীফা, উজির-নাজির, আলেম-ওলামা, মুফতীরা 'কোরআন সৃষ্ট' এ মতবাদের অনুসারী হয়ে যান। একমাত্র ইমাম আহমদ এর বিরোধীতা করেন। সমষ্টির যুক্তি ছিল, আমরা সবাই নাহক এবং তিনি একাই হকের উপর আছেন, এটা হতে পারে না। তাই খলীফা তাঁকে গ্রেফতার করে বেত্রাঘাত পর্যন্ত করেন। তা সত্ত্বেও তিনি সত্য থেকে বিচ্যুত হননি। সত্যের জন্য অনেকে অকাতরে জীবন বিলিয়ে গেছেন। ভুল ও ক্রটি-বিচ্যুতিকারীদের সংখ্যাই বিরাট। এক্ষেত্রে ভুল সংশোধনকারী হয়ত সংখ্যালঘু। তাই আল্লামা শাতেবী (রঃ) বলেছেন ঃ 'অতীতের নেক লোকেরা হকের উপর আমলের জন্য উৎসাহিত করেছেন এবং সংখ্যালঘু হওয়ার ভয় করতে নিষেধ করেছেন।'[৩]

---

১. মিম্ মোখালিফাত-আততাহারাহ ওয়াসসালাহ। আবদুল আযীয বিন মোহাম্মদ সাদহান, দারু তাইয়েবাহ প্রকাশনী। রিয়াদ, ১৪১২ হিঃ।

২. ঐ

৩. আল-এ'তেসাম, ২য় খণ্ড, ১১১ পৃঃ।

তিনি আরো বলেছেন ঃ সাধারণ লোকের এজমা বা মতৈক্যের কোন মূল্য নেই, এমনকি তারা নেতৃত্ব বা ইমামতির দাবী করলেও না।[৪]

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুসরণ, তাঁর আদেশ-নিষেধ মানা, তিনি যা করেছেন তা করা, সেগুলোর প্রচার ও প্রসার ঘটানো, তাঁর ভাল ও পসন্দনীয় কাজগুলোর প্রচলন করা এবং মুসলিম উম্মাহকে সেগুলো অনুসরণের জন্য উৎসাহিত করাই মূলতঃ সুন্নত। সুন্নতের উদাহরণ হল, হযরত নূহ (আঃ)-এর নৌকার মত। যে তাতে আরোহণ করবে সে মুক্তি পাবে।

হাদীস সহীহ হলে তা গ্রহণ করাই ঈমান ও যুক্তির দাবী। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) এ মর্মে ইমাম মালেকের সাথে ইমাম আবু ইউসুফের সা' এবং মোদ সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। ইমাম আবু ইউসুফ মোদ-এর পরিবর্তে ইমাম মালেকের সা'-এর ভিত্তিতে সদকা-ফিতরা দানের যুক্তি গ্রহণ করে নিজ মত পরিবর্তন করেছেন। ইমাম মালেক মদীনার বিভিন্ন লোককে তাদের মাপযন্ত্র– সা' হাজির করার আহ্বান জানালে অনেকে তা হাজির করেন। তারা তাদের দাদা-দাদীর বরাত দিয়ে বলেন ঃ এগুলো দিয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে ঈদুল ফিতরের সদকাহ দেয়া হত। ইমাম মালেক প্রশ্ন করেন, তারা কি মিথ্যা বলছে? আবু ইউসুফ বলেন, না, তারা মিথ্যা বলছে না। ইমাম মালেক ইরাকী জনগণের জন্য তাদের ৫ রতল এবং আরেক রতলের এক তৃতীয়াংশকে এক সা'-এর সমান ধার্য করেন। আবু ইউসুফ ইমাম মালেককে বলেন, হে আবু আবদুল্লাহ! আমার বন্ধু ইমাম আবু হানিফা আমি যা দেখলাম তা দেখলে তিনিও আমার মতো আপনার মতের প্রতি প্রত্যাবর্তন করতেন।

ইমাম বারাবহারী (রঃ) বলেন ঃ তোমরা ছোট ছোট নতুন নতুন এবাদত তৈরির ব্যাপারে হুঁশিয়ার থাকবে। ছোট ছোট বেদআতগুলোর পুনরাবৃত্তি বড় বেদআতের জন্ম দেয়। উম্মাহর মধ্যে প্রথম যে বেদআতগুলো ঢুকে সেগুলো ছোট আকৃতির থাকে এবং তাকে হক মনে হয়। ফলে বহু লোক ধোঁকায় পড়ে যায় ও তাতে অংশ নেয়। তারপর আর তা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। এটা ফুলে-ফেঁপে বড় হতে থাকে, দ্বীনের অংশে পরিণত হয় এবং সেরাতুল মোস্তাকীম তথা সরল পথ থেকে বিচ্যুতি ঘটায়।

এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ঘটনাটি বড় চমকপ্রদ। আমর বিন সালামাহ বলেন ঃ আমরা চাশতের নামাযের আগে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)-এর ঘরের দরজায় বসা ছিলাম। তিনি বের হলেন। আমরা তাঁর সাথে মসজিদে চললাম। আবু মূসা আশআরী (রাঃ) আসলেন। তিনি প্রশ্ন করেন, আবু আবদুর রহমান কি আপনাদের কাছে এসেছে? আমরা বললাম, 'না'। তিনিও আমাদের কাছে

[৪]. এরশাদ আস্-সারী ৩য় খণ্ড, ১০৭ পৃঃ।

বসলেন। এমন সময় আবু আবদুর রহমান অর্থাৎ আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) আসলেন। আমরা সকলে দাঁড়িয়ে গেলাম। হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বলেন ঃ হে আবু আবদুর রহমান! আমি প্রথমে মসজিদে ঢুকে কিছু অপসন্দনীয় কাজ দেখি। তবে আমি যা দেখেছি তা ভাল হবে বলে মনে করি। তিনি জিজ্ঞেস করেন, সেটা কি? তিনি জবাব দেন, আপনিও দেখতে পারবেন। আমি মসজিদে একদল লোককে গ্রুপে গ্রুপে বসে নামাযের জন্য অপেক্ষা করতে দেখলাম। প্রত্যেক গ্রুপের একজন লোকের হাতে ছিল কঙ্কর। তিনি দলের লোকদেরকে ১শ' বার তাকবীর, ১শ' বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং ১শ' বার তাসবীহ পড়তে (সোবহানাল্লাহ) বলেন। লোকেরা তাই করল। অর্থাৎ সে কঙ্কর দিয়ে তার হিসেব গুনতো। ইবনে মাসউদ জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি বলেছেন? তিনি বলেন, আমি আপনার মতের অপেক্ষায় কিছু বলিনি। ইবনে মাসউদ বলেন, আপনি তাদেরকে কেন তাদের গুনাহগুলোর গুনতির কথা বললেন না? আমি তাদের নেকসমূহ নষ্ট না হবার গ্যারান্টি দিচ্ছি। এরপর আমরা সবাই তাঁর সাথে একটি গ্রুপের কাছে যাই। তিনি সেখানে দাঁড়ান এবং জিজ্ঞেস করেন, আমি তোমাদের একি কাজ দেখছি? তারা বলল ঃ হে আবু আবদুর রহমান, আমরা কঙ্কর দ্বারা তাকবীর, তাহলীল ও তাসবীহর হিসেব রাখি। তিনি বলেন ঃ তোমরা তোমাদের গুনাহর হিসেব রাখ। আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি, তোমাদের নেক সামান্যও নষ্ট হবে না। হে উম্মতে মোহাম্মদ, তোমাদের জন্য আফসোস। তোমাদের ধ্বংস এত তাড়াতাড়ি আসন্ন! নবীর এ সকল সাহাবায়ে কেরাম বিদ্যমান আছেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এই তরতাজা শুকনো কাপড় এবং তাঁর তৈজসপত্রগুলো এখনও পর্যন্ত অক্ষত। আমার প্রাণ যার হাতে সে সত্ত্বার শপথ করে বলছি, তোমরা হয় উম্মতে মোহাম্মদীর সর্বাধিক হেদায়েত প্রাপ্ত কিংবা সর্বাধিক গোমরাহ লোক হবে। তাঁরা বলেন, হে আবু আবদুর রহমান! আল্লাহর কসম, আমাদের নেক উদ্দেশ্যই এর পেছনে কাজ করেছে। তিনি উত্তর দেন, বহু ভাল কাজের আকাঙ্খী লোক ঠিক পথে নেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, একদল লোক কোরআন পড়বে কিন্তু তা তাদের গলার ভেতর প্রবেশ করবে না। আল্লাহর কসম, আমি জানিনা যে, তোমরাই সে দলের সংখ্যাধিক্য লোক কিনা?

আমর বিন সালামাহ বলেন ঃ আমরা নাহরাওয়ান যুদ্ধে তাদের অধিকাংশকে খারেজী সম্প্রদায়ের সাথে আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে দেখেছি।

দ্বীনের মধ্যে নতুন আবিষ্কৃত এবাদত শেষ পর্যন্ত চরম গোমরাহীর দিকে ঠেলে দেয়। তাই যে কোন বেদআত থেকে মোমেনদেরকে দূরে থাকতে হবে।

এখন প্রশ্ন হল, মানুষ কেন হাদীসের খেলাপ কাজ করে এবং নামাযসহ বিভিন্ন এবাদতে বহু ভুল-ত্রুটি করে? উত্তরগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

১। দুর্বল ও জাল হাদীস সম্পর্কে পার্থক্য করার ক্ষমতা না থাকার কারণে সহীহ হাদীস অনুযায়ী আমল করা সম্ভব হয়না। ফলে ঐ সকল ভুল-ক্রুটি হতে থাকে। এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করে নিশ্চিত না হওয়াটাই বড় কারণ।

২। কিছু কিছু ফকীহ এজতেহাদ করে মাসলা ঠিকই বলেছেন, কিন্তু শরয়ী কোন প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেন নি। অথচ জনগণের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হয়ে আছে।

৩। পূর্বসূরীদের মধ্যে পরবর্তীতে কিছু লোকের অন্ধ অনুসরণ এর অন্যতম কারণ।

৪। যাদের ফতোয়া দানের যোগ্যতা নেই তাদের ফতোয়ার ফলে এ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে।

এ সকল কারণে লোকেরা সুন্নত ত্যাগ করেছে এবং ভুল জিনিস আঁকড়ে ধরে আছে।

মাজহাব কিংবা মাজহাবের ইমামদের কোন দোষ নেই। তারা সহীহ হাদীস গ্রহণের তাকিদ দিয়ে গেছেন এবং সহীহ হাদীস বিরোধী হলে নিজেদের প্রদত্ত মাসলাগুলো ত্যাগ করার আদেশ দিয়েছেন। এখন সকল দায়-দায়িত্ব মোকাল্লেদ বা অনুসারীদের।

আমি এ বইতে, হাদীসের আলোকে নামাযের ৭৬টি, জুমু'আর নামাযের ৭টি এবং অযূ গোসলের ১৮টি প্রচলিত ভুলের সংশোধন উল্লেখ করেছি। এ বইটি প্রতিটি মুসলমানের জন্য খুবই মূল্যবান। আল্লাহর কাছে আমলের তওফীক কামনা করি। আমিন!

এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম
বাংলা বিভাগ, রেডিও জেদ্দা
সৌদী আরব।
১৪/২/১৪২২ হিঃ
৮/৫/২০০১ খ্রীঃ

রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নামাযের আলোকে প্রচলিত ৭৬টি ভুল সংশোধন

(১) **নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা ঃ** নবী করীম (সঃ) তা করেন নি। নিয়ত হচ্ছে মনের ব্যাপার, মন থেকেই তা করতে হয়। এটা মুখের বিষয় নয়। মুখে উচ্চারণ করলে সেটা আর নিয়ত থাকে না। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) বলেছেন, মুখে নিয়তের উচ্চারণ দ্বারা দ্বীনের ক্ষতি হয়। কেননা, এটা বেদআত। তাই অযূ, গোসল, নামায, রোযা ইত্যাদি এবাদতে নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা যাবে না। এ কাজ যদি ভাল ও সওয়াব হত, তাহলে আমাদের পূর্বসূরীরা এ কাজ নিজেরা করতেন এবং অন্যদেরকে করার জন্য বলতেন। এটাকে যদি আমরা হেদায়েতের অংশ মনে করি, তাহলে নাউজুবিল্লাহ, তারা এ বিষয়ে হেদায়াত লাভ করেন নি, বরং গোমরাহ হয়েছেন। আর তারা যা করেছেন সেটা যদি হেদায়েত হয়, তাহলে হেদায়েতের পরে আর কি কথা? সেটা গোমরাহী বই কি। মহানবী (সঃ) সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈ ও তাবয়ে তাবেঈরা মুখে নিয়ত উচ্চারণ করেন নি। শুধু মনেই মনে নিয়ত করেছেন। তাঁরা শুধু হজ্জের এহরামের সময় মুখে নিয়ত উচ্চারণ করেছেন।

(২) **মসজিদে নামায পড়ার সময় মুসল্লীর জোরে কেরাত, জিকির ও দো'আ পাঠ করা ঃ** ইমাম শুধু জোরে কেরাত পড়বেন। মুসল্লীরা গোপনে পড়বেন। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ তোমরা নামাযে আল্লাহর সাথে কানাঘুষা করে থাক। তাই জোরে কোরআন পড়বে না এবং মোমেনদেরকে কষ্ট দেবে না। (বাগওয়ী)

নবী করীম (সঃ) এক রাত্রে ঘর থেকে বের হন। তিনি হযরত আবু বকরকে নিম্নস্বরে এবং হযরত ওমর (রাঃ)-কে জোরে কেরাত পড়তে দেখেন। পরে তারা দু'জন নবী (সঃ)-এর সাথে মিলিত হন। তিনি বলেন ঃ হে আবু বকর! আমি আপনার কাছ দিয়ে অতিক্রমের সময় আপনাকে নিম্নস্বরে কেরাত পড়তে দেখলাম। আবু বকর বলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল, আমি যাঁর সাথে গোপনে কাকুতি-মিনতি করেছি, তাঁকে তো শুনিয়েছি। তিনি ওমরকে বলেন, তুমি জোরে শব্দ করে নামায পড়ছিলে। ওমর বলেন ঃ জোরে পড়ার উদ্দেশ্য হল তন্দ্রা দূর করা এবং শয়তান তাড়ানো। তখন নবী (সঃ) বলেন ঃ হে আবু বকর, আপনি একটু শব্দ করে পড়বেন এবং ওমরকে বলেন, আপনি একটু ছোট আওয়াজে পড়বেন।

সৌদী আরবের পরলোকগত মুফতী জেনারেল শেখ আবদুল আযীয বিন বাজকে নামাযের জামা'আতে মুসল্লীদের শব্দ করে কেরাত ও দো'আ-জিকরের

ব্যাপারে প্রশ্ন করায় তিনি উত্তর দেন, মোক্তাদীর জন্য সুন্নত পদ্ধতি হল গোপনে কেরাত, দো'আ ও জিকর করা। কেননা, তা প্রকাশ্যে পড়ার পক্ষে কোন প্রমাণ নেই বরং শব্দ করে পড়লে পাশের মুসল্লীদের অসুবিধে হবে। (সাপ্তাহিক আদদাওয়া পত্রিকার প্রশ্নোত্তর)

(৩) দেয়াল কিংবা খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়া ঃ শেখ আবদুল আযীয বিন বাজ বলেছেন, ফরজ নামাযে এরূপ করা জায়েয নেই। কেননা, সক্ষম ব্যক্তির সোজা হয়ে দাঁড়ান ফরজ। তবে নফল নামাযে তা করা জায়েয। কেননা, সক্ষম ব্যক্তির জন্য নফল নামায বসে বসে পড়াও জায়েয। তবে দাঁড়িয়ে ও হেলান দিয়ে পড়া বসে পড়া অপেক্ষা উত্তম।

(৪) একাধিক আয়াতকে একসাথে মিলিয়ে পড়া ঃ সুন্নত পদ্ধতি হল, এক এক আয়াত করে পড়া। উম্মে সালমা (রাঃ)-কে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কেরাত পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি উত্তরে বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) এক এক আয়াত করে পড়তেন। তিনি এভাবে পড়েছেন ঃ বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। আররাহ্‌মানির রাহীম। মালিকি ইয়াওমিদ্দীন। (আবু দাউদ, তিরমিজী, দারু কুতনী, তিনি হাদীসের সনদকে সহীহ্ ও নির্ভরযোগ্য হাদীস বলেছেন। হাকেম বলেছেন, বোখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী হওয়ায় এটি সহীহ্। আল্লামা জাহাবীও একই মত পোষণ করেন। ইবনু খোজাইমা এবং ইমাম নওয়ীও একে সহীহ্ বলেছেন।)

আল্লামা ইবনুল কাইয়েম উপরোল্লিখিত হাদীসটি উল্লেখের পর বলেছেন, ইমাম যোহ্‌রী বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এক এক আয়াত করে পড়েছেন। আর এ পদ্ধতিই উত্তম। যদিও আগের আয়াত পরের আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট। কোন কোন কারী উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূরণের ভিত্তিতে আয়াতের শেষে ওয়াক্‌ফের কথা বলেছেন। কিন্তু নবী করীম (সঃ)-এর অনুসরণই সর্বোত্তম হেদায়াত। ইমাম বায়হাকীও এই মত পোষণ করেন।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, প্রত্যেক আয়াতের শেষে ওয়াক্‌ফ করা সুন্নত। যদিও পরবর্তী আয়াত আগের আয়াতের সাথে বাক্য গঠনের দিক থেকে কিংবা বিশেষ্য-বিশেষণ হওয়ার প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট।

(৫) কেয়াম ও বসার সময় পিঠ সোজা না করা ঃ দেখা যায় কোন সময় ডানে বা বামে কিংবা বাঁকা হয়ে দাঁড়ায় বা বসে। এটা নিষিদ্ধ। পিঠ সোজা রাখতে হবে। নবী করীম (সঃ) বলেছেন ঃ 'আল্লাহ্ সে বান্দাহ্‌র নামাযের দিকে তাকান না, যে রুকু ও সাজদায় পিঠ সোজা করে না।' –(আহমদ, তাবরানী)

নবী করীম (সঃ) ভুল নামায আদায়কারীকে বলেছিলেন ঃ 'তারপর তুমি মাথা তুলে এমনভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াবে যেন হাড় তার নিজ নিজ অবস্থানে থাকে।' অন্য এক বর্ণনায় এসেছে 'তুমি মাথা তুলে এমনভাবে দাঁড়াবে যেন হাড়গলো নিজ নিজ জোড়ার দিকে ফিরে যায়। কেউ এরূপ না করলে তার নামায পরিপূর্ণ হবে না।'

(৬) রুকু ও সাজদায় পিঠ সোজা না করা ঃ একবার নবী করীম (সঃ) নামায পড়ার সময় আড় চোখে এক ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে দেখেন যে, সে রুকু ও সাজদায় নিজ পিঠ সোজা করে নি। নামায শেষ করে তিনি বলেন ঃ 'হে মুসলমান সম্প্রদায়! যে ব্যক্তি রুকু ও সাজদায় পিঠ সোজা না করবে তার নামায হবে না।' (ইবনু আবি শায়বা, আহমদ, ইবনু মাজাহ)

নবী করীম (সঃ) আরো বলেছেন, নামায– চুরি সর্বাধিক নিকৃষ্ট কাজ। লোকেরা প্রশ্ন করল, নামায কিভাবে চুরি করে? তিনি বলেন, ঠিকমত রুকু ও সাজদা না করার নাম নামায– চুরি।' (ইবনু আবি শায়বা, তাবরানী, হাকেম, আল্লামা জাহাবী একে সহীহ বলেছেন) এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পিঠ সোজা করার মানে কি? উত্তর, নবী করীম (সঃ) যখন রুকুতে যেতেন তখন পিঠ সমানভাবে বিছিয়ে দিতেন। (বায়হাকী সহীহ সনদ সহকারে বর্ণনা করেছে।)

রসূলুল্লাহ (সঃ) রুকুতে এমনভাবে পিঠ বিছিয়ে দিতেন যে, পিঠের উপর পানি ঢাললে তা স্থিতিশীল থাকত। – (ইবনু মাজাহ, তাবরানী)

তিনি ভুল নামায আদায়কারীকে বলেছিলেন ঃ রুকুতে গেলে দু'হাতের কব্জি দু'হাঁটুতে রাখবে, তোমার পিঠকে সম্প্রসারিত করবে এবং রুকুর জন্য অর্থাৎ ঝুঁকে যাওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করবে। (আহমদ, আবু দাউদ)

তিনি রুকুতে গেলে মাথাকে পিঠ থেকে উপরের দিকেও রাখতেন না এবং নিচের দিকেও বেশি ঝুঁকাতেন না।

(৭) দুই সাজদার মাঝখানে আঙ্গুল না নাড়ানো ঃ এটা ঠিক নয়। 'নবী করীম (সঃ) দুই সাজদার মাঝে শাহাদত আঙ্গুলী দিয়ে ইশারা করতেন বলে মোসনাদে আহমদের ৪র্থ খণ্ডের ২১০ পৃষ্ঠায় একটি হাদীস বর্ণিত আছে।' এটা হল দু' সাজদার মাঝের জলসা। (হেদায়াতুন নাবী, ৭৫ পৃঃ)

(৮) ইমাম সাজদায় থাকলে মাথা তোলা পর্যন্ত এবং বসা থাকলে দাঁড়ানো পর্যন্ত অপেক্ষা করা ভুল ঃ বিশুদ্ধ পদ্ধতি হল, ইমাম রুকু, সাজদা, দাঁড়ান কিংবা বসা যে অবস্থায়ই থাক না কেন সর্বাবস্থায় অনতিবিলম্বে নামাযে শামিল হওয়া এবং দেরী না করা। কাতাদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'তোমরা নামাযের জন্য আসলে প্রশান্তিসহকারে আসবে,

(সঃ) বলেছেন ঃ 'তোমরা নামাযের জন্য আসলে প্রশান্তিসহকারে আসবে, যতটুকু নামায পাবে ততটুকু পড়বে এবং যতটুকু পাওয়া যায়নি ততটুকু পরিপূর্ণ করবে।' – (বোখারী)

ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ) ফতহুল বারী গ্রন্থে লিখেছেন, উপরোক্ত হাদীসের মাধ্যমে যা বুঝা যায়, তাহলো ইমামকে যে অবস্থাতেই পাওয়া যায় দেরী না করে সাথে সাথে সে অবস্থায় নামাযে শরীক হওয়া দরকার। আবদুল আযীয বিন রাফী এক আনসারী সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (সঃ) বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি আমাকে রুকু, সাজদা বা দাঁড়ানো অবস্থায় পাবে সে যেন সে অবস্থায়ই আমার সাথে নামাযে শরীক হয়।' (ইবনু আবি শায়বা)

(৯) সাজদায় ৭টি অঙ্গকে ঠিকমত না রাখা ঃ আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সঃ)-কে সাত অঙ্গে সাজদা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ সময় যেন কেউ চুল কিংবা কাপড় ধরে না রাখে। সে সাত অঙ্গ হল ঃ কপাল, দু'হাত, দু'পা ও দু' হাঁটু।

ইবনে আব্বাস থেকে আরেক বর্ণনায় এসেছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন ঃ 'আমাকে ৭টি অঙ্গে সাজদার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তিনি হাত দিয়ে নিজ নাক, দু'হাত, দু'হাটু ও পায়ের আঙ্গুলের প্রতি ইশারা করে দেখান এবং বলেন, এ সময় যেন আমরা কাপড় ও চুল টানাটানি না করি।' – (বোখারী)

এ হাদীস থেকে জানা গেল (ক) যারা সাজদায় দু'পা জমীন থেকে সামান্য উপরে তোলে, কিংবা এক পা অন্য পায়ের উপর রাখে তাদের সাত অঙ্গে সাজদা হয় না। সাজদার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পা উপরে রাখলে তার নামায হবে না। কেননা, সে নামাযের একটি অঙ্গ ত্যাগ করেছে। পা একবার মাটিতে রেখে পরে তুললে নামায হবে, তবে এরূপ করা ঠিক নয়। –(ফতোয়া সাদীয়াহ, ১৪৭ পৃঃ) (খ) কারো কারো সাজদার সময় নাক মাটিতে লাগে, কপাল লাগে না। তাদের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য।

(১০) কুকুরের মত দুই উরু দাঁড় করে নিতম্বের উপর বসা ঃ এভাবে বসা নিষেধ। কিন্তু দুই সাজদার মাঝে বসার ব্যাপারে মতভেদ আছে। মুসলিম শরীফে তাউস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা আবদুল্লাহ বিন আব্বাসকে দুই পায়ের পাতা দাঁড় করে বসার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করায় তিনি উত্তর দেন, এটা মহানবী (সঃ)-এর সুন্নত। শুধু দুই সাজদার মাঝে সংক্ষিপ্ত বৈঠকে তা বৈধ। ইবনে আব্বাসের ব্যাখ্যা হল, নিতম্বের সাথে পায়ের গোড়ালী মিলবে। অপরদিকে, নিতম্ব মাটিতে বিছিয়ে দুই পা দাঁড় করানো এবং দুই হাত মাটিতে রাখা, এটাই কুকুরের মত বসা। আর হাদীসে এটাকেই নিষেধ করা হয়েছে।

আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার বন্ধু নবী করীম (সঃ) আমাকে তিনটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন। ১. মোরগের মত সাজদায় ঠোঁকর মারা অর্থাৎ তাড়াহুড়া করে সাজদা করা। ২. কুকুরের মত বসা এবং ৩. শিয়ালের মত এদিক-ওদিক উঁকি-ঝুঁকি মারা। (আহমদ, আবু ইয়ালী)

এ বর্ণনা দ্বারা বুঝা গেল, দুই সাজদার মাঝে বসার পদ্ধতি দুই রকম। ১. বাম পা বিছিয়ে দিয়ে ডান পা দাঁড় করানো। এটাই নবী করীম (সঃ)-এর প্রসিদ্ধ সুন্নত। অন্যান্য সকল বৈঠকে এভাবেই বসার নিয়ম। ২. দুই পায়ের গোড়ালীর উপর দুই নিতম্ব রেখে বসা।

নামাযে এদিক-ওদিক ঝুঁকে যাওয়া কিংবা বিনা প্রয়োজনে আগে-পিছে যাওয়া অনাকাঙ্ক্ষিত কাজ, এটা নামাযের বিনয় বা খুশুর খেলাপ। ইবনে আওন বলেছেন, মুসলিম বিন ইয়াসার নামক প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন ও ইমাম নামাযে এমনভাবে দাঁড়াতেন যেন তাকে কোন কিছুর সাথে পেরেক মেরে সোজা করে রাখা হয়েছে। তিনি মোটেও নড়াচড়া করতেন না।[১]

(১১) প্রথম জাম'আত না পেলে দ্বিতীয় জাম'আত না করা এবং লোক থাকা সত্ত্বেও জাম'আত ছাড়া একাকী নামায পড়া ভুল। কেননা, জাম'আতে নামায পড়ার ব্যাপারে অধিকাংশের মত হল তা ফরজ। একমাত্র হানাফী মাজহাবে এটাকে ওয়াজিবের কাছাকাছি সুন্নতে মোআক্কাদা বলা হয়েছে। এর নিচে আর কেউ বলেনি। কোন ফরজ বা ওয়াজিব ছুটে গেলে সময় থাকলে অবশ্যই সে সময়ের ভেতর তা আদায়ের চেষ্টা করতে হবে।

'আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক ব্যক্তিকে একা নামায পড়তে দেখে বলেন ঃ 'এমন কে আছে, যে এ ব্যক্তির জন্য সদকার নিমিত্ত তার সাথে নামায পড়বে ?' (আবু দাউদ– 'একই মসজিদে দ্বিতীয়বার জামাতে নামায আদায়' অধ্যায়)

তিরমিজী শরীফে 'যে মসজিদে একবার জামাত হয়েছে সে মসজিদে দ্বিতীয়বার জামাত অনুষ্ঠান' অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, 'যখন নবী করীম (সঃ)-এর নামায শেষ হল, তখন এক ব্যক্তি আসল। তিনি বলেন ঃ 'কে আছে এমন যে তার সাথে ব্যবসা করবে ?' তখন এক ব্যক্তি দাঁড়াল ও তার সাথে নামায আদায় করল।'

এ দুটো হাদীস দ্বারা একই মসজিদে ২য় জামাতের পরিস্কার প্রমাণ মিলে। কোন কারণে একাধিক লোকের একই নামায কাজা হলে তাও জাম'আত সহকারে পড়ার বিধান রয়েছে। এমনকি, সুন্নতে মোআক্কাদা নামায ফরজের আগে পড়তে না পারলে জাম'আতের পর পুনরায় তা পড়ে নিতে হয়।

---

১. তাহজীব আত-তাহজীব।

যারা মসজিদে ২য় জাম'আত দ্বারা ১ম জাম'আতের গুরুত্ব কমে যায় এ যুক্তিতে ২য় জাম'আত করেন না, তাদের এ যুক্তি খুবই দুর্বল। এ দুর্বল যুক্তি দ্বারা কোরআন ও হাদীসের অকাট্য প্রমাণসমূহ বাতিল হতে পারে না।** নামায জাম'আতে পড়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কয়েকটা প্রমাণ পেশ করছি।

আল্লাহ বলেন ঃ اَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَاٰتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ـ

"তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।" (সূরা বাকারা ৪৩)

এ আয়াতে একদিকে নামায কায়েম এবং অন্যদিকে রুকুকারীদের সাথে রুকু আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নামায কায়েমের মধ্যে জাম'আতে নামাযও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ 'রুকুকারীদের সাথে রুকু কর' এ আয়াত পরিস্কার জাম'আতে নামায আদায়ের নির্দেশ দিচ্ছে। জাম'আত ছাড়া একই সাথে 'রুকুকারীদের সাথে রুকু আদায়ের' আর কোন ব্যবস্থা হতে পারে না।

সূরা নেসার ১০২ নং আয়াতে যুদ্ধকালীন নামাযের পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া হয়েছে। ঐ কঠিন মুহূর্তেও জাম'আতসহকারে নামায পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যুদ্ধের সময়ে যদি জাম'আতসহকারে নামায আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়, তাহলে শান্তির সময় জাম'আতের আদেশ আরো জোরদার হবে।

শুধু তাই নয়, কোন কারণে কেউ জাম'আত না পেলে কোন সুন্নত ও নফল আদায়কারীর পেছনে দাঁড়িয়ে ফরজ নামায জাম'আতসহকারে পড়তে পারে। এ মাসলা বোখারী ও মুসলিম এ দু'টো হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ আছে। সাহাবী মোআ'জ (রাঃ) নবী করীম (সঃ)-এর সাথে এশার নামায জামাতে পড়ে পরে নিজ পল্লীতে এসে অন্যান্য মুসল্লীদের এশার জামা'আতের ইমামতির ঘটনা খোদ বোখারী শরীফেই বর্ণিত আছে। তাই ২য় জাম'আত হোক বা ৩য় জাম'আত হোক, নামায অবশ্যই জাম'আতে পড়তে হবে।

এমনকি ঘরে এসে স্ত্রীর সাথে হলেও জাম'আতে নামায পড়তে হবে। তাই দ্বিতীয় জাম'আতকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

(১২) মুসল্লীর প্রথম তাশাহহুদ শেষ হয়ে গেলে তখনও যদি ইমামের তাশাহহুদ শেষ না হয় বরং ইমাম তখনও বসা– এমতাবস্থায় তাশাহ্‌হুদের পুনরাবৃত্তি করা ঠিক নয়। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমরা যখন প্রত্যেক দুই রাকাত শেষে বস, তখন তাশাহহুদ অর্থাৎ আত্তাহিয়্যাতু ... আবদুহু ওয়া রসূলুহু পর্যন্ত পড় এবং যেকোন ভাল দোআ নির্বাচন করে তা পড়। (নাসাঈ, আহমদ, তাবরানী) আল্লামা নাসেরুদ্দিন আলবানীও দোআ পড়ার পক্ষে রায় দিয়েছেন।

** সৌদী আরবের সকল মসজিদে ২য় জাম'আত অনুমোদিত।

(১৩) নামাযে ইমামের আগে আগে কাজ করা ঃ এটা বিরাট ভুল। এ ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'তোমাদের কেউ কি আল্লাহকে ভয় করে না? ইমামের আগে কেউ মাথা তুললে আল্লাহ তার মাথাকে গাধার মাথা কিংবা তার চেহারাকে গাধার চেহারায় রূপান্তরিত করবেন।' – (বোখারী)

ইমামের সাথে নামায পড়ার ব্যাপারে চারটি অবস্থা হতে পারে। এর মধ্যে তিনটি নিষিদ্ধ এবং একটি আদিষ্ট। চারটি অবস্থা হল ঃ

১. مُسَابَقَةٌ (মোসাবাকা) ঃ ইমামের আগে আগে রুকু-সাজদাসহ বিভিন্ন কাজ করা।

২. مُوَافَقَةٌ (মোআফাকা) ঃ মোটেও দেরী না করে ইমামের সাথে সাথে রুকু-সাজদাসহ বিভিন্ন কাজ করা।

৩. مُتَابَعَةٌ (মাতাবাআ) ঃ ইমাম কোন কাজ করলে এর সামান্য পরে সে কাজটি করা।

৪. مُخَالَفَةٌ (মোখালাফা) ঃ ইমাম কোন কাজ শেষ করেছেন। তা সত্ত্বেও বেশ দেরী করে সে কাজটি করা। এর মধ্যে কেবল ৩নং متابعة (মোতাবাআ) কাজটি করার জন্য আমরা আদিষ্ট। বাকি তিনটি কাজ ইমামের অনুসরণের খেলাপ। একটি অগ্রগামীতা, একটি পশ্চাদগামীতা, একটি সাথে সাথে করা। কেবল ইমামের অনুসরণ কাম্য।

ইমামের অনুসরণের ব্যাপারে আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ পূর্ণ অনুসরণের ভিত্তিতে নামায পরিপূর্ণ করার জন্য ইমাম নির্ধারণ করা হয়েছে। তোমরা ইমামের বরখেলাপ করবে না। ইমাম তাকবীর বললে তোমরাও তাকবীর বলবে এবং রুকু করলে রুকু করবে, তিনি যখন سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলবেন, তোমরা رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলবে এবং তিনি যখন সাজদা করবেন তখন তোমরাও সাজদা করবে।'

– (বোখারী, মুসলিম, আহমদ,আবু দাউদ)

এ হাদীসে ইমামের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ কোন কিছুতে ইমামের অগ্রগামীতা বা পশ্চাতগামীতা অথবা বরখেলাপী করা নিষিদ্ধ। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন ঃ 'হে লোকেরা! আমি তোমাদের ইমাম, তোমরা রুকু, সাজদা, কেয়াম, বৈঠক ও সালাম ফিরানোর সময় আমার অগ্রগামী হবে না।' – (মুসলিম, আহমদ)

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ ইমামের অনুসরণের মাধ্যমে নামাযকে পূর্ণ করার জন্য ইমাম নির্ধারণ করা হয়েছে। তাই ইমাম রুকুতে যাওয়ার আগে তোমরা রুকুতে যাবে না এবং ইমাম উঠার আগে তোমরা উঠবে না।' – (বোখারী)

এ হাদীসগুলোতে অগ্রগামীতা ও পশ্চাদগামীতা ব্যতিরেকে ইমামের যথার্থ অনুসরণের কথা বলা হয়েছে।

(১৪) দ্রুত মসজিদে যাওয়া ঃ বিশেষ করে ইমাম রুকুতে যাওয়ার পূর্ব সন্দিক্ষণে তাড়াহুড়া করে নামাযে শামিল হওয়ার চেষ্টা করা। এ জাতীয় তাড়াহুড়া নিষিদ্ধ। আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'যখন নামাযের একামত দেয়া হয় তখন দৌড়ে এসোনা, বরং স্বাভাবিকভাবে হেঁটে আস, ধীরে-সুস্থে আস; যতটুকু নামায পাও ততটুকু পড়, আর যতটুকু পাওনি তা পূর্ণ কর।'

– (বোখারী, মুসলিম, আহমদ, ও অন্য চারটি বিশুদ্ধ হাদীসগ্রন্থ)

ধীরে-সুস্থে এবং তাড়াহুড়া না করে নামাযে যোগদান কাম্য। তাড়াহুড়া করে নামাযে আসলে জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে হয়। কিন্তু স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস সহকারে এবং দ্রুততা পরিহার করে নামাযে শরীক হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এ মর্মে আরেকটি হাদীস বর্ণিত আছে। আবু বাকরাহ্ সাকাফী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি যখন মসজিদে পৌঁছলেন তখন নবী করীম (সঃ) রুকু অবস্থায় ছিলেন। তিনি নামাযের কাতারে শামিল না হয়ে কাতারের বাইরেই রুকুতে শামিল হলেন। তিনি নবী করীম (সঃ)-কে একথা জানান। নবী করীম (সঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তোমার আগ্রহ বৃদ্ধি করুন, তবে আর এরূপ করবে না।' – (বোখারী)

ইবনে হাজার আসকালানী হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'আর এরূপ করবে না' এর অর্থ হল, তুমি যেভাবে দ্রুত এসেছ, কাতারবিহীন রুকুতে শামিল হয়েছ, তারপর কাতারে শরীক হয়েছ' আর এরূপ করবে না।

আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ তোমরা যখন একামত শুনবে, তখন নামাযের উদ্দেশ্যে রওনা হবে, তবে শান্তভাবে ও সম্মানের সাথে চলবে, তাড়াহুড়া করবে না, যে পরিমাণ নামায পাবে তা পড়বে এবং যে পরিমাণ পাবে না সে পরিমাণ পূর্ণ করবে।' – (বোখারী)

এ হাদীসগুলোতে নামাযের একামতের সময় তাড়াহুড়া না করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু অন্য আরেক বর্ণনায় নামাযের কথাও এসেছে, 'তোমরা যখন নামাযের জন্য রওনা হবে'। তাই তাড়াহুড়া নামায এবং একামত দু' অবস্থায়ই নিষিদ্ধ।

ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ) বলেছেন ঃ একামতের সময় তাড়াহুড়া করে না আসার একটি হেকমত হল, তাড়াহুড়া করে আসলে এবং নামাযে

শরীক হলে বিনয় ও খুশু আসবে না। বরং যে আগে আসবে তার মনে সে খুশু বিদ্যমান থাকবে।

অন্য আরেক হাদীসে তাড়াহুড়া না করার আরেকটি হেকমত উল্লেখ আছে। আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত। আগে বর্ণিত হাদীসের শেষে উল্লেখ আছে ঃ তোমাদের কেউ নামাযের ইচ্ছা পোষণ করে রওনা হলে সে নামাযের মধ্যেই বিবেচিত হবে। – (মুসলিম) অর্থাৎ তার হুকুম মুসল্লীর হুকুমের মতই। তাই মুসল্লীর যা করণীয় ও বর্জনীয় তারও তা করণীয় ও বর্জনীয়। অর্থাৎ তাড়াহুড়া বর্জনীয়।

ইমাম ইবনে তাইমিয়াকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আল্লাহ কোরআন মজীদে বলেন ঃ 'হে ঈমানদারগণ, যখন শুক্রবারে তোমাদেরকে জুম'আর নামাযের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহ্‌র স্মরণ ও জিকরের দিকে দ্রুত ধাবিত হও।' এ আয়াতে فَاسْعَوْا শব্দের অর্থ হচ্ছে দ্রুত ধাবিত হও। এ শব্দের ভিত্তিতে নামাযের জন্য তাড়াহুড়া করার বিধান রয়েছে। ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন ঃ এ আয়াতে سَعْيٌ শব্দের অর্থ দৌড়-ঝাঁপ করা নয়। বরং উপরোল্লিখিত হাদীসে, ধীরে সুস্থে আসাকেই এর অর্থ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। বিভিন্ন ইমামগণ বলেছেন ঃ কোরআনে سَعْيٌ শব্দের অর্থ হল, কাজ করা ও কর্ম তৎপর হওয়া। অর্থাৎ আজান শুনার পর নামাযের প্রস্তুতি নেয়া, দ্রুততা বা তাড়াহুড়া নয়। যেমন, কোরআনের অন্য আয়াতেও এ শব্দটি কাজ-কর্মের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوْرًا ـ

"যে ব্যক্তি আখেরাতের ইচ্ছা করে, সেজন্য আমল করে এবং সে যদি মোমেন হয় তাহলে তাদের আমল ও চেষ্টা-তৎপরতার যথার্থ মূল্যায়ন হবে।"

আল্লাহ আরো বলেন, اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى 'নিশ্চয়ই তোমাদের তৎপরতা ভিন্ন ভিন্ন।'

আল্লাহ আরো বলেন ঃ

اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا

'যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং জমীনে ফেতনা-ফাসাদের চেষ্টা করে তাদের শাস্তি হল ...।

উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহে سَعْىٌ শব্দের অর্থ হল কাজ ও তৎপরতা, তাড়াহুড়া কিংবা দ্রুততা নয়। এ সকল আয়াত দ্বারা উল্লেখিত প্রশ্নের সমাধান হয়েছে।

এছাড়াও হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) আয়াতটি নিম্নোক্তভাবে পড়েছেনঃ فَامْضُوا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ অর্থাৎ 'আল্লাহর জিকরের তথা নামাযের উদ্দেশ্যে রওনা কর।' ইবনে তাইমিয়ার জবাব এখানেই শেষ।

ইবনে হাজম তাঁর 'মোহাল্লা' গ্রন্থে আবু জার (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ কেউ নামাযের উদ্দেশ্যে রওনা হলে রাস্তায় থাকা অবস্থায় নামাযের একামত হলে সে যেন তাড়াহুড়া না করে এবং আগের চলার গতি অপেক্ষা যেন দ্রুত না চলে। বরং যতটুকু ইমামের সাথে পাবে ততটুকু পড়বে এবং যতটুকু না পাবে ততটুকু পূর্ণ করে নেবে।

সুফিয়ান বিন যিয়াদ থেকে বর্ণিত। যোবায়ের বিন আওয়াম তাকে রাস্তায় দ্রুত চলতে দেখে বলেন ঃ পরিমিত গতিতে চল, তুমি নামাযের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, প্রতিটা পদক্ষেপে আল্লাহ তোমার একটি মর্যাদা বাড়াবেন অথবা একটি গুনাহ্‌ মাফ করে দেবেন।

(১৫) ভালভাবে কাতার সোজা না করা ঃ বহু মুসল্লী নামাযের কাতার সোজা করে না এবং নিজেদের পরস্পরের মধ্যকার ফাঁক বন্ধ করে না। এটা বিরাট ভুল। নোমান বিন বশীর থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'তোমরা হয় নিজেদের কাতার ঠিক কর, না হয়, আল্লাহ তোমাদের মনে ব্যবধান সৃষ্টি করে দেবেন।' -(বোখারী) মহানবী (সঃ) আরো বলেন ঃ 'তোমরা কাতার ঠিক কর এবং গায়ে গায়ে লেগে দাঁড়াও।' - (বোখারী) নবী করীম (সঃ) আরো বলেন ঃ 'নামাযের কাতার ঠিক কর, কাতার ঠিক করা নামাযের সৌন্দর্যের অংশ।' - (বোখারী)**

ইমাম বোখারী 'কাতার সোজা না করলে গুনাহ হবে' এ শিরোনামে এক অধ্যায়ে বাশীর বিন ইয়াসার আনসারী থেকে বর্ণনা করেছেন। আনাস বিন মালেক যখন মদীনায় আসেন তখন তাঁকে বলা হল, আপনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সময় থেকে এ পর্যন্ত আমাদের কোন ত্রুটির কথা বলেননি। তিনি বলেন, আমি আপনাদের একটা বিষয় ছাড়া আর কোন জিনিসকে খারাপ জানিনা। সেটা হল, আপনারা নামাযের কাতার সোজা করেন না।

** নবী (সঃ) আরো বলেন, 'তোমরা কাতার ঠিক কর, কাতার ঠিক করা নামায কায়েমেরই অংশ।' - (বোখারী)

কোন কোন ওলামায়ে কেরাম বলেছেন ঃ উপরে বর্ণিত নোমান বিন বশীরের হাদীসে 'মনের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি' দ্বারা বুঝা যায়, কাতারের মত বাহ্যিক কাজ মনের মত গোপন জিনিসের উপর প্রভাব বিস্তার করে। কাতার সোজা না করলে তা মনের সম্পর্কে বাধা সৃষ্টি করে।

কাতার সোজা করার ব্যাপারে আবদুল্লাহ বিন ওমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি কাতার ঠিক করে এবং গায়ে গায়ে মিলিত হয়, আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক রাখেন। আর যে ব্যক্তি কাতার ঠিক করে না এবং ফাঁক রাখে, আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

– (নাসাঈ, হাকেম)

(১৬) কাঁচা রসুন-পেঁয়াজ খেয়ে মসজিদে আসা ঃ এ মর্মে আবদুল্লাহ বিন ওমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সঃ) বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি এ গাছ (রসুন) খায়, সে যেন আমাদের মসজিদের কাছে না আসে।' – (বোখারী) জাবের বিন আবদুল্লাহ থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'যে ব্যক্তি কাঁচা রসুন ও পেঁয়াজ খায়, সে যেন আমাদের থেকে দূরে থাকে কিংবা সে যেন আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে এবং নিজ ঘরে বসে থাকে।' – (বোখারী)

হযরত আনাসের এক বর্ণনায় এসেছে, 'যে ব্যক্তি এ গাছ খায়, সে যেন আমাদের কাছে না আসে, অর্থাৎ সে যেন আমাদের সাথে নামায না পড়ে।'

– (বোখারী)

হযরত ওমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। 'আমি নবী করীম (সঃ)-কে দেখেছি, তিনি যদি মসজিদে কারো মধ্যে এ দু'টোর গন্ধ পেতেন তাকে বাকী কবরস্থান পর্যন্ত পাঠিয়ে দেয়ার আদেশ দিতেন। কেউ যদি এ দু'টো খেতে চায় সে যেন রান্না করে খায়।' – (মুসলিম)

নবী করীম (সঃ) আরো বলেছেন ঃ 'আদম সন্তান যে সকল জিনিস দ্বারা কষ্ট পায় ফেরেশতারাও সে সকল জিনিস দ্বারা কষ্ট পায়।' – (মুসলিম)

দুর্গন্ধের কারণে কাঁচা রসুন-পেঁয়াজ খেয়ে মসজিদে যাওয়া নিষেধ। রান্না করে খেলে মুখে গন্ধ থাকে না। তখন মসজিদে গেলে কোন দোষ নেই।

(১৭) ধূমপান করার পর মসজিদে যাওয়া ঃ যে কারণে পেঁয়াজ-রসুন খেয়ে মসজিদে যাওয়া নিষেধ, সে কারণে ধূমপান করেও মসজিদে যাওয়া উচিত নয়। সে কারণটি হল মুখের দুর্গন্ধ। কোন কোন আলেমের মতে

ধূমপানের দুর্গন্ধের হুকুম কাঁচা রসুন-পেঁয়াজের হুকুম অপেক্ষা আরো বেশি মারাত্মক। হোজাইফা বিন ওসাইদ থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন ঃ

مَنْ أَذَى الْمُسْلِمِيْنَ فِىْ طُرُقِهِمْ - وَجَبَتْ عَلَيْهِمْ لَعْنَتُهُمْ -

'যে ব্যক্তি রাস্তায় মুসলমানদেরকে কষ্ট দেয়, তার উপর তাদের অভিশাপ জরুরী হয়ে যায়।' (তাবরানী, আবু নাঈম ও ইবনে আদী)

রাস্তায় কষ্টদানকারী যদি অভিশাপের উপযোগী হয় তাহলে, মসজিদে কষ্টদানকারীর অবস্থা কিরূপ হবে? অবশ্যই এটা বিরাট অপরাধ। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে হলে লেখকের 'ইসলামের দৃষ্টিতে ধূমপান ও গান-বাজনা' বইটি দ্রষ্টব্য।

মুনীর দামেস্কী বলেছেন, পেঁয়াজ-রসুনের উপকার সত্ত্বেও দুর্গন্ধের কারণে মসজিদে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। আর ধূমপানের ক্ষতি ছাড়া কোন উপকারই নেই এবং এর দুর্গন্ধ পেঁয়াজ-রসুন অপেক্ষা বেশি। তাই ধূমপানের পর মসজিদে যাওয়ার হুকুম আরো বেশি কঠিন।

(১৮) নামাযে এদিক-সেদিক দেখা ঃ বিনা প্রয়োজনে এদিক-সেদিক তাকানো যাবে না। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। 'আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে নামাযে এদিক-সেদিক দেখার ব্যাপারে প্রশ্ন করি। তিনি উত্তরে বলেন ঃ এটা হচ্ছে বান্দাহ্‌র নামায থেকে শয়তানের ছোঁ মারা।' – (বোখারী)

নবী করীম (সঃ) বলেছেন ঃ 'তোমরা যখন নামায পড়বে তখন এদিক-সেদিক দেখবে না। বান্দাহ যে পর্যন্ত নামাযে এদিক-সেদিক না তাকায় সে পর্যন্ত আল্লাহ্ নিজ চেহারা তার চেহারার দিকে নিবদ্ধ রাখেন।'

– (তিরমিজী, হাকেম)

আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত। 'নবী করীম (সঃ) নামাযে তিন জিনিস নিষেধ করেছেন। (১) মোরগের মত সাজদায় ঠোকর খাওয়া। (২) কুকুরের মত বসা এবং (৩) শিয়ালের মত এদিক-সেদিক তাকানো।'

– (আহমদ, আবু ইয়ালী)

আবু জার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন ঃ বান্দাহ্‌র নামাযের সময় আল্লাহ তার দিকে মুখ করে থাকেন যতক্ষণ না সে এদিক-সেদিক দেখে, যখন সে এদিক-সেদিক দেখে, আল্লাহ তার থেকে নিজ মুখ ফিরিয়ে নেন। – (আবু দাউদ)

কোন প্রয়োজন দেখা দিলে এদিক-সেদিক তাকানো যায়। এর প্রমাণ হল, বোখারী শরীফে বর্ণিত সহল বিন সা'দ আস-সায়েদীর হাদীস। 'নবী করীম (সঃ) বনি আমর বিন আওফ গোত্রে তাদের মধ্যে আপোষ-রফার জন্য গেলেন। নামাযের সময় হওয়ায় মোআজ্জিন এসে আবু বকর (রাঃ)-কে বলেন, আপনি যদি নামায পড়ান তাহলে আমি একামত দিতে পারি। আবু বকর (রাঃ) নামায পড়াতে লাগলেন। ইতিমধ্যে নবী করীম (সঃ) আসেন এবং কাতারের মধ্যে দাঁড়ান। লোকেরা হাত তালি দেয়। আবু বকর (রাঃ) নামাযে কখনও এদিক-সেদিক তাকাতেন না। লোকদের তালির পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় তিনি পেছন ফিরে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে কাতারে দেখেন। নবী করীম (সঃ) তাঁকে ইমামতির জন্য নিজ স্থানে অবস্থানের উদ্দেশ্যে হাত দিয়ে ইশারা করেন। ... হাদীসের শেষাংশে আছে, 'তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে হাতে তালি দিতে দেখলাম কেন? নামাযে ইমামের সংশোধনের প্রয়োজন অনুভব করলে তাসবীহ (সোবহানাল্লাহ) বলবে। তাসবীহ বললে তাসবীহর প্রতি খেয়াল করা হবে। আর হাতে তালি তো মহিলাদের জন্য।'

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন ঃ এ হাদীসে 'প্রয়োজন হলে এদিক-সেদিক তাকানো এবং মুসল্লী কর্তৃক কথা বলার চেয়ে হাতে ইশারা করা উত্তম' বলে জায়েয প্রমাণিত হয়।

(১৯) নামাযের ফরজ রোকনগুলো আদায়ে ইমামের তাড়াহুড়া ঃ রুকু ও সাজদাসহ বিভিন্ন রোকন এত তাড়াহুড়া করে আদায় করা যে, মুক্তাদীর পক্ষে তিনবার তাসবীহ পড়া সম্ভব হয় না বরং ইমামকে ধীরে সুস্থে ঐ রোকনগুলো আদায় করতে হবে যেন মুসল্লীরা তার পেছনে তা ঠিকমত অনুসরণ করতে পারে।

(২০) সামনের কাতারে জায়গা খালি থাকা সত্ত্বেও পেছনে আলাদা কাতার তৈরি করা ঃ এটা দুই কারণে করা হয়ে থাকে। তাড়াতাড়ি রুকু ধরা কিংবা অলসতার কারণে সামনে অগ্রসর না হওয়া। এর ফলে সামনের কাতারে ফাঁক থেকে যায়। কেননা, সে নিজে আলাদা আরেকটি কাতার তৈরি করেছে। বিচিত্র নয় যে, এরপর অন্য মুক্তাদীরাও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। তখন কাতারের দুই পাশ অপূর্ণ থাকবে। নিম্নের হাদীসের কারণে তা নাজায়েয। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি কাতার অপূর্ণ বা বিচ্ছিন্ন রাখে, আল্লাহ নিজেও তার সাথে বিচ্ছিন্ন থাকেন।' (আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ) নিম্নের হাদীসটিও এর সমর্থন করে। নবী করীম (সঃ) বলেছেন ঃ 'তোমরা কাতার ঠিক কর, নচেৎ আল্লাহ তোমাদের অন্তরে মতপার্থক্য সৃষ্টি করে দেবেন।' (আবু দাউদ, ইবনে হিব্বান) এর সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদীসটিও পেশ করা যায়।

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ لَاصَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ 'কাতারের পেছনে কোন ব্যক্তির একাকী নামায নেই।' (ইবনে খোজাইমা) এক্ষেত্রে যা করণীয় তা হল, ডান-বামে তাকিয়ে আরেকজন লোক পাওয়ার চেষ্টা করা। তবে সামনের কাতার থেকে লোক টেনে আনার ব্যাপারে বর্ণিত দু'টো হাদীসই দুর্বল। আল্লামা নাসেরুদ্দীন আলবানীর দুর্বল হাদীস সংকলনের ৯২১ নং ৯২২ নং হাদীসদ্বয় দ্রষ্টব্য। সামনের কাতার থেকে লোক টেনে আনলে কয়েকটা ক্ষতি হয়। ১. সামনের কাতারে ফাঁক সৃষ্টি হয়। যার কারণে কাতারে ফাঁক সৃষ্টি হল, হাদীসে আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন থাকে বলে উল্লেখ আছে। (আহমদ, আবু দাউদ) ২. লোক টানার ফলে কাতারের শূন্যতা পূরণের জন্য সকল মুসল্লীকে ব্যস্ত করে দেয়া হয়। ৩. ঐ মুসল্লীর নামাযের খুশু অর্থাৎ বিনয়কে বাধাগ্রস্ত করা হয় এবং তাকে সামনের কাতারের উত্তম ফজীলত ও মর্যাদা থেকে পেছনে অপেক্ষাকৃত কম মর্যাদাসম্পন্ন কাতারে আনা হয়। ৪. মাসয়ালা না জানা থাকলে কাউকে টেনে আনলে সে জোর করবে এবং পেছনের কাতারে আসতে চাইবে না। এতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। এ সকল সমস্যা থেকে বাঁচার জন্য শেখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) বলেছেন ঃ এমতাবস্থায় মুসল্লী পেছনে দাঁড়িয়ে একাকী জাম'আতে নামায আদায় করবে এবং তাতে কোন অসুবিধে নেই। ইনশাআল্লাহ।

(২১) সাজদায় দুই হাত ও উরুদ্বয় একসাথে মিলানো ঠিক নয় ঃ এক্ষেত্রে যা করণীয় তা হল, পেটকে উরু থেকে এবং দুই বাহুকে দুই পার্শ্বদেশ থেকে সাধ্যমত দূরে রাখতে হবে। তবে এক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করাও কাম্য নয়। যেমন, এমন করা উচিত নয় যে, পিঠকে বেশি সম্প্রসারিত করে দিয়ে নিজ মাথাকে সামনের কাতারে নিয়ে ঠেকানো। স্বাভাবিকভাবে সব কাজ করা উচিত।

(২২) চাদর কিংবা জামা মাটি পর্যন্ত ঝুলানো ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। 'রসূলুল্লাহ (সঃ) নামাযে শরীরের কাপড় ঝুলাতে নিষেধ করেছেন।' (আহমদ, তিরমিজী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ, হাকেম) অর্থাৎ এমনভাবে কাপড় ঝুলিয়ে দেয়া যে, কাপড়ের দুই পাশকে কাঁধের মধ্যে মিলানোর পরিবর্তে ছেড়ে দেয়া। ফলে তা মাটি স্পর্শ করে। হাত ভেতর থেকে বের করে রুকু-সাজদা করে। যেমন, চাদরের দুই পাশ দুই কাঁধে না রেখে ছেড়ে দেয়া। ফলে তা মাটি স্পর্শ করবেই। এভাবে কাঁধে কাপড় ঝুলিয়ে দেয়া ইহুদীদের কাজ। খাল্লাল তাঁর 'আল-এলাল' গ্রন্থে এবং আবু ওবায়েদ তাঁর 'আল-গরীব' গ্রন্থে আবদুর রহমান বিন সাঈদ বিন ওহাব থেকে বর্ণনা

করেছেন। একদিন হযরত আলী (রাঃ) বের হন। তিনি কিছু লোককে শরীরে কাপড় ঝুলিয়ে নামায পড়তে দেখে মন্তব্য করেন ঃ 'তারা যেন ইহুদীদের স্কুল থেকে বেরিয়ে এসেছে।'

(২৩) বুকের উপর হাত না বাঁধা ঃ বোখারী শরীফে সহল বিন সা'দ থেকে বর্ণিত। 'তিনি বলেন, লোকদেরকে নামাযে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।' মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে, 'নবী করীম (সঃ) বাম হাতের উপর ডান হাত রাখতেন।'

আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনু খোযায়মাহ বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সঃ) বুকের উপর দুই হাত রাখতেন।' হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ নবী করীম (সঃ) নিজ বুকের উপর দুই হাত রাখতেন। বাজ্জারও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আল্লামা মারওয়াজী মাসায়েল গ্রন্থে লিখেছেন, এসহাক বিন রাহওয়াই আমাদেরকে নিয়ে বিতরের নামায পড়েন। তিনি কুনুতে দুই হাত তুলতেন, রুকুর আগে কুনুত পড়তেন, তারপর দুই হাত নিজ দুধের উপর কিংবা দুধের নিচে রাখতেন।

ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, এটা হচ্ছে লজ্জিত প্রার্থনাকারীর রূপ যা বেহুদা কাজের উত্তম প্রতিরোধক এবং বিনয়ের সহায়ক। যারা নামাযে দুই হাত ছেড়ে দেয় কিংবা নাভীর নিচে বা উপরে হাত রাখে এবং যারা ঘাড়ে হাত রাখে এগুলোর কোনটাই ঠিক নয়। নাভীর নিচে হাত রাখার ব্যাপারে আহমদ ও আবু দাউদে হযরত আলী থেকে যে বর্ণনা এসেছে এর সনদ দুর্বল। তিনি বলেছেন, 'নাভীর নিচে এক হাতের কব্জীর উপর অন্য হাতের কব্জি রাখা সুন্নত।' এ বর্ণনায় আবদুর রহমান বিন এসহাক ওয়াসেতী দুর্বল রাবী। আল্লামা জাহাবী আবদুর রহমানের ব্যাপারে বলেছেন, মোহাদ্দেসীন কেরাম তাকে দুর্বল রাবী বলেছেন।

(২৪) একামতের পর কাতার সোজা করার জন্য না বলা ঃ নবী করীম (সঃ) নামাযের একামতের পর মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বাক্যে কাতার সোজা করার অনুরোধ জানাতেন, আমাদের দেশে একামত শেষ হবার আগেই অর্থাৎ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ বলার সাথে সাথেই ইমাম তাকবীরে তাহরীমা উচ্চারণ করে হাত বেঁধে ফেলেন। ফলে তাতে দু'টো ভুল হয়।

১. একামত সম্পন্ন হওয়ার পরই তাকবীরে তাহরীমা উচ্চারণ করে নামাযের সূচনা করতে হবে। অথচ, একামত অসম্পূর্ণ রেখে তাড়াহুড়া করে নামায শুরু করা সুন্নতের খেলাপ।

২. একামতের পর কাতার সোজা করার লক্ষ্যে নবী করীম (সঃ)-এর পদ্ধতির অনুসরণ না করা। তিনি একামতের পর বলতেন ঃ

اَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ وَتَرَاصُّوْا

'কাতার সোজা কর এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে দাঁড়াও।' – (বোখারী)

রসূলুল্লাহ (সঃ) আরো বলতেন ঃ

اَقِيْمُو الصَّفَّ فِي الصَّلاَةِ فَاِنَّ اِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلاَةِ

'তোমরা কাতার সোজা কর, নামাযের সৌন্দর্য হল কাতার সোজা করা।' – (বোখারী)

তিনি আরো বলতেন ঃ

سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَاِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ اِقَامَةِ الصَّلاَةِ

'কাতার সোজা কর, কাতার সোজা করা নামাযেরই অংশ।' – (বোখারী)

তিনি আরো বলতেন ঃ

اَحْسِنُوْا اِقَامَةَ الصُّفُوْفِ فِي الصَّلاَةِ

'নামাযে কাতার সুন্দর কর।' (মোসনাদে আহমদ)

তিনি আরো বলতেন ঃ

رُصُّوْا صُفُوْفَكُمْ وَقَارِبُوْا بَيْنَهَا

'মজবুতভাবে কাতারবন্দী হও এবং পরস্পর কাছাকাছি দাঁড়াও।' – (আহমদ, আবু দাউদ)

এক হাদীসে এসেছে, 'বেলাল (রাঃ) আযানের মত একামতের পূর্ণ জওয়াব দিতেন।' (আবু দাউদ, মেশাকাত– ৬৬ পৃঃ) এ হাদীস প্রমাণ করে যে, একামত সম্পূর্ণ শেষ হওয়ার পর একামতের জওয়াব দিয়ে ইমামের তাকবীরে তাহরীমা বলা সুন্নত।' (নাইলুল আওতার, ১ম খণ্ড, ৩৫৩ পৃঃ) খোলাফায়ে রাশেদাও একামত শেষ না হলে তাকবীরে তাহরীমা বলতেন না। বর্ণিত আছে, হযরত ওমার (রাঃ) একামত শেষে একজন লোককে কাতার সোজা করার দায়িত্ব দিতেন এবং কাতার সোজা হওয়ার খবর না পাওয়া পর্যন্ত তিনি তাকবীরে তাহরীমা বলতেন না। হযরত ওসমান এবং আলী (রাঃ)-ও অনুরূপ করতেন। – (তিরমিজী-১ম খণ্ড)

ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ)-এর মত হল, একামত শেষ হলে তাকবীরে তাহরীমা বলা।

যারা বলেন, حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ বললে ইমাম ও মোক্তাদী দাঁড়াবে এবং قَدْقَامَتِ الصَّلَاةُ বললে ইমাম তাকবীরে তাহরীমা বলবেন, তাদের এ বক্তব্য সহীহ্ হাদীসের পরিপন্থী। তাই একামত শেষে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অনুসরণে আমাদেরকেও কাতার সোজা করার কথা বলতে হবে।

(২৫) খতমে কোরআনের অযূহাতে তারাবীহ্র নামাযে তাড়াহুড়া করাঃ রমজানের প্রত্যেক রাত্রে তারাবীহ্র নামায সুন্নত। বহু ইমাম অজ্ঞতার কারণে কোরআন খতমের নামে তাড়াহুড়া করে তারাবীহ্র নামায পড়ান। তারা রুকু, সাজদা ঠিকমত আদায় করেন না এবং তাসবীহ্ও ঠিকমত পড়ার সুযোগ দেননা। বলা যায় তারা মোরগের ঠোঁকর মারেন। এগুলো নিষিদ্ধ এবং এ দ্রুততা শয়তানের কাজ। নামায ফরজ হোক আর নফল-সুন্নতই হোক, নামাযের কেরাত, রুকু-সাজদা ধীরে-সুস্থে আদায় করতে হবে এবং বিনয় ও খুশু রক্ষা করতে হবে। আয়াত এবং রুকু-সাজদার তাসবীহ্ ও দোআগুলোর অর্থের দিকে খেয়াল করতে হবে। নবী করীম (সঃ) এবং সাহাবায়ে কেরাম কিংবা ইমামগণ খতমের নামে তাড়াহুড়া করে তারাবীহ্ আদায় করেন নি। ইমাম ও মুসল্লীগণ মনে করেন যে, তাড়াতাড়ি না করলে মুসল্লীরা নামাযে অংশ নিতে চাইবে না, তাদের উচিত ঐ সকল মুসল্লীকে তারাবীহ্র ফজীলত বুঝানো। আল্লামা গাজালী (রঃ) বলেছেন, যারা নামাযের অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য রক্ষা ব্যতীত বাহ্যিক দিকগুলো বাস্তবায়ন করে, তাদের উদাহরণ হল, কোন বাদশাহকে মৃত প্রাণী উপহার দেয়া যার প্রাণ নেই। আর যে বাহ্যিক দিকগুলোতে ত্রুটি করে তার উদাহরণ হল, বাদশাহকে অঙ্গহীন কানা-খোঁড়া প্রাণী উপহার দেয়া। এ উভয় উপহারদানকারীই আল্লাহর অধিকার নষ্ট করার দায়ে শাস্তি ও আজাবের সম্মুখীন হবে।

মোটকথা, নামাযে প্রশান্তি, স্থিরতা ও ধীর-সুস্থ পরিবেশের অভাব হলে নামাযের বিরাট একটি রোকনের ঘাটতি দেখা দেয়। ফলে এ নামায বিশুদ্ধ হয় না। তাই এ জাতীয় নামায পড়িয়ে অসুস্থ ও বৃদ্ধসহ বিভিন্ন লোকদেরকে কষ্ট দেয়া ইমামের উচিত নয়। পবিত্র কোরআন এ জাতীয় নামাযকে মোনাফেকদের নামায হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেছেঃ

وَإِذَا قَامُوْا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوْا كُسَالَى يُرَاءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللهَ إِلَّا قَلِيْلًا ـ

'তারা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন অলসের মত দাঁড়ায়, তারা লোক দেখানোর কাজ করে, তাদের খুব কম সংখ্যকই আল্লাহকে স্মরণ করে।' তাদের নামায মোমেনদের সে আকাঙ্ক্ষিত নামায নয় যাদের সম্পর্কে আল্লাহ কোরআনে বলেছেন ঃ

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ - الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ -

'সে মোমেনরাই সফল হয়েছে যারা নিজেদের নামাযে বিনয়ী।' – (সূরা মোমেন ঃ ১-২) তারাবীহ খুবই ফজীলতপূর্ণ নামায। তাই তা ভালভাবে আদায় করা দরকার।

(২৬) বিনা প্রয়োজনে নামাযে দু'চোখ বন্ধ করা ঃ আল্লামা ইবনুল কাইয়েম (রঃ) বলেছেন ঃ নামাযে চোখ বন্ধ করা নবী করীম (সঃ)-এর সুন্নতের পরিপন্থী। তিনি কখনও নামাযে এরূপ করতেন না। বরং তিনি নামাযে তাশাহহুদের বৈঠকে দোআর সময় আঙ্গুলের ইশারার দিকে তাকিয়ে থাকতেন। ইবনুল কাইয়েম (রঃ) চোখ বন্ধ না করার বিষয়ে খোমাইসা আবি জাহামসহ অন্যদের বর্ণিত কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। এর সমর্থনে আরো বলা যায় যে, কসুফের নামাযের সময় তার বেহেশতের আঙ্গুরের ছড়া ধরার চেষ্টা, একবার নামাযে দোজখ এবং তাতে বিড়ালের কাহিনী বিশিষ্ট মহিলাকে দেখা এবং তাঁর নামাযের সামনে দিয়ে পশু অতিক্রমের সময় তাকে বাধা প্রদানসহ বিভিন্ন ঘটনা রয়েছে। এগুলো প্রমাণ করে যে, তিনি নামাযে চোখ বন্ধ রাখতেন না।

নামাযে চোখ বন্ধ রাখার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতভেদ আছে। ইমাম আহমদসহ একদল আলেমের মতে এটা মাকরূহ। তাঁরা বলেছেন, এটা ইহুদীদের কাজ। তবে অন্য একদল আলেমের মতে, তা জায়েয এবং তাঁরা এটাকে মাকরূহ বলেন নি। বরং তারা বলেছেন, এর মাধ্যমে নামাযের প্রাণ খুশু ও বিনয় অর্জন সহজ।

বিশুদ্ধ মত হল, চোখ খোলা রাখলে যদি তা খুশুর জন্য ক্ষতিকর না হয় তাহলে খোলা রাখাই উত্তম। আর যদি সামনে কারুকার্য, ডিজাইন বা অন্য কিছুর প্রতি দৃষ্টির কারণে খুশু বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহলে চোখ বন্ধ রাখা মাকরূহ হবে না বরং শরীয়তের মূল উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক হওয়ার কারণে তা মোস্তাহাব।[২]

২. যাদুল মাআদ-ইবনুল কাইয়েম।

(২৭) প্রথম রাকাত অপেক্ষা ২য় রাকাত কিংবা প্রথম দু'রাকাত অপেক্ষা শেষ দু'রাকাতকে দীর্ঘ করা ঃ নবী করীম (সঃ) এর বিপরীত করতেন। অর্থাৎ তিনি ১ম রাকাতকে ২য় রাকাত এবং প্রথম দু'রাকাতকে শেষ দু'রাকাত অপেক্ষা দীর্ঘায়িত করতেন।

আবু কাতাদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। 'রসূলুল্লাহ (সঃ) জোহরের প্রথম রাকাতগুলোকে দীর্ঘ এবং শেষ রাকাতদ্বয়কে সংক্ষিপ্ত করতেন। তিনি ফজরের নামাযেও এরূপ করতেন।' (বোখারী) আরেক বর্ণনায়, তিনি আসরের নামাযেও এরূপ করতেন বলে বর্ণিত হয়েছে। – (বোখারী)

(২৮) টাখনু বা পায়ের ছোট গিরার নিচে কাপড় পরা ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি টাখনুর নিচে কাপড় চেঁচানো অবস্থায় নামায পড়ছিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বলেন ঃ 'যাও, অযূ কর।' তারপর সে আসল। নবীজী আবার তাকে অযূ করে আসার নির্দেশ দেন। সে আবার গেল এবং অযূ করে আসল। এক লোক নবী করীম (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি তাকে অযূ করার আদেশ দেয়ার পর চুপ করে রইলেন কেন? তিনি জবাব দেন, লোকটি টাখনুর নিচে কাপড় পরে নামায পড়ছিল। আল্লাহ কাপড় চেঁচানো ব্যক্তির নামায কবুল করেন না।' (আবু দাউদ) ইমাম নওয়ী বলেছেন, ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীসের সনদ সহীহ। কেউ কেউ হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। কিন্তু এ মর্মে অন্যান্য হাদীসের কারণে এ দুর্বলতা দূর হয়ে গেছে।

টাখনুর নিচে কাপড় চেঁচানোর বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী রয়েছে। আবু জার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। 'রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ কেয়ামতের দিন আল্লাহ তিন ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না, তাদের প্রতি দৃষ্টি দেবেন না এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। তারা হল ঃ

১. টাখনুর নিচে কাপড় চেঁচানো ব্যক্তি। ২. যে ব্যক্তি কোন কিছু দান করে খোঁটা দেয়। ৩. মিথ্যা কসম করে পণ্যদ্রব্য বিক্রেতা। –(মুসলিম)

জাবের বিন সোলাইম থেকে বর্ণিত। 'রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, ... তুমি ইজার হাঁটুর মাঝামাঝি পর্যন্ত পর, যদি তা না কর, তাহলে, পায়ের টাখনু বা ছোট গিরা পর্যন্ত পরতে পার, তবে টাখনুর নিচে কাপড় চেঁচানোর বিষয়ে হুঁশিয়ার। এটা হচ্ছে, লোক প্রদর্শন। আল্লাহ নিশ্চয়ই লোক প্রদর্শনকারীদেরকে পসন্দ করেন না ....। (আবু দাউদ)

আরেক হাদীসে মহানবী (সঃ) বলেছেন ঃ

مَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْاِزَارِ فَهُوَ فِى النَّارِ -

'দুই টাখনুর নিচে ইজার (লুঙ্গি) পরলে তার ঠিকানা হল দোজখ।'
– (বোখারী)

এখন এটা ইচ্ছা করে বা অনিচ্ছা সত্ত্বেও টাখনুর নিচে চেঁচালে উল্লেখিত হাদীসের কারণে তা নিষিদ্ধ হবে। কেননা, এটা সাধারণত গর্ব-অহঙ্কার ও লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে করা হয়। কারো লোক প্রদর্শন বা গর্ব-অহঙ্কারের ইচ্ছা না থাকলেও তা লোক প্রদর্শন ও গর্ব-অহঙ্কারের উপায়। তাছাড়াও তাতে মহিলাদের সাথে সাজুয্য এবং তাতে ময়লা ও নাপাকী লাগতে পারে। অপচয় এর আরেকটি দিক। তাই লুঙ্গি, পাজামা, প্যান্ট ও জামা অবশ্যই টাখনুর উপর থাকতে হবে। এর নিচে গেলে গুনাহ হবে।

(২৯) একামতের সময় সুন্নত বা নফল নামায পড়া ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ

اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَاصَلَاةَ اِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ

'নামাযের একামত হয়ে গেলে ফরজ নামায ছাড়া আর কোন নামায নেই।' (মুসলিম)

আবদুল্লাহ বিন বোহাইনা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) ফজরের নামাযের একামতের সময় এক ব্যক্তিকে দু'রাকাত নামায পড়তে দেখেন। নবী করীম (সঃ)-এর নামায শেষে লোকেরা তাকে ঘিরে ফেলল। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) প্রশ্ন করেন, 'ফজরের ফরজ নামায কি ৪ রাকাত? ফজরের ফরজ নামায কি ৪ রাকাত?' (বোখারী, মুসলিম) অর্থাৎ একামতের পর তো মাত্র দু'রাকাত ফরজ নামায পড়ার কথা। কিন্তু লোকটি তো ৪ রাকাত পড়ল।

হাদীসের আলোকে ইবনে হেজাম বলেন ঃ ফজরের ফরজ নামাযের একামত শুনার পর ফজরের দু'রাকাত সুন্নত পড়লে যদি জাম'আত কিংবা তাকবীরে তাহরীমা ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে ঐ দু'রাকাত সুন্নত আগে পড়া জায়েয নেই। কেউ তা পড়লে আল্লাহর নাফরমানী করবে।

ইমাম নওয়ী (রঃ) বলেছেন, একামত শুনার পর অন্য নামায না পড়ার পেছনে যে যুক্তি রয়েছে তাহল, ফরজ নামাযের জন্য প্রথম থেকেই পূর্ণ প্রস্তুতি নেয়া এবং সুন্নত ও নফলের দ্বারা ফরজের সামান্যও ঘাটতি না করা।

ইবনে আবদুল বার বলেছেন, একামতের সময় নফল ও সুন্নত ত্যাগ করে ফরজ পড়ার পর তা আদায় করা সুন্নতের উত্তম অনুসরণ। একামতের মধ্যে

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ-এর অর্থ হল, এখন যে ফরজ নামায অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, তাতে দ্রুত এসে শরীক হও। তাই একামতের সময় নফল-সুন্নত না পড়ে ফরজ নামাযে শামিল হতে হবে।

কেউ কেউ হযরত আলী থেকে বর্ণিত হাদীসের বরাত দিয়ে বলেছেন ঃ একামতের সময় নফল নামায পড়া জায়েয। সে হাদীসে আছে ঃ 'নবী করীম (সঃ) একামতের সময় দু'রাকাত নামায পড়তেন।' – (ইবনু মাজাহ)

এ হাদীসের ভিত্তিতে দলীল দেয়া যাবে না। কেননা, হাদীসটি দুর্বল। হাদীসের সনদে হারেস আওয়ার নামক রাবী দুর্বল। আল্লামা জাহাবী তাঁর 'মীজানুল এতেদাল, গ্রন্থে লিখেছেন ঃ মুগীরা শাবী থেকে বর্ণনা সূত্রে বলেছেন, হারেস আওয়ার আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছে। সে ছিল মিথ্যাবাদী। ইবনু মুঈন তাকে দুর্বল এবং জারীর বিন আবদুল হামিদ তাকে মিথ্যুক বলেছেন, শাবী বলেছেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, সে মিথ্যুক।

কিছু কিছু আলেম একামতের সময় কিংবা পরে ফজরের সুন্নত পড়াকে জায়েয বলেছেন। ইমাম ইবনুল কাইয়েম তাঁর إِعْلَامُ الْمُوَقِّعِيْنَ গ্রন্থে লিখেছেন ঃ মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী একামত হয়ে গেলে ফরজ ছাড়া আর কোন নামায নেই। তাই একামতের পর ফজরের সুন্নত পড়া উপরোক্ত হাদীসের বিরোধী। তিনি বলেন, আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসের শেষে 'ফজরের দু'রাকাত সুন্নত ব্যতীত' এ অংশটি যোগ করাকে অস্বীকার করেছেন। তার মতে, শেষ অংশটুকু হাদীস নয়।

আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ

إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَا رَكْعَتَى الْفَجْرِ ؟ قَالَ : وَلَا رَكْعَتَى الْفَجْرِ -

'যখন নামাযের একামত দেয়া হয় তখন ফরজ ব্যতীত আর কোন নামায নেই। রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে প্রশ্ন করা হল, ফজরের দু'রাকাত সুন্নতও নয়? তিনি জবাবে বলেন ঃ না, ফজরের দু'রাকাত সুন্নতও নয়।' – (বায়হাকী)

তবে, ফজরের ফরজ পড়ার পর দু'রাকাত সুন্নত পড়ে নিলে সুন্নতের ফজীলতও লাভ করা যায়। ফরজের পর সুন্নত না পড়ার কোন নিষেধাজ্ঞা হাদীসে নেই। তবে একামতের পর কেউ যেন নতুন করে নফল-সুন্নত নামায

শুরু না করে। কেউ যদি একামতের আগে নফল-সুন্নত শুরু করেন তাহলে হালকাভাবে তা শেষ করে জামাতে শরীক হলে নিম্নোক্ত আয়াতের পরিপন্থী হবে না ঃ وَلَا تُبْطِلُوا اَعْمَالَكُمْ 'তোমাদের আমল বরবাদ করো না।'

(৩০) নামাযের মধ্যে ইশারায় সালামের জবাব না দেয়া ঃ কেউ মসজিদে প্রবেশ করে সালাম দিলে মুখে সালামের জবাব দেয়া যাবে না। কিন্তু ইশারার মাধ্যমে জবাব দেয়া যাবে। এ মর্মে আবদুল্লাহ বিন ওমার (রাঃ) বলেন ঃ 'আমি বেলালকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী করীম (সঃ) কিভাবে নামাযে আনসারদের সালামের জবাব দিতেন? বেলাল বলেন, তিনি এভাবে জবাব দিতেন। একথা বলে বেলাল নিজ হাতের অগ্রভাগ সোজা করে দেখান।' –(আবু দাউদ, তিরমিজী)

আল্লামা সানআনী বলেন, এ হাদীস প্রমাণ করে যে, কথার মাধ্যমে নয়, বরং ইশারার মাধ্যমে সালামের জবাব দিতে হবে।

জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। 'রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে এক কাজে পাঠিয়েছিলেন। তিনি ফিরে এসে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে নামাযে পেলেন। তিনি তাঁকে সালাম দেন। নবীজি ইশারায় জবাব দেন।' (মুসলিম)

ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। 'তিনি নবী করীম (সঃ)-কে নামাযের মধ্যে সালাম দিলে তিনি মাথা নেড়ে সালামের জবাব দেন।' (বায়হাকী)

এ সকল হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, কথার মাধ্যমে সালামের উত্তর দেয়া সম্ভব না হওয়ায় তিনি ইশারার মাধ্যমে জবাব দিয়েছেন। মাথা, হাত বা আঙ্গুলের ইশারায় সালামের উত্তর দিলে চলবে। প্রশ্ন হল, নামাযের মধ্যেও কেন সালামের উত্তর দিতে হয়? উত্তর হল, আল্লাহ কোরআন মজীদে বলেছেন ঃ

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّوْهَا

'আর তোমাদেরকে কেউ সালাম দিলে তোমরাও তার জন্য তার চাইতে উত্তম জবাব দাও অথবা তার অনুরূপ সালামই দাও।' (সূরা নেসা-৮৬) আল্লাহর আদেশ হল সালামের জবাব দেয়া। নামাযে কথার মাধ্যমে উত্তর দেয়া সম্ভব না হওয়ায় ইশারায় উত্তর দিতে হয়।

(৩১) নামায কাজা হলে সাথে সাথে কাজা আদায় না করা ঃ অনেকে পরের দিনের জন্য অপেক্ষা করে এবং কাজা আদায় করে। এটা বিরাট ভুল,

সুস্থ হওয়ার সাথে সাথে কিংবা মনে পড়ার সাথে সাথে কাজা আদায় করতে হবে। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ

مَنْ نَسِىَ صَلَاةً اَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا اَنْ يُّصَلِّيَهَا اِذَا ذَكَرَهَا

'কেউ ভুলে কিংবা ঘুমের কারণে নামায না পড়ে থাকলে স্মরণ হওয়া মাত্র তা আদায় করা এর কাফফারা।' (বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিজী)

(৩২) **ইমাম পরবর্তী রাকাতের জন্য উঠা সত্ত্বেও মোক্তাদীর কিছুক্ষণ বসে থাকা ঃ** এটা ঠিক নয়, বরং সুন্নতের খেলাপ। ইমামের অনুসরণ করা ফরজ। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ ... اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهٖ 'অনুসরণের জন্যই ইমাম নিযুক্ত করা হয়েছে।' (বোখারী, মুসলিম)

(৩৩) আজান, একামত কিংবা তাকবীরের মধ্যে 'আল্লাহু আকবার' اَللّٰهُ اَكْبَارُ অর্থাৎ আকবার শব্দকে দীর্ঘায়িত করা। এর ফলে অর্থের বিকৃতি ঘটে। اَكْبَارُ-এর একবচন كَبَرٌ অর্থাৎ এক মুখ বিশিষ্ট ঢোল। অভিধানে এর আরেকটি অর্থ হল এক ধরনের দীর্ঘজীবি উদ্ভিদ। অথচ 'আল্লাহু আকবার' এর অর্থ হল, আল্লাহ সবচাইতে বড় ও মহান।

(৩৪) لَا শব্দটি না বাচক অর্থ বুঝালে তাকে মদ সহকারে দীর্ঘায়িত না করা। এর ফলে অর্থ সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে যায়। বিশেষ করে لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এর মধ্যে ভুল উচ্চারণের কারণে শিরকের গুনাহ হবে। মদ সহকারে পড়লে এর অর্থ দাঁড়ায় ঃ 'আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ ও উপাস্য নেই।' আর মদ ছাড়া তাড়াতাড়ি পড়লে অর্থ দাঁড়ায়, 'আল্লাহ ছাড়া অবশ্যই আরো মাবুদ এবং উপাস্য আছে।' নাউজুবিল্লাহ। কাফেরকে মুসলমান বানানোর জন্য যে কালেমার প্রবর্তন,ভুল উচ্চারণের কারণে একই কালেমা দ্বারা মোমেন পুনরায় কাফের ও মোশরেকে পরিণত হয়ে যায়।

অনুরূপভাবে, সূরা কাফেরূনের চার জায়গায় لَا-কে লম্বা করে মদ সহকারে না পড়লে এরূপ বিভ্রাট সৃষ্টি হতে পারে। যেমন ঃ

لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ - وَلَآ اَنْتُمْ - عَابِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ - وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْ تُّمْ - وَلَآ اَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ -

অর্থ ঃ তোমরা যার এবাদত কর, আমি তার এবাদত করি না। আর আমি যার এবাদত করি তোমরা তার এবাদত কর না। তোমরা যার এবাদত কর আমি তাদের এবাদতকারী নই এবং আমি যার এবাদত করি তোমরাও তার এবাদতকারী নও।' এখানে ৪টি জায়গায় لا শব্দকে মদ সহকারে না পড়লে অর্থ হবে এরূপ ঃ তোমরা যার এবাদত কর আমি অবশ্যই তার এবাদত করি। আর আমি যার এবাদত করি তোমরা অবশ্যই তার এবাদত কর। তোমরা যার এবাদত কর আমি অবশ্যই তাদের এবাদতকারী এবং আমি যার এবাদত করি তোমরাও অবশ্যই তার এবাদতকারী।'

এভাবে মোশরেকদের মূর্তি ও দেবতার পূজাকে তাকিদ সহকারে স্বীকার করে নেয়া হচ্ছে। ফলে, মোমেন আর মোমেন থাকতে পারছে না। এরূপ আরো বহু আয়াত ও দোআয় এ সমস্যা দেখা দেবে। কেউ জেনে বুঝে ইচ্ছা করে এরূপ উচ্চারণ করলে এবং এর এ অর্থকে গ্রহণ করলে শতকরা ১শ' ভাগ কাফের-মোশরেক হয়ে যাবে। কিন্তু যারা অর্থ বুঝে না এবং এরূপ উল্টা নিয়তও যাদের নেই তাদের ব্যাপারটি আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন বলে আশা করা যায়। কিন্তু বাঁচার সঠিক পদ্ধতি হল, ঠিকমত উচ্চারণ করা।

(৩৫) বেশি পাতলা কাপড়ে নামায পড়া যাতে সতর দেখা যায় ঃ পুরুষের নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত এবং স্ত্রীলোকের সারা শরীর সতর। পাতলা কাপড়ের ভেতর দিয়ে যদি শরীরের সতরের অংশের চামড়া দেখা যায় তাহলে সতর ঢাকা হবে না।ফলে নামাযও শুদ্ধ হবে না। হাঁ, যদি পাতলা কাপড়ের ভেতর অন্য কোন পোশাক থাকে যেমন, পুরুষের পাজামা, লুঙ্গি এবং মেয়েলোকের অন্য কোন কাপড় তাহলে নামায বিশুদ্ধ হবে। নামাযে পুরুষের কাধ ঢাকা থাকতে হবে। গেঞ্জী থাকলেও চলবে। কেননা, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন ঃ

لاَيُصَلِّ اَحَدُكُمْ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلٰى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَىْءٌ

'তোমরা একটিমাত্র কাপড়ে এমনভাবে নামায পড় না যে, কাঁধের উপর কিছু না থাকে।' (বোখারী, মুসলিম) এমন পোশাক পরে নামায পড়লেও হবে না যার ফলে সতরের কোন অংশ বেরিয়ে পড়ে।

(৩৬) নামাযে চুল ও কাপড় গুছানো ঃ আবদুল্লাহ বিন আব্বাস থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلٰى سَبْعَةٍ لَا أَكُفُّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا

'চুল ও কাপড় না গুছিয়ে আমাকে সাত অঙ্গে সাজদার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।' (বোখারী)

কেউ কেউ রুকু-সাজদার সময় বিনা প্রয়োজনে শরীরের কাপড় টেনে ধরে এবং কাপড়কে সম্প্রসারিত হতে দেয় না। কেউ কেউ দাঁড়ি কিংবা মাথার চুল ধরে নাড়াচাড়া করে। একবার এক ব্যক্তি এরূপ করায় নবী করীম (সঃ) বলেন, তার অন্তরে খুশু ও বিনয় থাকলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তা করতে পারেনা। এরূপ করলে নামাযের খুশু ও বিনয় নষ্ট হয়।

(৩৭) বাইরে সুতরাহ ছাড়া নামায পড়া ঃ মসজিদে নামায পড়লে ইমামের স্থান মেহরাব সুনির্দিষ্ট থাকে বলে সেখানে সুতরার দরকার হয়না। কিন্তু অন্যত্র কিংবা মসজিদের পেছনের অংশে নামায পড়লে সুতরাহ দিতে হবে। আবদুল্লাহ বিন ওমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'তোমরা সুতরাহ ছাড়া নামায পড়বে না এবং তোমাদের নামাযের সামনে দিয়ে কাউকে অতিক্রম করতে দেবে না। যদি সে না মানে তাহলে, তার সাথে লড়াই কর। কেননা, তার (শয়তান) সঙ্গী তার সাথে আছে।' (ইবনু খোযাইমাহ, হাকেম, বায়হাকী) হাকেম বলেছেন, মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীসটি বিশুদ্ধ এবং আল্লামা জাহাবী একে সমর্থন করেছেন।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন ঃ 'তোমাদের কেউ নামায পড়লে যেন সামনে সুতরাহ রাখে এবং এর নিকটবর্তী হয়। কেউ সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে চাইলে তার সাথে লড়াই করবে; সে হচ্ছে শয়তান।' (আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ, বায়হাকী, ইবনু খোযাইমা এবং ইবনে আবি শায়বা)

সুতরার দূরত্বের পরিমাণ ঃ

সুতরার ও মুসল্লীর মধ্যকার দূরত্বের পরিমাণ কতটুকু হওয়া দরকার? এ বিষয়ে আবদুল্লাহ বিন ওমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। 'তিনি নিজে কা'বার ভেতর প্রবেশ করে দরজাকে পেছনে রেখে সামনের দিকে অগ্রসর হতেন এবং কা'বার দেয়াল থেকে প্রায় তিন হাত দূরে অবস্থান করে নামায পড়তেন। হযরত বেলাল (রাঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী, নবী করীম (সঃ) সে জায়গাতেই নামায পড়েছিলেন। এর দ্বারা প্রমাণ মিলে যে, তাঁর ও সুতরার মাঝখানের দূরত্ব ছিল প্রায় তিন হাত।' – (বোখারী)

সহল বিন সা'দ থেকে বর্ণিত। 'রসূলুল্লাহ (সঃ) মোসাল্লা ও কা'বার দেয়ালের মাঝে একটি ভেড়া অতিক্রমের জায়গা ছিল।' ইমাম নওয়ী (রঃ) তাঁর শরহে মুসলিম গ্রন্থে লিখেছেন, এখানে 'মোসাল্লা' বলতে, সাজদার জায়গা বুঝানো হয়েছে।

আউন বিন আবি জোহাইফা থেকে বর্ণিত। 'তিনি বলেন, আমি আমার বাপের কাছে শুনেছি, নবী করীম (সঃ) (মক্কার মাআবদায়) বাতহায় দু'রাকাত করে জোহর ও আসর আদায় করেছেন। তাঁর সামনে ছিল আ'নজাহ। তাঁর সামনে দিয়ে নারী ও গাধা অতিক্রম করেছে।' (বোখারী, মুসলিম)

ইবনুল আসীর তাঁর 'আন-নেহায়া' গ্রন্থে লিখেছেন, আ'নজাহ হচ্ছে, তীরের অর্ধেক বা আরো একটু বড় ঠিক এ পরিমাণ। আ'নজায় তীরের মত দাঁত আছে।

আবদুল্লাহ বিন ওমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। 'নবী করীম (সঃ)-এর সামনে হারবাহ নামক যুদ্ধাস্ত্র দাঁড় করানো হত এবং তিনি এর দিকে ফিরে নামায পড়তেন।' (বোখারী, মুসলিম, নাসাঈ) 'হারবাহ' হচ্ছে সুঁচালো মাথা বিশিষ্ট লোহার তৈরি ছোট যুদ্ধাস্ত্র।

আবদুল্লাহ বিন ওমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। 'নবী করীম (সঃ) নিজ সওয়ারীকে সামনে রেখে নামায পড়তেন।' (বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)

সুতরাহর পরিমাণ ঃ সুতরাহ কত বড় হবে? এ মর্মে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। 'তিনি বলেন, তাবুক যুদ্ধে নবী করীম (সঃ)-কে সুতরাহর পরিমাণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি জবাবে বলেন ঃ সওয়ারীর পিঠে রাখা আসনের কাঠের মত উঁচু হলেই চলবে।' (মুসলিম)

তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ থেকে বর্ণিত। 'রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, নামাযের সময় সামনে সওয়ারীর আসনের কাঠের মত উঁচু জিনিস দাঁড় করালেই চলবে। এরপর সামনে দিয়ে কি যায় তা নিয়ে আর কোন পরোয়া নেই।'

– (মুসলিম)

ইমাম নওয়ী বলেছেন ঃ সওয়ারীর আসনের শেষ মাথায় লাগানো কাঠের পরিমাণ হল হাতের হাড়ের পরিমাণ, অর্থাৎ হাতের দুই-তৃতীয়াংশ। পুরো হাত পরিমাণ নয়।

দাগ কি সুতরার বিকল্প হতে পারে ? দাগ সুতরার বিকল্প হতে পারে না। তাই উঁচু সুতরাহ ব্যবহার করতে হবে। যে হাদীসে সুতরাহ না পেলে বিকল্প হিসেবে দাগ দেয়ার কথা এসেছে সে হাদীসের সনদ দুর্বল। তাই সে হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। ইমামের সুতরাহ মোক্তাদীর জন্য যথেষ্ট।

দুর্বল হাদীসগুলোর একটা হল ঃ

আবু মাহজুরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী করীম (সঃ)-কে মসজিদে হারামে বাবে বনি শায়বা দিয়ে প্রবেশ করতে দেখেছি। তিনি কা'বা শরীফের সামনে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ান, একটি দাগ বা রেখা টানেন, তারপর তাকবীরে তাহ্‌রীমার মাধ্যমে নামায শুরু করেন। লোকেরা কা'বা ও ঐ দাগের মাঝে তওয়াফ করতে থাকে।' (আবু ইয়ালী) এ হাদীসের সনদে হাস্‌সান বিন ওব্‌বাদ অজ্ঞাত ব্যক্তি। ইমাম জাহাবী বলেন, তিনি কে আমরা জানিনা। এছাড়াও সনদে ইবরাহীম বিন আবদুল মালেকও দুর্বল ব্যক্তি। তাই হাদীসটি দুর্বল। এ বিষয়ে এরূপ আরো কয়েকটি দুর্বল হাদীস রয়েছে।

দুই হারাম শরীফে সুতরাহ্‌র প্রয়োজনীয়তা ঃ দুই হারাম শরীফ অর্থাৎ মক্কার মসজিদে হারাম এবং মদীনার মসজিদে নবওয়ীতেও সুতরাহ্‌র প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কেননা, সুতরার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আদেশ সকল মসজিদের জন্য প্রযোজ্য। তা থেকে কোন মসজিদকে বাদ দেয়া হয়নি। তাই দুই হারাম শরীফও ঐ আদেশের শামিল। যদি ইমাম মসজিদের দেয়াল কিংবা মেহরাবের কাছে না দাঁড়ান।

সুতরাহ সম্পর্কিত একাধিক হাদীস তিনি মদীনার মসজিদে নবওয়ীতে বসেই বলেছেন। অপরদিকে মক্কার মসজিদে হারামে সুতরাহ সম্পর্কে আবদুল্লাহ বিন আবি আওফা থেকে বর্ণিত। 'তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) ওমরাহ করেন, বাইতুল্লাহর তওয়াফ করেন এবং মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দু'রাকাত নামায পড়েন। তাঁর সাথীরা মানুষ থেকে তাঁকে আড়াল করে রাখেন।' (বোখারী)

ইয়াহইয়া বিন আবি কাসীর থেকে সহীহ সনদ সহকারে বর্ণিত। 'তিনি বলেন, আমি মসজিদে হারামে আনাস বিন মালেককে সামনে লাঠি দাঁড় করিয়ে নামায পড়তে দেখেছি।' (ইবনে আবি শায়বা)

সালেহ বিন কাইসান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি ইবনে ওমারকে কা'বার দিকে মুখ করে নামায পড়তে দেখেছি। তিনি তাঁর সামনে দিয়ে কাউকে অতিক্রম করতে দেননি। বরং বাধা দিয়েছেন।' – (বোখারী)

(৩৮) মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা ঃ এটা বিরাট গুনাহ। আবুল জোহাইম থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ যদি মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী জানত যে, তার কি গুনাহ, তাহলে তার জন্য মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা অপেক্ষা ৪০ ... পর্যন্ত অপেক্ষা করা উত্তম হত।' এ

হাদীসের এক বর্ণনাকারী আবুন নাদ্‌র বলেন ঃ আমি জানিনা, নবী করীম (সঃ) ৪০ দিন, মাস না বছর বলেছেন। (শরহে মুসলিম, ইমাম.নওয়ী)

আবু সালেহ সাম্মান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ 'আমি আবু সাঈদ (রাঃ)-কে জুমার দিন লোকদেরকে আড়ালকারী একটি জিনিসের দিকে মুখ করে নামায পড়তে দেখেছি। আবু মুঈত গোত্রের এক যুবক তাঁর সামনে দিয়ে পার হওয়ার ইচ্ছা করল। আবু সাঈদ (রাঃ) তাঁকে নিজ বুক দিয়ে ঠেলা দেন। যুবকটি পারাপারের অন্য কোন পথ না দেখে আবারও তাঁর সামনে দিয়ে পার হওয়ার চেষ্টা করে। এবারও আবু সাঈদ পূর্বাপেক্ষা আরো জোরে ঠেলা দেন। যুবকটি আবু সাঈদের এ আচরণের বিরুদ্ধে শাসক মারওয়ানের কাছে অভিযোগ করে। আবু সাঈদও তাঁর পেছনে পেছনে মারওয়ানের কাছে যান। মারওয়ান জিজ্ঞেস করেনে, হে আবু সাঈদ, আপনার ও আপনার ভাতিজার ঘটনা কি? আবু সাঈদ বলেন ঃ আমি নবী করীম (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ মানুষ থেকে আড়াল সৃষ্টিকারী সুতরার দিকে নামায পড়ার সময় সামনে দিয়ে কেউ অতিক্রম করতে চাইলে তাকে ঠেলে সরিয়ে দেবে। সে সরতে না চাইলে তার সাথে যুদ্ধ করবে। নিশ্চয়ই সে শয়তান।' (বোখারী)

ইমাম নওয়ী বলেছেন, ১ম হাদীসে নামাযের সামনে দিয়ে পার হওয়াকে হারাম করা হয়েছে। তাতে কঠোর নিষেধাজ্ঞা ও হুমকীর উল্লেখ আছে।

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন, হাদীসের মর্মানুযায়ী এটা কবীরা গুনাহ্‌র শামিল। তিনি আরো বলেন, প্রকাশ্য হাদীসের দাবী হল, মুসল্লীর সামনে দিয়ে মোটেও অতিক্রম করা যাবে না। জায়গা না থাকলে অপেক্ষা করতে হবে যে পর্যন্ত না মুসল্লী নামায থেকে অবসর হয়। আবু সাঈদের কাহিনী একথার সহায়ক।

আল্লামা শাওকানী বলেছেন, নামাযীর সামনে দিয়ে পার হওয়া জাহান্নাম ওয়াজিবকারী কবীরা গুনাহ্। তাতে ফরজ ও নফল-সুন্নত সমান।

সৌদী আরবের প্রয়াত মুফতী জেনারেল শেখ আবদুল আযীয বিন বাজ (রঃ) বলেছেন ঃ প্রকাশ্য হাদীসের দাবী হল, মুসল্লীর সামনে দিয়ে যাওয়া হারাম এবং মুসল্লীর তা প্রতিরোধ করার অধিকার আছে। তবে কেবলমাত্র একটি সময়ে মুসল্লীর সামনে দিয়ে যেতে পারবে যখন পার হতে বাধ্য হয় এবং এছাড়া আর কোন পথ না থাকে। তবে মুসল্লী থেকে দূর দিয়ে অতিক্রম করলে এবং তার সামনে সুতরাহ না থাকলেও গুনাহ হবে না। সেটা সুতরার সামনে দিয়ে অতিক্রম করারই সমান।

দূরত্বের পরিমাণ ঃ এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল, মুসল্লী থেকে কতটুকু দূর দিয়ে গেলে গুনাহ হবে না? এ প্রশ্নের জবাব হল, বহু সংখ্যক ওলামায়ে

কেরামের মতে, সুতরাহ্ ছাড়া মুসল্লী যে জায়গায় দাঁড়াবে সে জায়গা থেকে তিন হাত পরিমাণ দূর দিয়ে গেলে গুনাহ্ হবে না। গুনাহ্ কেবল সে ব্যক্তির হবে যে ঐ তিন হাতের ভেতর দিয়ে অতিক্রম করবে।

ইবনু হাজমের মতে, যে ব্যক্তি মুসল্লী থেকে তিন হাতের বেশি দূর দিয়ে অতিক্রম করবে, তার গুনাহ্ হবে না এবং মুসল্লীও অতিক্রমকারীকে বাধা দেবে না। কিন্তু যদি তিন হাত বা এর কম পরিমাণ দূর দিয়ে যায় তাহলে অতিক্রমকারী ব্যক্তি গুনাহ্গার হবে। সুতরাহ্ হলে, এর পেছন দিয়েই অতিক্রম করতে পারবে। তখন আর গুনাহ্ হবে না।

ইমামের সামনে সুতরাহ্ থাকলে মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে কোন অসুবিধে নেই। ইমাম বোখারী 'ইমামের সুতরাহ্ পেছনের মোক্তাদীর সুতরাহ্' এ শিরানামে আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ 'আমি একটি গর্ধভীর উপর আরোহণ করা অবস্থায় মিনায় পৌঁছি। তখন আমি বালেগ ছিলাম। নবী করীম (সঃ) সেখানে সামনে দেয়ালবিহীন এক স্থানে লোকদেরকে নিয়ে নামায পড়ছিলেন। আমি একটি কাতারের সামনে দিয়ে অতিক্রম করি, তারপর সওয়ারী থেকে অবতরণ করি এবং গর্ধভীটিকে ঘাস খাওয়ার জন্য ছেড়ে দেই। তারপর জাম'আতে ঐ নামাযে শামিল হই। কেউ আমার প্রতি আপত্তি জানান নি।'

ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইবনে আব্বাসের এ হাদীসের ভিত্তিতে বলেছেন, ইমাম ও মোক্তাদী কারো সামনে ৩ হাতের মধ্য দিয়ে পার হওয়া ঠিক নয়।

সৌদী সুপ্রিম ওলামা কাউন্সিলের সদস্য শেখ আবদুল্লাহ্ জিবরীন বলেছেন, নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম না করার কারণ উভয়ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। আর তা হল, নামায থেকে মুসল্লীর মন অন্য দিকে সরিয়ে নেয়া। পক্ষান্তরে, ইবনে আব্বাসের হাদীস দ্বারা একথা বুঝা জরুরী নয় যে, তিনি নামাযের কাতারের একেবারে সামনে দিয়ে অতিক্রম করেছেন। হাতে পারে, তিনি তিন হাত দূর দিয়ে অতিক্রম করে বলেছেন, আমি কাতারের সামনে দিয়েই অতিক্রম করেছি।

অনেকে দূর দিয়ে পর্যন্তও নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে ইতস্ততঃ করে আসলে এ ইত্যস্ততার কোন দরকার নেই।

(৩৯) নামাযে নাড়াচাড়া করা ঃ কেউ কেউ নামাযে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে বেশ কিছু কাজ করে। তাতে তার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নাড়াচাড়া হয়। এর উদাহরণ অনেক। যেমন (১) নাক পরিস্কার করা। এটা নামাযের বাইরেই অপসন্দনীয়, নামাযের ভেতর কিভাবে পসন্দনীয় হবে? (২) মাথা নাড়ানো।

(৩) পাগড়ী, টুপি ও মাথার রুমাল ঠিক করা। (৪) পকেটের জিনিস খুঁজে দেখা। (৫) দাঁত পরিষ্কার করা। (৬) ঘড়ি নাড়ানো কিংবা ঘড়ির দিকে তাকানো। (৭) দাঁড়ি নাড়াচাড়া করা। (৮) দু'আঙ্গুলের মাঝখানে সর্বদা মেসওয়াক রাখা।

এক ব্যক্তি সৌদী আরবের পরলোকগত **প্রধান মুফতী** শেখ আবদুল আযীয বিন বাজকে প্রশ্ন করেন যে, আমি নামাযে অধিক নাড়াচাড়াকারী ব্যক্তি। শুনেছি, তিনবার নাড়াচাড়া করলে নামায বাতিল হয়ে যায়। এ প্রশ্নের জবাবে শেখ বিন বাজ বলেন ঃ মোমেনের জন্য নিয়ম হল, ফরজ, নফল ও সুন্নত নামাযে শারীরিক মানষিক বিনয় সহকারে নামায আদায় করা। কেননা, আল্লাহ বলেছেন ঃ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ - الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ -

'মোমেনরা অবশ্যই সফল হয়েছে। যারা নামাযে বিনয়ী।' (সূরা মোমেনুন ঃ ১-২) বিনয় ও প্রশান্তি নামাযের অপরিহার্য রোকন। নবী করীম (সঃ) ভুল নামায আদায়কারীকেও এ কথাই বলেছিলেন। তাই এটা ছাড়া নামায বিশুদ্ধ হবে না।

তবে, তিনটি কাজ করলে নামায বাতিল হবে বলে যে কথা প্রচলিত আছে, তা কিন্তু হাদীসে নেই। বরং সেটা কোন আলেমের কথা যার সমর্থনে কোন প্রমাণ নেই। তবে, নামাযে অপ্রয়োজনীয় কাজ ও নাড়াচাড়া করা মাকরূহ। যেমন, নাক ঝাড়া, দাঁড়ি নাড়ানো, কাপড়-চোপড় নাড়াচাড়া করা ইত্যাদি। বেশি বেহুদা কাজ দ্বারা নামায বাতিল হবে। তাই বিনয় ও প্রশান্তির লক্ষ্যে অল্প ও বেশি সব ধরনের নাড়াচাড়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

অল্প কাজ বা নাড়াচাড়া দ্বারা নামায বাতিল হবে না। বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত কাজ দ্বারাও নামায নষ্ট হবে না। এর প্রমাণ হল, একদিন নবী করীম (সঃ) নামাযরত অবস্থায় হযরত আয়েশার জন্য দরজা খুলে দেন।

আবু কাতাদার বর্ণিত হাদীসে এসেছে, একদিন নবী করীম (সঃ) লোকদের নামাযের ইমামতি করেন, তাঁর কাঁধে ছিল তাঁর মেয়ে যয়নাবের কন্যা উমামা। তিনি সাজদায় গেলে তাকে নিচে নামিয়ে রাখতেন এবং দাঁড়ালে আবার তাকে তুলে নিতেন।

(৪০) কেরাত উৎকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ছোট হওয়ার কারণে তাদেরকে ইমামতি করতে না দেয়া ঃ ইমামতি করার যোগ্য সে, যে অপেক্ষাকৃত বেশি

বিশুদ্ধ কোরআন পড়তে জানে। অথচ, অনেকে এর পরিবর্তে বয়স্ক লোককে ইমাম বানায়। এটা বিশুদ্ধ হাদীসের পরিপন্থী। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ

إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ

'তিন ব্যক্তি একত্রিত হলে একজনকে ইমাম হতে হবে। ইমামতির জন্য সে অধিকতর উপযুক্ত যে অপেক্ষাকৃত ভাল কোরআন তেলাওয়াতকরী।'

– (আহমদ, মুসলিম, নাসাঈ)

আবু মাসউদ আকাবা বিন আমের থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আল্লাহর কিতাবের উত্তম তেলাওয়াতকারীই হবে কোন সম্প্রদায়ের ইমাম। সবাই কেরাতে সমান পারদর্শী হলে হাদীস সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞানী ব্যক্তিই হবে ইমাম। হাদীস জানার ক্ষেত্রে সমান পারদর্শী হলে যিনি আগে হিজরতকারী, তিনিই ইমামতির জন্য অধিকতর যোগ্য।' (আহমদ, মুসলিম) অন্য এক হাদীসে এসেছে, 'হিজরতের বেলায় সমান হলে বয়স্ক ব্যক্তিকে ইমাম বানাতে হবে।'

বয়স্ক লোকের মর্যাদা হল ৪র্থ পর্যায়ে। এর আগে প্রথমে ভাল কেরাত, দ্বিতীয়ত হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান এবং তৃতীয়ত হিজরতের পর্যায় রয়েছে।

জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন বালক যদি বিশুদ্ধ কোরআন পাঠ করতে পারে এবং সেখানে যদি বয়স্ক কেউ ভাল কোরআন তেলাওয়াত করতে না পারে, তাহলে সে বালকের ইমামতির অগ্রাধিকার রয়েছে। এ মর্মে আমর বিন সালামাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ 'মক্কা বিজয়ের সময় সকল সম্প্রদায় ইসলাম গ্রহণ করল, আমাদের গোত্র থেকে আমার পিতাও ইসলাম গ্রহণ করে নিজ গোত্রের কাছে ফিরে যান। তিনি বলেন ঃ আমি সত্য নবীর কাছ থেকে এসেছি। তিনি অমুক অমুক সময়ে নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। যখন নামাযের সময় উপস্থিত হবে, তখন তোমাদের একজন আজান দেবে এবং তোমাদের মধ্যে বিশুদ্ধতম কোরআন তেলাওয়াতকারী ইমামতি করবে।

তারা সবাই বিশুদ্ধতম কোরআন তেলাওয়াতকারী খুঁজে আমাকে ছাড়া আর কাউকে পায়নি। ফলে আমাকে ইমামতির জন্য পেশ করল। আমি পথিক কাফেলা থেকে কোরআন শিক্ষা করতাম। তখন আমার বয়স ছিল ৬ কি ৭ বছর ....। (বোখারী)

আবু দাউদের এক বর্ণনায় এসেছে 'আমার বয়স তখন ৮ বছর'।

(৪১) নামাযে ভাল পোশাক না পরা ঃ নামাযে ভাল ও সুন্দর পোশাক পরা দরকার। অনেকেই এ বিষয়ে যথেষ্ট গাফলতি করে। তারা নামাযের সময় যেন-তেন একটা কাপড় পরেই নামায শেষ করে। কেউ একটা গেঞ্জি পরে, কেউ চাদর বা গামছা পরে এবং কেউ পুরাতন বা ছেঁড়া অথবা ময়লা কাপড় পরে। কেউ সম্পূর্ণ খালি গায়েও নামায পড়ে। অথচ এ পোশাক পরে তারা কেউ হাট-বাজার, অফিস-আদালত ও আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে বেড়াতে যায় না। আল্লাহর দরবারের হাজিরা সেগুলো অপেক্ষা সর্বোত্তম সৌন্দর্যের দাবীদার। আল্লাহ নিজে সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। তাই নামাযে সুন্দর ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরতে হবে। মসজিদ আল্লাহর ঘর। সে মসজিদে নিজের কাছে মওজুদ সর্বোত্তম পোশাক পরে হাজিরা দিতে হবে। নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ তাই নির্দেশ করেছেন।

يَابَنِي آدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ -

'হে আদম সন্তান, তোমরা মসজিদে প্রত্যেক নামাযে তোমাদের সৌন্দর্য গ্রহণ কর।' (সূরা আরাফ-৩১)

এ আয়াতের মর্মানুযায়ী, নামাযের সময় মেসওয়াক করা, সুন্দর পোশাক পরা এবং খুশবু লাগানো শামিল রয়েছে। জুম'আ ও ঈদের নামাযে এ সুন্নতের প্রয়োজনীয়তা আরো বেশি।

আবদুল্লাহ বিন ওমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। 'রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ নামায পড়লে সে যেন তার দু'কাপড়ে নামায পড়ে। সৌন্দর্য প্রকাশের অগ্রাধিকার আল্লাহর জন্যই।' (তাহাওয়ী, বায়হাকী, তাবরানী)

(৪২) একামতের সময় قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ বললে এর উত্তরে أَقَامَهَا اللّٰهُ وَأَدَامَهَا বলা ঃ যারা এটা বলেন, তাদের প্রমাণ হল, আবু উমামা কিংবা অন্য একজন সাহাবীর বর্ণিত হাদীস। সে হাদীসে এসেছে, 'বেলাল একামতের সময় যখন قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ বলতেন, নবী করীম (সঃ) বলতেন ঃ أَقَامَهَا اللّٰهُ وَأَدَامَهَا 'আল্লাহ নামাযকে কায়েম রাখুন ও স্থায়ী করুন।'

– (আবু দাউদ)

এ হাদীসটি দুর্বল। তাই এর উপর আমল করা যাবে না। মোনজেরী বলেছেন, হাদীসের সনদে একজন অজ্ঞাত রাবী রয়েছেন। তাছাড়াও সনদে শাহর বিন হাওশাব নামক বর্ণনাকারীকে একাধিক মোহাদ্দেস দুর্বল বলেছেন।

সনদে মোহাম্মদ বিন সাবেতকে হাফেজ আজ-জাহাবী সত্যবাদী, তবে হাদীসের ব্যাপারে নমনীয় আখ্যায়িত করে তার বর্ণিত হাদীসকে অগ্রহণযোগ্য বলেছেন।

তবে এ ব্যাপারে দ্বিমতও রয়েছে। সৌদী আরবের সুপ্রিম ওলামা কাউন্সিলের সদস্য শেখ আবদুল্লাহ্ জিবরীন বলেছেন ঃ আবু দাউদ এ হাদীসের সনদের ব্যাপারে মৌনতা অবলম্বন করেছেন। তিনি যে হাদীসের সনদের ব্যাপারে মৌনতা অবলম্বন করেন তা তাঁর কাছে প্রমাণ হিসেবে পেশ করার যোগ্য। পক্ষান্তরে, শাহর বিন হাওশাবকে ইমাম আহমদ ও ইয়াহ্ইয়া বিন মুঈন নির্ভরযোগ্য বলেছেন। তাছাড়া, এ বাক্যটি একটি দো'আ মাত্র। আর দো'আর ক্ষেত্র সম্প্রসারিত। তাতে স্থান, কাল ও পাত্রের বাধ্যবাধকতা নেই। তাই এ সময় কেউ ঐ বাক্য পড়ে নামাযের স্থায়ীত্বের জন্য দো'আ করলে কোন ক্ষতি নেই। এমনকি হাদীস দুর্বল হলেও না।

(৪৩) قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ বলার আগ পর্যন্ত মোক্তাদীদের না দাঁড়ানোঃ ধারণা করা হয় যে, এটা সুন্নত। আসলে তা সুন্নত নয় এবং এ পর্যন্ত অপেক্ষা করাও ঠিক নয়। একামতের শুরুতেই দাঁড়িয়ে নামাযের প্রস্তুতি নেয়া দরকার।

যারা قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ পর্যন্ত অপেক্ষা করেন তাদের প্রমাণ হল নিম্নোক্ত হাদীস। 'আওয়াম বিন হাওশাব আবদুল্লাহ বিন আবি আওফা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন বেলাল (রাঃ) قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ বলতেন, তখন নবী করীম (সঃ) উঠে দাঁড়াতেন ও তাকবীর বলতেন।'

ইমাম আহমদ বলেছেন, হাদীসের সনদের বর্ণনাকারী আওয়াম বিন হাওশাব আবদুল্লাহ বিন আবি আওফার সাক্ষাত লাভ করেন নি। এদিকে ইবনে কাসীর বলেছেন, হাদীসটি মোনকাতে'। আর এ কারণে তা দুর্বল। সম্ভাবনা আছে যে, তা সনদের মাঝখানে কোন দুর্বল বর্ণনাকারী থেকে বর্ণিত হয়েছে।

এ ব্যাপারে ও মতভেদ আছে। কিছু কিছু ইমাম উপরে বর্ণিত হাদীসের উপর আমল করেছেন এবং একনা ও মোকনে কিতাবে (ফেকাহ) এর উল্লেখ করা হয়েছে।

(৪৪) অধিকাংশ সময় ছোট ছোট সূরা বা সংক্ষিপ্ত কেরাত পড়া ঃ নামাযে সূরা-কেরাতের পরিমাণ সম্পর্কে সুন্নত পদ্ধতির অনুসরণ না করে কেবলমাত্র সংক্ষিপ্তাকারে সূরা-কেরাত পড়ে নামায শেষ করা ঠিক নয়। শেখ

এমাদ নামক জনৈক বুজুর্গের নামাযে সুন্নত পদ্ধতি অনুসরণে দীর্ঘ কেরাতের পর এক ব্যক্তি আর তাঁর পেছনে নামায না পড়ার অঙ্গীকার করে। শেখ এমাদ তা শুনে বলেন ঃ কোন রাজা-বাদশাহর দরবারে ঘন্টার পর ঘন্টা দেরী হলে কেউ ক্লান্ত-শ্রান্ত হয় না। বরং বাদশার সাহচর্য দীর্ঘ হওয়ায় খুশীর পরিমাণ বেড়ে যায়। কিন্তু দোজাহানের রব মহান আল্লাহর দরবারে একটু দেরী হলে এবং কেরাত লম্বা হলে আর সহ্য হয় না। মজলিশে দীর্ঘ আলোচনায় আমরা বিরক্ত হইনা। কিন্তু নামায দীর্ঘ হলে বিরক্ত হই। আল্লাহর কাছে আমাদের পানাহ চাওয়া দরকার।

কেউ কেউ নিম্নোক্ত হাদীসের কারণে নামায সংক্ষিপ্তকরার পক্ষে যুক্তি দেন। আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত। 'রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ নামাযের ইমামতি করলে সে যেন সংক্ষেপে নামায আদায় করে। কেননা, মুসল্লীদের মধ্যে রয়েছে দুর্বল, রোগী ও বৃদ্ধ লোক।' – (বোখারী)

আরেক হাদীসে নবী করীম (সঃ) দীর্ঘ নামাযের জন্য মোআজ বিন জাবালকে ভর্ৎসনা করে ৩ বার বলেন ঃ 'তুমি কি ফেতনা সৃষ্টিকারী? তিনি তাঁকে মাঝারী ধরনের লম্বা সূরা পাঠের নির্দেশ দেন।'

হযরত আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ 'আমি নবী করীম (সঃ)-এর পেছনে ছাড়া সংক্ষিপ্ত অথচ এমন পূর্ণ নামায আর কারো পেছনে পড়িনি। তিনি سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলে এ পরিমাণ দাঁড়াতেন যে, আমরা বলতাম, তিনি হয়তো সাজদায় যাওয়ার কথা ভুলে গেছেন। তারপর তিনি সাজদায় যেতেন এবং দু' সাজদার মাঝে এ পরিমাণ বসতেন, আমরা বলতাম যে, তিনি আরেক সাজদার কথা ভুলে গেছেন।

আল্লামা ইবনুল কাইয়েম (রঃ) বলেছেন, হযরত আনাসের বর্ণিত হাদীস দ্বারা নবী করীম (সঃ)-এর সংক্ষিপ্ত অথচ পরিপূর্ণ নামাযের অবস্থা আমরা বুঝতে পারি। অর্থাৎ নবী করীম (সঃ) কেয়াম ও কেরাত সংক্ষিপ্ত করতেন কিন্তু রুকু ও সাজদার মাঝে সোজা হওয়ার পূর্ণতা বিধান করতেন। ফলে একদিকে সংক্ষিপ্ত কেয়াম ও কেরাত এবং অন্যদিকে রুকু ও সাজদার মাঝে দীর্ঘ প্রশান্তির মাধ্যমে নামাযের পূর্ণতা সাধন করতেন। এর ফলে আনাসের এ মন্তব্যের সত্যতা প্রতিভাত হয় যে, 'আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নামায অপেক্ষা এত সংক্ষিপ্ত অথচ এত পূর্ণ নামায আর দেখিনি।'

ইবনুল কাইয়েমের এ বিশ্লেষণ খুবই বিজ্ঞানসম্মত। কিন্তু আজকাল আমরা এর বিপরীত নামাযই দেখতে পাই। আমরা দেখি, লোকেরা কেয়াম ও কেরাত

করলেও রুকু ও সাজদায় ঠোকর খায়। আবার কেউ কেউ কেয়াম-কেরাত এবং রুকু-সাজদার সব কিছুতেই মোরগের মত ঠোকর মারে।

হযরত মোআজকে সংক্ষিপ্তাকারে নামায পড়ার জন্য মহানবীর আদেশ মোরগের ঠোকর খাওয়া নামাযীদের সংক্ষিপ্ত নামাযের জন্য দলীল নয়। বরং এর অর্থ হল নামাযের রোকন ও ওয়াজিবগুলো প্রশান্তি সহকারে আদায় করা, তাকে বেশি দীর্ঘায়িত না করা কিংবা ঠোঁকর খাওয়ার মত সংক্ষেপ না করা।

হাম্বলী মাজহাবের অনুসারী আবদুল ওয়াহেদ মাকদেসী ফরজ নামাযে দাঁড়ালে বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলে 'আউজুবিল্লাহিমিনাশ শায়তানির রাজীম' পড়ে শয়তান থেকে আশ্রয় চাইতেন, তারপর বড় করে তাকবীর বলতেন এবং সোবহানাল্লাহ পড়তেন। বর্ণনাকারী বলেন, 'তাঁর চেয়ে কাউকে এত উত্তম নামায, এত পরিপূর্ণ বিনয় ও খুশু' এবং সুন্দর কেয়াম, বসা ও রুকু করতে দেখিনি।'

নবী করীম (সঃ) নামাযে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মাত্রায় কেরাত পড়েছেন। এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি প্রথম রাকাতে এত লম্বা কেরাত পড়তেন যে, একজন বাকী নামক স্থানে গিয়ে পেশাব-পায়খানা সেরে অযূ করে এসে দেখত যে তিনি তখনও রুকুতে যাননি।

(৪৫) পুরুষের আগে মহিলাদের নামায না পড়া ঃ কেউ কেউ মনে করেন, পুরুষদের নামায শেষ হবার আগে নারীরা ঘরে নামায পড়তে পারে না, পড়লে সেটা ভুল হবে। এটা সম্পূর্ণ ভুল কথা। নামাযের সময় হলেই নারীরা নামায পড়তে পারবে। পুরুষের পরে পড়ার কোন নির্দেশ নেই।

(৪৬) নামাযে সালাম ফিরানোর সময় মাথা নাড়ানো ঃ কেউ কেউ সালাম ফিরানোর সময় মাথা নাড়ে, মাথা উঁচু করে, তারপর নিচু করে। এভাবে সালাম শেষ করে। এটা ঠিক নয়। সালাম ফিরানোর সময় মাথা সোজা রাখতে হবে। 'নবী করীম (সঃ) ডানদিকে 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বলে সালাম ফিরানোর সময় তাঁর ডান গাল মোবারকের শুভ্রতা দেখা যেত। অনুরূপভাবে, বামদিকে সালাম ফিরানোর সময়ও বাম গালের শুভ্রতা পরিলক্ষিত হত।' (আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিজী) তিনি মাথা নাড়াতেন বলে কোন বর্ণনায় আসেনি।

(৪৭) নামাযের পর পার্শ্ববর্তী মুসল্লীর সাথে মোসাফাহ করা ঃ ইমাম ইবনে তাইমিয়াকে নামাযের সালাম ফিরানোর পর মোসাফাহ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তরে বলেন ঃ এটা সুন্নত নয়, বরং বেদআত।[৩]

---

৩. মাজমুউল ফাতাওয়া, ২৩ খণ্ড, ২৩৯ পৃষ্ঠা।

ইমাম ইয্‌য বিন আবদুস সালামকে ফজর ও আসরের নামাযের পর মোসাফাহ্‌ করার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন, সেটা বেদআত। হাঁ, নবাগত ব্যক্তির সাথে মোসাফাহ্‌ করা যায়। কেউ বাইরে থেকে আসলে তার সাথে মোসাফাহ্‌ করা যায়। পক্ষান্তরে, সালাম ফিরানোর পর মহানবী (সঃ) তিনবার এস্তেগফার সহ বিভিন্ন দোআ ও জিকর-আজকার করতেন, কারো সাথে হাত মিলাতেন না। মহানবীর অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।[৪]

ইমাম নওয়ীও এটাকে বেদআত বলেছেন। তাঁর মতে সাক্ষাতের সময় মোসাফাহ্‌ করতে হয়। নামাযের পরে নয়।[৫]

(৪৮) তাসবীহ্‌র ছড়ার ব্যবহার ও আঙ্গুলে তাসবীহ্‌ পাঠ না করা ঃ সৌদী আরবের পরলোকগত মুফতী জেনারেল শেখ আবদুল আযীয বিন বাজকে হাতে তাসবীহ্‌ না গুনে তাসবীহ্‌র ছড়া ব্যবহার সম্পর্কে প্রশ্ন করায় তিনি জবাব দেন, তাসবীহ্‌র ছড়া ব্যবহার না করা উত্তম। কোন কোন আলেম এটাকে মাকরূহ বলেছেন। তিনি মহানবীর অনুসরণে হাতের আঙ্গুল দ্বারা তাসবীহ্‌ পড়াকে উত্তম বলেন। বর্ণিত আছে, 'রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) তাসবীহ্‌ ও তাহ্‌লীল হাতের আঙ্গুল দ্বারা করার আদেশ দিয়ে বলেছেন, এগুলো দায়িত্বশীল ভাষা প্রকাশক।' (আবু দাউদ)

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত। 'নবী করীম (সঃ) ডান হাতে তাসবীহ্‌ পাঠ করতেন।' (আবু দাউদ)

রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) অযূ-গোসল, জুতা পরিধান ও জুতা পায়ে দেয়ার সময় সর্বদা ডান দিক হতে আগে শুরু করাকে পসন্দ করতেন। সে ভিত্তিতে ডান হাতের আঙ্গুল দিয়ে তাসবীহ্‌ পাঠ করা উত্তম। তবে দু'হাতের আঙ্গুলেও তাসবীহ্‌ পাঠ করা যায়। কিছু হাদীসে হাতের আঙ্গুল দ্বারা তাসবীহ্‌ পাঠের কথা উল্লেখ আছে। হাত বলতে দু'হাতকে বুঝানো হয়।

তাসবীহ্‌র ছড়ার মাধ্যমে তাসবীহ্‌ পাঠ সম্পর্কিত বর্ণনাগুলো জাল ও দুর্বল। দাইলামী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে ঃ 'তাসবীহ্‌র ছড়া কতইনা উত্তম স্মরণকারী।' মোহাদ্দেসীনে কেরাম এটাকে জাল হাদীস বলেছেন।

আরেক হাদীসে এসেছে ঃ 'নবী করীম (সঃ) এক মহিলার কাছে প্রবেশ করে দেখেন, তার সামনে রয়েছে কতগুলো দানা বা কঙ্কর। সেগুলো দিয়ে

---

৪. ফাতাওয়াহ ইয্‌য বিন আবদুস সালাম ৪৬-৪৭ পৃঃ।

৫. ফতোয়া ইমাম নওয়ী ৩৯ পৃঃ।

তিনি তাসবীহ্ গুণেন। নবী করীম (সঃ) বলেন, আমি কি তোমাকে এর চেয়ে সহজ ও উত্তম জিনিস সম্পর্কে বলবনা? তিনি বলেন ঃ আর সেটা হল ঃ

سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ ١

– (আবু দাউদ, তিরমিজী)

হাদীসটির সনদ দুর্বল। বর্ণনাকারীদের মধ্যে একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি রয়েছেন।

'হযরত সফিয়াহ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সঃ) আমার কাছে প্রবেশ করেন। তখন আমার সামনে ছিল ৪ হাজার দানা ...। (তিরমিজী) হাদীসের সনদ দুর্বল। সৌদী আরবের স্থায়ী ফতোয়া কমিটি তাসবীহ্‌র ছড়া ব্যবহার প্রসঙ্গে বলেছে, নবী করীম (সঃ) হাতে তাসবীহ্ পাঠ করেছেন বলে প্রমাণিত। তাই নবী করীম (সঃ)-এর অনুসরণের মধ্যে রয়েছে সকল কল্যাণ। বিশেষ করে এবাদতের ক্ষেত্রে তা অধিক প্রযোজ্য। এবাদত স্রষ্টা কর্তৃক প্রেরিত, সৃষ্টি কর্তৃক সৃষ্ট নয়। তাই আল্লাহ কিংবা তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে না আসলে কোন জিনিসকে এবাদত হিসেবে নতুন করে চালু করা যাবে না। যেহেতু, তাসবীহ্‌র ছড়ার স্বপক্ষে শরীয়তের কোন দলীল-প্রমাণ নেই, তাই তা ব্যবহার করা ঠিক নয়। বরং একজন সাহাবী এর বিরুদ্ধে স্পষ্ট কথা বলেছেন। 'আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) এক মহিলার পাশ দিয়ে অতিক্রমের সময় তাকে তাসবীহ্‌র ছড়া দিয়ে তাসবীহ্ করতে দেখে তা ছিড়ে ফেলে দেন। তারপর তিনি আরেক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাবার সময় তাকে কঙ্কর দিয়ে তাসবীহ্ পাঠ করতে দেখে পা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে বলেন ঃ তোমরা অন্যায়ভাবে বেদআতী কাজ করছ অথবা তোমরা এলেম-জ্ঞানের দিক থেকে রসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) সাহাবায়ে কেরামের উপর প্রাধান্য লাভ করেছ।[৬]

এ দু'টো বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ) হাতের আঙ্গুলের পরিবর্তে তাসবীহ্‌র ছড়া, কঙ্কর ও দানা দিয়ে তাসবীহ্ করতে নিষেধ করেছেন। কেননা, তাসবীহ্ হচ্ছে এবাদত। আর তাসবীহ্‌র ছড়ার বিষয়ে মহানবী (সঃ) থেকে কোন বর্ণনা নেই। সেজন্য তা বেদআত।

এদিকে, প্রখ্যাত সাহাবী আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর কাছে একটা সূতো ছিল যাতে দু' হাজার গিরা ছিল। তিনি যতক্ষণ ঐ গিরাগুলো দ্বারা তাসবীহ্ না পড়তেন, ততক্ষণ শুতে যেতেন না। – (মোসনাদে আহমদ)

এ বর্ণনা এবং উপরে বর্ণিত দুর্বল হাদীসগুলোকে সামনে রেখে কোন কোনো আলেম তাসবীহ্‌র ছড়ার ব্যবহারকে জায়েয বলেছেন। তবে তারা আঙ্গুলে তাসবীহ্ গণনাকে উত্তম বলেছেন।

৬. মাজাল্লাতুল বুহুস আল-ইসলামিয়াহ, ১৯ শ খণ্ড, ১৪৩ পৃঃ।

(৪৯) এদিক-সেদিক তাকানো ঃ নামাযে আকাশের দিকে তাকানো নিষেধ। নবী করীম (সঃ) বলেছেন ঃ 'সম্প্রদায়ের লোকেরা নামাযে আকাশের দিকে তাকানো থেকে বিরত থাকবে, নতুবা তাদের চোখ তাদেরকে ফেরত দেয়া হবে না।'

– (মুসলিম, আহমদ, আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ, ইবনু খোযায়মা)

সুন্নত পদ্ধতি হল, মুসল্লী নিজ সাজদার জায়গায় দৃষ্টি রাখবে। এ মর্মে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) কা'বা শরীফে প্রবেশ করে বের হওয়ার আগ পর্যন্ত সাজদার জায়গা থেকে দৃষ্টি সরাননি। (হাকেম তাঁর মোসতাদরাক গ্রন্থে লিখেছেন, বোখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী এটা সহীহ হাদীস। আল্লামা জাহাবী তা সমর্থন করেছেন) নবী করীম (সঃ) তাশাহ্‌হুদের সময় শাহাদত আঙ্গুলীর দিকে তাকিয়েছিলেন। এ মর্মে আহমদ ও ইবনু খোজাইমা ভাল সনদ সহকারে আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের থেকে বর্ণনা করেছেন। 'নবী করীম (সঃ) তাশাহ্‌হুদের সময় বাম উরুর উপর বাম হাত এবং ডান উরুর উপর ডান হাত রেখেছেন। শাহাদত আঙ্গুলী দিয়ে ইশারা করেছেন এবং ইশারার দিকে তাকিয়েছিলেন।' এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তাশাহ্‌হুদের সময় শাহাদত আঙ্গুলীর দিকে তাকানো যায়।

(৫০) হাই তুলে মুখ বন্ধ না করা ঃ হাই তুললে মুখ বন্ধ করতে হবে, আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ নামাযে হাই তুললে যথাসাধ্য মুখবন্ধ করার চেষ্টা করবে। কেননা, শয়তান ভেতরে প্রবেশ করে।' (আবু দাউদ)

অন্য রেওয়ায়েতে যথাসাধ্য মুখ বন্ধের চেষ্টার অর্থ হল, হাত দিয়ে মুখ বন্ধ করা। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ হাই তুললে সে যেন হাত দিয়ে মুখ বন্ধ করে।' – (মুসলিম)

অলসতার কারণে এবং কোন সময় পেট ভরা থাকলে হাই তোলার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। ইবনুল আজ্জি বলেছেন, সর্বাবস্থায় হাই তোলার সময় মুখ বন্ধ করতে হবে। নামাযকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হল, নামাযই হচ্ছে তা প্রতিরোধের উত্তম স্থান, যাতে করে নামাযের ক্ষতি থেকে বাঁচা যায়। যদিও সর্বাবস্থায় হাই তুললে হাত দিয়ে মুখ বন্ধ করতে হয়।

(৫১) আজান হওয়ার পর মসজিদ থেকে বের হওয়া ঃ ইমাম মোনজেরী বলেছেন, ওজর ছাড়া আজান হবার পর মসজিদ থেকে বের হওয়া খুবই খারাপ কাজ। তিনি এ মর্মে উল্লেখ করেছেন ঃ 'আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি আজানের পর মসজিদ থেকে বেরিয়ে গেল। তিনি বলেন, এ লোকটি আবুল কাসেম [হযরত মোহাম্মদ (সঃ)] এর নাফরমানী করল।' (মুসলিম) ইমাম আহমদ আরো একটু বেশি বর্ণনা করেছেন। 'তোমরা মসজিদে থাকা অবস্থায় আজান হলে নামায পড়া ছাড়া বের হবে না।'

আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি আমার এ মসজিদে আজান হওয়ার পর কোন প্রয়োজনে বের হয়ে ফেরত না আসলে সে মোনাফেক ছাড়া আর কিছু নয়।' – (তাবরানী)

ইমাম তিরমিজী (রঃ) বলেছেন, নবী করীম (সঃ)-এর সাহাবায়ে কেরাম-এর উপরই আমল করেছেন। আজানের পর কেউ অযূ কিংবা অন্য কোন জরুরী কাজ ছাড়া বের হতেন না।

(৫২) সূরা ফাতেহা পড়ার পর ইমামের দীর্ঘ মৌনতা ঃ কিছু সংখ্যক মোহাক্কেক আলেম বলেছেন, মোক্তাদীর জন্য ইমামের সূরা ফাতেহা পড়ার লক্ষ্যে দীর্ঘ মৌনতা বেদআত। ইমাম ইবনে তাইমিয়া তাঁর মাজমু'উল ফাতাওয়ায় উল্লেখ করেছেন ঃ ইমাম আহমদ (রঃ) মোক্তাদীর সূরা ফাতেহা পড়ার সময় পরিমাণ মৌনতাকে পসন্দ করতেন না কিন্তু তাঁর কিছু সাথী তা পসন্দ করতেন। নবী করীম (সঃ) যদি একই উদ্দেশ্যে দীর্ঘ মৌনতা অবলম্বন করতেন তাহলে, সাহাবায়ে কেরাম তা অবশ্যই বর্ণনা করতেন এবং ঐ সময়ে তাদের নিজেদের সূরা ফাতেহা পড়ার কথা উল্লেখ করতেন। নবী করীম (সঃ) যে, সূরা ফাতেহার পরে মৌনতা অবলম্বন করেননি তা নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সঃ) নামাযের তাকবীরে তাহরীমার পর একটুখানি চুপ থাকতেন। আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি তাকবীর ও সূরা ফাতেহার মাঝে চুপ থেকে কি পড়েন? তিনি উত্তরে বলেন ঃ আমি নিম্নোক্ত দো'আটি পড়ি ঃ

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَایَ ....

রসূলুল্লাহ (সঃ) যদি সূরা ফাতেহার পর মোক্তাদীদের তা পড়ার জন্য ঐ পরিমাণ সময় চুপ থাকতেন তাহলে তারা প্রথম মৌনতার মতো ২য় মৌনতার বিষয়েও অনুরূপ প্রশ্ন করতেন।[৭]

সৌদী আরবের পরলোকগত জেনালে মুফতী শেখ আবদুল আযীয বিন বাজ এক প্রশ্নের জবাবে বলেছেন ঃ প্রকাশ্য কেরাতবিশিষ্ট নামাযে মোক্তাদীর সূরা ফাতেহা পড়ার জন্য ইমামের চুপ থাকার বৈধতার ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ নেই। তবে ইমাম চুপ থাকলে মোক্তাদীর জন্য সূরা ফাতেহা পড়া বৈধ। আর যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে মোক্তাদী ইমামের কেরাত পড়া অবস্থায় মনে মনে সূরা ফাতেহা পড়তে পারবে এবং এরপর চুপ থেকে ইমামের কেরাত শুনবে। কেননা, নবী করীম (সঃ) বলেছেন ঃ 'যে সূরা ফাতেহা পড়ে না, তার নামায হয় না।' – (বোখারী, মুসলিম)

---

৭. সিলসিলাতুল আহাদীস আস-সহীহা – নাসেরুদ্দীন আলবানী।

আরেক হাদীসে নবী করীম (সঃ) জিজ্ঞেস করেন, 'তোমরা সম্ভবত ইমামের পেছনে কেরাত পড়ে থাক? তাঁরা জবাবে বলেন, 'হাঁ'। তিনি বলেন, সূরা ফাতেহা ব্যতীত এরূপ করবে না। কেননা, যে সূরা ফাতেহা পড়েনা, তার নামায হয়না।' – (আবূ দাউদ ও ইবনে হিব্বান-হাদীসের সনদ ভাল)

উপরোক্ত হাদীসদ্বয় কোরআনের উল্লেখিত আয়াত এবং হাদীসের হুকুমকে বিশেষভাবে গ্রহণ করেছে। আয়াতটি হচ্ছে,

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

'যখন কোরআন পাঠ করা হয়, তা ভাল করে মনোযোগ দিয়ে শুন; তাহলে আশা করা যায় তোমাদের উপর রহম করা হবে।' অর্থাৎ কোরআন তেলাওয়াতের সময় চুপ থাকতে হবে।

হাদীসটি হল ঃ

اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهٖ فَلَا تَخْتَلِفُوْا عَلَيْهِ ـ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا قَرَأَ فَاَنْصِتُوْا

'অনুসরণের জন্যই ইমাম নির্ধারণ করা হয়েছে, তোমরা ইমামের বিরোধীতা করনা। ইমাম যখন তাকবীর বলে, তোমরাও তাকবীর বল এবং তিনি যখন কেরাত পড়েন তখন তোমরা চুপ করে তা শুন।' – (মুসলিম)

শেখ আবদুল আযীয বিন বাজ আরেক প্রশ্নের জবাবে বলেছেন ঃ মোক্তাদীর সূরা ফাতেহা পড়া ওয়াজিব কিনা এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মতভেদ আছে। যারা ওয়াজিব বলেছেন, তারা উপরোল্লিখিত প্রমাণাদির ভিত্তিতে এবং উল্লেখিত পদ্ধতিতে তা পড়ার কথা বলেছেন। অপরদিকে যারা বলেছেন, মোক্তাদীর জন্য এটা ওয়াজিব নয় তাদের প্রমাণ হল, আবু বাকরাহ সাকাফীর হাদীস। এ হাদীস অনুযায়ী বুঝা যায়, মোক্তাদী সূরা ফাতেহা পড়তে ভুলে গেলে কিংবা তা পড়ার বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে অজ্ঞ হলে তা তার জিম্মা থেকে কেটে যাবে। যেমন কোন ব্যক্তি ইমামকে রুকুতে পেলে সে ইমামের সাথে রুকুতে যাবে এবং ওলামায়ে কেরামের বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী তার নামায সহীহ হবে। 'আবু বাকরাহ সাকাফী মসজিদে নববীতে এসে নবী করীম (সঃ)-কে রুকুতে পেয়ে কাতারে শামিল না হয়ে পেছনে রুকুতে যান এবং পরে কাতারে শামিল হন। নবী করীম (সঃ) সালাম ফিরিয়ে বলেন, আল্লাহ তোমার আগ্রহ আরো বাড়িয়ে দিন। তবে আর কখনও এরূপ করবে না।' অর্থাৎ কাতারে শামিল হওয়া ছাড়া নামাযে প্রবেশ করবে না। তিনি তাকে সূরা ফাতেহা না পড়ার কারণে সে রাকাআতটি পরে আদায় করার নির্দেশ দেননি।

(৫৩) পিলারের সারিতে কাতার বাঁধা ঃ মসজিদের যে সারিতে খুঁটি বা পিলার আছে সে সারিতে কাতার দাঁড়ানো ঠিক নয়। বরং আগে-পরে কাতার দাঁড় করানো উচিত। এ মর্মে কাররাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সময় খুঁটিসমূহের মাঝে আমাদেরকে কাতার বাঁধতে নিষেধ করা হত এবং আমাদেরকে খুঁটি থেকে হটিয়ে দেয়া হত। (ইবনু মাজাহ, ইবনু খোজাইমাহ, ইবনু হিববান, হাকেম, বায়হাকী, তায়ালেসী। হাকেমের মতে হাদীসের সনদ সহীহ এবং আল্লামা জাহাবী তা সমর্থন করেছেন)

আবদুল হামিদ বিন মাহমুদ থেকে বর্ণিত। 'তিনি বলেন, আমি জুম'আর দিন হযরত আনাস বিন মালেকের সাথে নামায পড়েছি। তখন আমাদেরকে খুঁটির দিকে ঠেলে দেয়া হলে আমরা আগে-পিছে হলাম। তখন হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমরা নবী করীম (সঃ)-এর আমলে খুঁটি থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করতাম।' – (আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিজী, ইবনু হিব্বান, হাকেম)

ইমাম বায়হাকী বলেছেন, কাতারের মাঝে খুঁটি থাকলে তা কাতারের পরিপূর্ণতা সাধনে বাধার সৃষ্টি করে। তবে একাকী নামায আদায়কারী খুঁটির পাশে দাঁড়ালে কোন অসুবিধে নেই। কেননা, বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে, 'নবী করীম (সঃ) কা'বা শরীফে প্রবেশ করে সামনের দুই খুঁটির মাঝে নামায পড়েছেন।'

ইমাম শাওকানী বলেছেন, জাম'আতের কাতার পিলারের সারিতে মাকরূহ, একাকী নামায আদায়কারীর জন্য মাকরূহ নয়। কেননা, জাম'আতে খুঁটির কারণে কাতারে অপূর্ণতা থাকে।

ইমাম মালেকের মতে, ভীড়ের সময় মুসল্লীর সংকুলান না হলে পিলার বিশিষ্ট সারিতে জাম'আতে নামায আদায় করতে অসুবিধে নেই।

(৫৪) নামাযে একবার আগে, একবার পিছে যাওয়া ঃ বিনা প্রয়োজনে শারীরিক চালচলন নামাযের বিনয় ও খুশুর পরিপন্থী। তাই তা করা ঠিক নয়।

(৫৫) কেউ একাকী নামায পড়তে থাকলে তার সাথে এসে কেউ জাম'আতে শরীক হতে চাইলে নিষেধ করা ঃ সৌদী আরবের স্থায়ী ফতোয়া কমিটি বলেছে, কেউ একাকী নামায আদায়কারীর সাথে এসে যোগ দিয়ে জাম'আত করতে চাইলে সেটা জায়েয। তাই তাকে একা নামায আদায়কারীর নিষেধ করা উচিত নয়, এমনকি একা নামায আদায়কারী ফরজ না পড়ে নফল বা সুন্নত আদায় করলেও তার সাথে অন্য ব্যক্তি এসে ফরজ আদায় করতে পারবে। নফল ও সুন্নত আদায়কারীর পেছনে ফরজ নামায আদায় করা যায়।

এর প্রমাণ হল, 'হযরত মোআজ (রাঃ) নবী করীম (সঃ)-এর সাথে জাম'আতে ফরজ নামায আদায়ের পর নিজ গোত্রের কাছে গিয়ে তাদের ফরজ নামাযের ইমামতি করেছেন। তাঁর নামায ছিল নফল আর অন্যদের নামায ছিল ফরজ।' – (বোখারী, মুসলিম)

'নবী করীম (সঃ) যুদ্ধের ময়দানে ভয়কালীন নামাযে একদলকে নিয়ে দু'রাকাত পড়ে সালাম ফিরিয়েছেন এবং পরে অন্য দলকে নিয়ে আরো দু'রাকাত নামায পড়েছেন।' (আবু দাউদ) তাঁর ২য় নামাযটি ছিল নফল।

(৫৬) নামাযে সূরার ক্রমধারা অব্যহত রাখার উপর জোর দেয়া ঃ কোরআন শরীফের সূরাগুলোর ক্রমধারা কি আল্লাহ প্রদত্ত, না সাহাবায়ে কেরামের এজতেহাদ প্রসূত সে বিষয়ে মতভেদ আছে। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া এবং ইবনে কাসীরের মতে, তা এজতেহাদ প্রসূত। তাই সূরা আগে-পরে পড়লে কোন অসুবিধে নেই। এর প্রমাণ হল, 'হযরত হোজাইফা (রাঃ) বলেন ঃ আমি এক রাত নবী করীম (সঃ)-এর সাথে (তাহাজ্জুদ) নামায পড়ি। তিনি সূরা বাকারা দিয়ে নামায শুরু করেন। আমি ভাবলাম, ১শ' আয়াত শেষে তিনি রুকুতে যাবেন কিন্তু তিনি কেরাত পড়া অব্যহত রাখেন। আমি ভাবলাম, তিনি ১ম রাকাতে সূরা বাকারা শেষ করে রুকুতে যাবেন। কিন্তু তিনি পরে সূরা নেসা পড়লেন। তারপর সূরা আল-এমরান পড়া শুরু করেন এবং তা শেষ করেন .....।' (মুসলিম)

ইমাম নওয়ী কাযী আয়াযের বরাত দিয়ে বলেছেন, এটা প্রমাণ করে যে, কোরআনের বর্তমান সূরাসমূহের ক্রমধারা সাহাবায়ে কেরামের এজতেহাদ প্রসূত। কেননা, তাঁরা পরবর্তীতে এ কোরআন সংকলন করেছেন এবং এটা নবী করীম (সঃ)-এর প্রবর্তিত ক্রমধারা ছিল না। তিনি বিষয়টি উম্মতের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। ইমাম মালেকসহ অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মত এটাই। কাযী আবু বকর বাকেলানীর মতে, কোরআনের সূরাসমূহের ক্রমধারা হয় রসূল নির্ধারিত কিংবা এজতেহাদ প্রসূত। তা সত্ত্বেও পরবর্তীটাই বেশি শুদ্ধ।

মোটকথা, নামাযে সূরাসমূহের ক্রমধারা রক্ষা করার ব্যাপারে নবী করীম (সঃ) থেকে সুনির্দিষ্ট কোন আদেশ বা প্রমাণ নেই। তাই তা ওয়াজিব নয়। তবে ক্রমধারা রক্ষা করা উত্তম বলে সৌদী আরবের স্থায়ী ফতোয়া কমিটি মত প্রকাশ করেছে।[৮]

(৫৭) ইমামের সাথে একজন মোক্তাদী নামাযে দাঁড়ালে ইমামের একটু সামনে এগিয়ে দাঁড়ানো ঃ নিয়ম হল, ইমাম ও মোক্তাদী সম্পূর্ণ বরাবর

৮. মাজাল্লাতুল বুহুস আল-ইসলামিয়াহ-১৯/১৪৮।

অর্থাৎ একই সমান রেখায় দাঁড়াবে। কেউ আগে-পিছে দাঁড়াবেনা। ইমাম বোখারী (রঃ) বোখারী শরীফে 'দু'জন হলে মোক্তাদী ইমামের ডানে বরাবর দাঁড়াবে' এ শিরোনামে এক অধ্যায়ে ইবনে আব্বাসের একটি হাদীস উল্লেখ করে বলেন, তিনি তাঁর খালা মায়মুনার কাছে রাত্রি যাপন করেন। তিনি বলেন, নবী করীম (সঃ) ঘুমিয়ে পড়েন। তারপর তিনি উঠে (তাহাজ্জুদের) নামায পড়েন। ইবনে আব্বাসও তাঁর সাথে নামাযের উদ্দেশ্যে বামে দাঁড়ান। নবী করীম (সঃ) তাঁকে নিজের ডানে দাঁড় করান।' ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, এখানে ইমাম ও মোক্তাদী আগে-পিছে দাঁড়াননি।

আতা বিন আবি রেবাহও মোক্তাদীকে ইমামের বরাবর দাঁড়ানোর পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।

আবদুল্লাহ বিন আতাবাহ বিন মাসউদ বলেন ঃ আমি 'হাজেরাহ' নামক জায়গায় হযরত ওমরের কাছে গেলাম। তখন তিনি নফল নামায পড়ছিলেন। আমি তাঁর পেছনে দাঁড়াই। তিনি আমাকে তাঁর ডানে দাঁড় করান।'

— (মোআত্তা মালেক)

আল্লামা নাসেরুদ্দীন আলবানী (রঃ) বলেছেন, এক ব্যক্ত ইমামের সাথে নামায পড়লে তাকে ইমামের ডানে বরাবর দাঁড়াতে হবে, ইমাম থেকে আগে ও পিছে দাঁড়াবে না। (সিলসিলাতুল আহাদীস আস-সহীহাহ নং ৬০৬)

সৌদী আরবের সুপ্রিম ওলামা কাউন্সিলের সদস্য শেখ আবদুল্লাহ জিবরীন বলেন, ইমামের সাথে মোক্তাদী একজন হলে ইমাম মোক্তাদী থেকে প্রায় এক বিঘত এগিয়ে দাঁড়াবে মর্মে হানাফী মাজহাবের এ মতটি অগ্রাধিকারযোগ্য নয়। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হাদীস মোতাবেক মোক্তাদীকে ইমামের বরাবর দাঁড়াতে হবে।

(৫৮) ইমামের সালাম ফিরানোর পর অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করার জন্য আংশিক নামায আদায়কারী তথা মাসবুকের তার সাথে কোন ব্যক্তি নতুনভাবে জামা'আতে শরীক হতে চাইলে বাঁধা দেয়া ঃ জাম'আতে নামায পড়া জরুরী বিধায় যে কোন সুযোগের সদ্ব্যবহার করে মাসবুকের সাথে দাঁড়িয়ে একসাথে নামায আদায় করতে পারে। মাসবুকের একথা মনে করা উচিত নয় যে, সে অন্য এক ইমামের পেছনে আংশিক নামায আদায় করে এখন নিজে কি করে আরেকজনের ইমাম হতে পারে। শরীয়তে তাতে কোন বাধা নেই।

সৌদী আরবের ওলামায়ে কেরামের স্থায়ী ফতোয়া কমিটি এর স্বপক্ষে ফতোয়া দিয়েছে, এ মাসয়ালার সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদীস উল্লেখযোগ্য। 'নবী

করীম (সঃ) এক ব্যক্তিকে একা নামায পড়তে দেখে বলেন ঃ এমন কেউ আছে যে, এ ব্যক্তিকে দান করবে অর্থাৎ তার সাথে নামায পড়বে ?' (যেন তার নামায জাম'আতে হয়) – আবু দাউদ, তিরমিজী, ইবনু খোজায়মা, ইবনু হিব্বান, হাকেম)

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) রমজানে নামায পড়ছিলেন। আমি এসে তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে গেলাম। এরপর আরেক ব্যক্তি আমার পাশে এসে দাঁড়াল। তারপর আরেক ব্যক্তি আসায় আমরা এখন একটি দলে পরিণত হলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন বুঝলেন যে, আমরা একদল লোক তাঁর পেছনে নামায পড়ছি এবং তাঁকে ছাড়াই আমাদের জাম'আত বৈধ হবে, তখন তিনি নিজ ঘরে চলে গেলেন এবং নামায পড়লেন। কিন্তু আমাদের সাথে পড়লেন না। সকালে আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি রাত্রে আমাদের উপস্থিতি টের পেয়েছিলেন? তিনি বলেন, হাঁ, সেজন্যই আমি ঐরূপ করেছি। (মুসলিম) অর্থাৎ তাদের একজন তখন ইমামতি করেন।

'হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) নিজ হুজরায় নামায পড়ছিলেন। হুজরার দেয়াল ছিল খাট। লোকেরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে নামায পড়তে দেখে তাঁর সাথে জামাতে শরীক হয়ে যান, সকালে সবাই এ নামায সম্পর্কে আলোচনা করল। তিনি ২য় রাতও নামায পড়েন এবং লোকেরা তাঁর পেছনে নামায শুরু করেন। – (বোখারী)

উপরোক্ত হাদীসগুলো একাকী নামায আদায়কারী ব্যক্তির ইমাম হওয়ার বৈধতা প্রমাণ করে। এক্ষেত্রে ফরজ ও নফল-সুন্নতের মধ্যে পার্থক্য না করাই মূলনীতি। কেননা, পার্থক্য সৃষ্টির পক্ষে কোন প্রমাণ নেই।

(৫৯) মসজিদ থাকা সত্ত্বেও ঘর বা আঙ্গিনা কিংবা পার্কে নামায পড়া ঃ সৌদী আরবের পরলোকগত জেনারেল মুফতী শেখ আবদুল আযীয বিন বাজ বলেছেন, পার্ক ও অন্যত্র নামায পড়া ঠিক নয় বরং মসজিদে গিয়ে নামায পড়া জরুরী। আল্লাহ বলেছেন ঃ "আল্লাহ যে সকল ঘরকে সম্মান দান এবং সেগুলোতে তাঁর নাম উচ্চারণের আদেশ দিয়েছেন, সেখানে সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এমন লোকেরা, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে, নামায কায়েম করা থেকে এবং যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। তারা সেদিনকে ভয় করে, যে দিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে। (তারা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে) যাতে আল্লাহ তাদের উৎকৃষ্টতর কাজের প্রতিদান দেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও অধিক দেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে বিনা হিসেবে রিজিক দান করেন।" – (সূরা নূর-৩৮)

এ আয়াত মসজিদে নামায পড়ার তাকিদ দিয়েছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি আজান শুনল কিন্তু সাড়া দিল না তার নামায হবে না, তবে ওজর থাকলে ভিন্ন কথা।'

– (ইবনু মাজাহ, দারুকুতনী, ইবনু হিব্বান, হাকেম)

এক অন্ধ সাহাবী (আবদুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে মসজিদে নেয়ার মত কোন লোক নেই। আমাকে ঘরে নামায পড়ার অনুমতি দিন। নবী করীম (সঃ) বলেন, তুমি কি আজান শুনতে পাও? তিনি বলেন, হাঁ, নবী করীম (সঃ) বলেন, তাহলে, মসজিদে হাজির হও।'

– (মুসলিম)

যেখানে অন্ধ ব্যক্তিকেও মসজিদে হাজির হতে বলা হয়েছে, সেখানে অন্যদের মসজিদে না গিয়ে কি কোন উপায় আছে ?

(৬০) নামায শেষে সালাম ফিরানোর পর সবাইকে নিয়ে একসাথে হাত তুলে ইমামের দো'আ করা ঃ সৌদী আরবের সুপ্রিম ওলামা কাউন্সিলের সদস্য শেখ মোহাম্মদ বিন ওসাইমিন বলেছেন, এটা হচ্ছে বেদআত, যা নবী করীম (সঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত নেই। মুসল্লীদের জন্য যে জিনিস সুন্নত সেটা হল, রসূলুল্লাহ (সঃ) ফরজ নামায শেষে যে সকল দো'আ পাঠ করেছেন সেগুলো নিজে একা একা পাঠ করা এবং শব্দ করে উচ্চারণ করা। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। 'রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যুগে ফরজ নামায শেষে লোকেরা শব্দ করে দোআগুলো পাঠ করত।' (বোখারী)

(৬১) ফরজ নামাযের সালাম ফিরানোর পর কপালে হাত রেখে মনগড়া দো'আ পড়া ঃ কপালে হাত রেখে দো'আ পড়ার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসের সনদ দুর্বল বলে কেউ কেউ এরূপ দো'আ পড়াকে বেদআত বলেছেন। হাদীসগুলো হল ঃ

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) সালাম ফিরানোর পর ডান হাত মাথায় রেখে এ দোআটি পড়তেন ঃ

بِسْمِ اللهِ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّاهُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ - اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ عَنِّىْ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ

– (তাবরানী, নাইলুল আওতার, মুসনাদে বাজ্জার, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

নাসেরুদ্দীন আলবানী তাবরানীর আওসাতে বর্ণিত সনদ এবং খতীবের সনদকে দুর্বল বলেছেন এবং ইবনে সুন্নী ও নোআইমের বর্ণনাকে, জাল বলেছেন। ইবনু সুন্নীর 'আ'মালুল ইয়াওম ওয়াল লাইল' গ্রন্থে বর্ণিত দো'আটি হচ্ছে ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لَّااِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ـ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهِبْ عَنِّى الْهَمَّ وَالْحُزْنَ

কিন্তু এও বলেছেন, আল্লামা সুয়ূতী হাদীসটি খতীব থেকে 'আল জামে'তে বর্ণনা করেছেন। হাদীসের একটি সনদও আপত্তিকর নয়। তাই মনগড়া কোন দোআ পড়ার চাইতে এ দোআটি পড়া যেতে পারে।

(৬২) আজান ও একামাতে মোহাম্মদ (সঃ)-এর নাম শুনে নখে ও মুখে চুমা খাওয়া ঃ আজান ও একামতে 'মোহাম্মদার রসূলুল্লাহ শব্দটি শুনে নখে ও আঙ্গুলে চুমু খাওয়া সংক্রান্ত যে দু'টো হাদীস পাওয়া যায় সে দু'টো হাদীস সহীহ নয়। আল্লামা সাখাওয়ী বলেছেন, হাদীস দু'টোর সনদ মহানবী (সঃ) পর্যন্ত পৌছায় না। -(রদ্দে মোহতার, ১ম খণ্ড, ৩৭০)

আল্লামা আবদুল হাই লখনবীও তাই বলেছেন। তাঁর মতে, যারা বলে এ মর্মে হাদীস কিংবা সাহাবীদের আছার আছে সে মিথ্যুক এবং একাজটি জঘন্য বেদআত। - (সেআরাহ ২য় খণ্ড ; যাহরাহতু রিয়াদিল আবরার- ৭৬ পৃঃ)

অশুদ্ধ হাদীস দু'টো হল (১) নবী (সঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি মোআজ্জিনের اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً رَسُوْلُ اللّٰهِ বাক্যটি শুনে তা বলে এবং দু' হাতের তর্জনী আঙ্গুলদ্বয়ের ভেতরের অংশে চুমু খেয়ে তা চোখে লাগায় তার জন্য আমার সুপারিশ হালাল হয়ে যায়।' - (মোসনাদে ফেরদাউস- দাইলামী)

২য় হাদীসটি হল, খিজির (আঃ) থেকে বর্ণিত ঃ যে ব্যক্তি মোআজ্জিনের মুখে উপরোক্ত বাক্যটি শুনে বলে ঃ

مَرْحَبًا بِحَبِيْبِىْ وَقُرَّةِ عَيْنِىْ ـ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ـ

এবং তার বৃদ্ধাঙ্গুল দু'টোতে চুমু খেয়ে তা চোখে ঠেকায় সে অন্ধ হবে না এবং তার চোখও উঠবেনা।

(মোজেবাতুর রহমান ওয়া আযায়েমুল মাগফেরাহ- আবুল আব্বাস মাদানী সুফী)

(৬৩) ফরয নামাযের সালাম ফিরানোর পর রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বর্ণিত দোআ-জিকর না পড়া ঃ

১. তিন বার এস্তেগফার (গুণাহ মাফ চাওয়া) বা আস্তাগফেরুল্লাহ বলা। ২. একবার নিম্নের দোআ বলা ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ـ (মুসলিম)

৩.

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ - لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - اَللّٰهُمَّ لَامَا نِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَايَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ - لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ - وَلَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ - لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ - لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ -

৪. সোবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার এবং আল্লাহু আকবার ৩৪ বার। মোট হল ৯৯ বার। একশ' পুরণের জন্য নিম্নে দোয়াটি পড়তে হবে ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ - لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

ইচ্ছা করলে আল্লাহু আকবার ৩৪ বার পড়ে ১শ পূরণ করা যায়। আর কেউ ইচ্ছা করলে সোবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার ১০ বার করেও পড়তে পারে। আবার ইচ্ছা করলে নিম্নোক্ত দোআটি ২৫ বার পড়া যায় ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

ফলে, এর মধ্যে মওজুদ তাসবীহ, তাহমীদ, তাহলীল ও তাকবীর এ চারটি জিনিস ১শতবার আদায় হয়ে যায়।

৫. রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর এক সাহাবী-তামীমীকে বলেন ঃ তুমি যখন মাগরেব ও ফজরের নামাযে সালাম ফিরাবে তখন কারো সাথে কথা বলার আগে اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ ৭ বার বলবে। ঐ দিন বা রাতে মারা গেলে তোমার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি সনদ লিখে দেয়া হবে।

– (আবু দাউদ, মেশকাত)

৬. আয়াতুল কুরসী ৭. সূরা এখলাস ৮. সূরা ফালাক ৯. সূরা নাস। নবী করিম (সঃ) ফজর ও মাগরেবের নামাযের ফরজের পর সূরা তিনটি ৩ বার করে পাঠ করতেন। – (আহমদ)

এসকল দোআ-জিকর এবং অজীফা হাদীসে বর্ণিত আছে। আমাদের উচিত, এগুলো আমল করা।

(৬৪) সূরা-কেরাত ও দোআ-দরুদ পড়ার সময় জিহ্বা না নাড়ানো ঃ অধিকাংশ লোক দু'ঠোঁট বন্ধ রেখে এবং মুখ বা ঠোঁট না নেড়ে নামায শেষ করে। এটা ভুল। বরং সকল কিছু পড়ার সময় ঠোঁট নাড়ানো প্রয়োজন এবং তা সুন্নত। আবু মোআম্মার থেকে বর্ণিত। 'আমরা হযরত খাব্বাব (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, নবী করীম (সঃ) কি জোহর ও আসরের নামাযে কেরাত পড়তেন? তিনি জবাবে বলেন ঃ 'হাঁ।' আমরা জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কিভাবে তা বুঝতেন? তিনি বলেন, তাঁর দাঁড়ি মোবারকের নড়া-চড়া দ্বারা আমরা তা বুঝতাম।' (বোখারী)

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) বলেছেন, নামাযের কেরাত ও অন্যান্য ওয়াজিব জিকরগুলোতে জিহ্বা নাড়ানো ওয়াজিব যদি জিহ্বা নাড়ানোর শক্তি থাকে। মোস্তাহাব ও সুন্নত দোআ-জিকরগুলো পড়ার সময় ঠোঁট নাড়ানো মোস্তাহাব।

হানাফী মাজহাব এবং শাফেঈ ও হাম্বলী মাজহাবের প্রসিদ্ধ মত হল ঠোঁট নেড়ে মনে মনে ততটুকু শব্দ করে পড়া যেন নিজের পড়া নিজে শুনতে পায়।

(৬৫) রমজান মাসে তারাবীহ্‌র জামা'আত শুরু হলে এশার নামায আদায় করেনি এমন ব্যক্তিদের মসজিদের এক পার্শ্বে আলাদা এশার জামাত করাঃ এটা ভুল। তাদের ধারণা যে, তারাবীহ্‌র সুন্নত নামাযের জামা'আতে শরীক হলে এশার ফরজ আদায় হবে না। এ মর্মে সৌদী আরবের স্থায়ী ফতোয়া কমিটিকে প্রশ্ন করা হলে কমিটি বলে ঃ এশার ফরজ আদায়কারী ব্যক্তি তারাবীহ্‌র নামাযের জামা'আতে এশার নিয়তে শামিল হতে পারবে। অর্থাৎ সুন্নত কিংবা নফল নামায আদায়কারী ইমামের পেছনে ফরজ আদায়কারী ব্যক্তি নামায পড়তে পারে। 'এ মর্মে হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হযরত মোআজ (রাঃ) নবী করীম (সঃ)-এর সাথে এশার নামায জামাতে পড়ে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গিয়ে তাদের এশার নামাযের ইমামতি করেছেন।' -(বোখারী ও মুসলিম)[৯] তিনি নফল পড়েছেন আর অন্যরা ফরজ পড়েছে।

(৬৬) 'প্রকাশ্য কেরাতবিশিষ্ট নামাযে মহিলাদের গোপনে কেরাত পাঠ করা ঃ এর ফলে মহিলারা নিজেদের কেরাত শোনা থেকে বঞ্চিত থাকে। অথচ, তারাও পুরুষদের মত নিজ নিজ কেরাত শুনে নামাযে মন বসাতে এবং কেরাতের অর্থের দিকে মনোযোগ দিতে পারে। তারা সেটা না করে সুন্নতের

৯. মাজাল্লাতুল বুহুস আল-ইসলামিয়াহ-১৫/৭৯।

খেলাপ করে। সুন্নত হল, প্রকাশ্য কেরাতবিশিষ্ট নামাযে কেরাত প্রকাশ্যে পড়া।

সৌদী আরবের সুপ্রিম ওলামা কাউন্সিলের সদস্য শেখ সালেহ আল-ফাওজান বলেছেন ঃ পুরুষ ও নারীর মধ্যে প্রকাশ্য ও গোপন কেরাতবিশিষ্ট নামাযে হুকুমের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অর্থাৎ রাতের নামাযগুলোতে কেরাত প্রকাশ্যে এবং দিনের নামাযগুলোতে কেরাত গোপনে পড়ার যে বিধান তা নারী-পুরুষের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। মহিলারা ঘরে নামায পড়লে পুরুষদের মত কেরাত জোরে পড়বে। তবে যদি কোন অমহরম পুরুষের মহিলা কণ্ঠ শুনার আশঙ্কা থাকে, তখন তারা গোপনে কেরাত পড়বে। রাত্রে মহরম পুরুষের উপস্থিতিতে কেরাত প্রকাশ্যে পড়তে পারে এবং তাতে সুন্নতের সওয়াব লাভ করবে।[১০]

(৬৭) একামত হয়ে যাওয়ার পর কোন কারণে ইমামের নামায শুরু করতে দেরী হলে ২য় বার একামত দেয়া ঃ এটা ভুল। বরং একবার একামতই যথেষ্ট। ২য় বার একামত দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। ইমাম বোখারী (রঃ) বোখারী শরীফে "একামতের পর ইমামের কোন প্রয়োজন দেখা দিলে", এ শিরোনামে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, নামাযের একামত হয়ে গেছে, কিন্তু নবী করীম (সঃ) মসজিদের এক পার্শ্বে এক ব্যক্তির সাথে গোপন কথাবার্তা বলছিলেন। সকল লোক দাঁড়ানোর আগ পর্যন্ত তিনি নামায শুরু করেননি।'[১১] অর্থাৎ তিনি দেরীতে নামায শুরু করেছেন।

(৬৮) পায়ের আঙ্গুলের মাথা দিয়ে কাতার সোজা করা ঃ হাদীস শরীফে পায়ের গোড়ালী এবং কাঁধ এক সমান রেখে কাতার সোজা করার নির্দেশ রয়েছে। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ আমরা আমাদের নামাযের সাথীর সাথে কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাঁড়াতাম। হযরত নোমান বিন বশীর (রাঃ) বলেন ঃ আমি লোকদেরকে তার সাথীর কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের গোড়ালীর সাথে গোড়ালী মিলিয়ে কাতার সোজা করার ব্যাপারে মহানবী (সঃ)-এর আদেশ পালন করতে দেখেছি।

সৌদী আরবের সুপ্রিম ওলামা কাউন্সিলের সদস্য শেখ সালেহ ও সাইমীন বলেছেন, কাতার সোজা করার ব্যাপারে পায়ের গোড়ালীই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। গোটা শরীর গোড়ালীর উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন জনের আঙ্গুল বড় ছোট আছে। তাই আঙ্গুল কাতার সোজা করার ভিত্তি হতে পারে না।

---

১০. ফাতাওয়া নূর আলা-আদ-দারব শেখ ফাওজান, ১ম খণ্ড, ২০ পৃঃ।

১১. ফাতহুল বারী, ২য় খণ্ড, ১২৪ পৃঃ

সাহাবায়ে কেরাম একজন আরেকজনের সাথে গোড়ালী মিলিয়ে কাতার সোজা করতেন।[১২]

(৬৯) মুসাফিরের জন্য নামাযের জামাত জরুরী নয় মনে করা ঃ জামাতে নামায পড়া সর্বাবস্থায় ওয়াজিব। চাই কেউ মুসাফির হোক বা না হোক। মুসাফিরের জন্য ৪ রাকাতের মধ্যে দু'রাকাত জামাত সহকারে পড়তে হবে। ইমাম মুকীম হলে তার পেছনে ৪ রাকাতই পড়তে হবে।

মুসাফির কেবলমাত্র ফরজ নামায পড়বে। সুন্নত ও নফল নামায পড়া লাগবেনা। যেখানে ফরজের রেয়াতই দেয়া হয়েছে সেখানে সুন্নতের প্রয়োজন নেই।

(৭০) মোআজ্জিন আজানে حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ **এবং** حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ **বললে এর উত্তরে** لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ **না বলে** مَاشَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَالَمْ يَشَاءْ لَمْ يَكُنْ **বলা এবং** اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ **বললে এর উত্তরে** صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ **বলা ঃ** হাদীস শরীফে মহানবী (সঃ) বলেছেন ঃ 'মোআজ্জিনকে যা বলতে শুনবে তোমরাও তাই বলবে...শুধুমাত্র মোআজ্জিন حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বললে তোমরা উত্তরে বলবে ঃ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ। অন্য কিছু বলা ঠিক নয় বরং তা হাদীসের পরিপন্থী।

(৭১) স্বামী-স্ত্রীর দু'জনের মধ্যে একজনের বেনামাযী থাকা ঃ ইচ্ছাকৃত নামায লজ্ঘন বিরাট গুনাহ। নামায সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ মৌলিক বিষয় হল ইসলাম, এর খুঁটি হচ্ছে নামায এবং সর্বোচ্চ চূড়া হচ্ছে আল্লাহর পথে জিহাদ।' (আহমদ, তিরমিজী)

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন ঃ 'আমাদের ও তাদের মধ্যে পার্থক্য হল নামায। যে নামায ত্যাগ করল সে কুফরী করল।' (আহমদ, তিরমিজী, নাসাঈ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ।)

অন্য এক মত অনুযায়ী, বেনামাযী কাফের। কোন মুসলমানের সাথে তার বিয়ে হতে পারে না, আর হলেও বিয়ে বাতিল হবে। তার জানাযাও কাফন-দাফন দেয়া যাবে না, উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে, তার জবেহকৃত

---

১২. দুরুস ও ফাতাওয়া ফিল হারাম-আল-মক্কী-সালেহ ও সাইমীন-পৃষ্ঠা নং-৭৫।

পশু হালাল নয়, তাওবা করতে বলা হবে, তাওবাহ না করলে তাকে হত্যা করতে হবে। কেননা, সে মোরতাদ এবং মৃত্যুর পর তাকে একটি গর্ত খুঁড়ে মাটি চাপা দিতে হবে।

(৭২) নামাযের কেয়াম দীর্ঘায়িত করে রুকু সাজদাহ বেশি সংক্ষিপ্ত করা ঃ এটা ঠিক নয়। কেননা নবী করীম (সঃ) সমান হারে কেয়াম, রুকু ও সাজদাহ করতেন। এ মর্মে হযরত বারা বিন আযেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সঃ)-এর নামায লক্ষ্য করেছি। আমি তাঁর কেয়াম, রুকু, রুকু থেকে সোজা হওয়া, দু'সাজদার মাঝখানের বৈঠক, সাজদাহ এবং সালাম ফিরানোর আগে শেষ বৈঠক এগুলো সবই দেখেছি। এগুলো সময়ের দিক থেকে প্রায়ই সমপরিমাণের ছিল।' – (বোখারী, মুসলিম)

হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী করীম (সঃ) ছাড়া আর কারো পেছনে পরিপূর্ণ অথচ এত সংক্ষিপ্ত নামায পড়িনি। নবী করীম (সঃ) যখন 'সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে দাঁড়াতেন, তখন এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, আমরা ভাবতাম, তিনি বোধহয় (সাজদার কথা) ভুলে গেছেন। তারপর তাকবীর বলে সাজদায় যেতেন এবং দু'সাজদার মাঝখানে এত দীর্ঘ সময় বসতেন যে, আমরা ভাবতাম, তিনি (পরবর্তী সাজদার কথা) ভুলে গেছেন।'

ইবনুল কাইয়েম (রঃ) বলেন, এ দু'টো হাদীসের মূল কথা হল, কেয়াম এবং তাশাহহুদের বৈঠকের সময়ের পরিমাণ রুকু, সাজদা এবং এ দু'য়ের মধ্যে সোজা হওয়ার সময়ের পরিমাণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। অর্থাৎ এগুলো দীর্ঘ কিংবা সংক্ষিপ্ত ছিল, কোন পার্থক্য ছিল না। অথচ আমাদের মধ্যে অনেকে, বিশেষ করে তারাবীহর নামাযের মধ্যে, দীর্ঘ কেয়াম করে, কিন্তু রুকু-সাজদা করে সংক্ষিপ্ত।

পক্ষান্তরে, নবী করীম (সঃ) রাত্রের নফল নামাযে (কেয়ামুল লাইলে) যে পরিমাণ কেয়াম করতেন, কেয়াম থেকে উঠে সে পরিমাণ দাঁড়িয়ে থাকতেন, সে পরিমাণে সাজদা করতেন এবং দু' সাজদার মাঝখানেও অনুরূপ পরিমাণ বসতেন। পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদীনও অনুরূপ আমল করে গেছেন। হযরত আনাসের হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, নবী করীম (সঃ) কেয়ামের মতই রুকু, সাজদা এবং এতদুভয়ের মাঝখানে সোজা হওয়ার ব্যাপারে দীর্ঘ সময় নিতেন। আনাস (রাঃ) শুধুমাত্র দীর্ঘ কেরাত এবং অন্যগুলোকে সংক্ষিপ্ত করার বিরোধীতা করেছেন।

(৭৩) ৩ রাকাত কিংবা ৪ রাকাত বিশিষ্ট নামাযের ১ম তাশাহহুদের পর সময় থাকা সত্ত্বেও দোআ না পড়া ঃ যদি তাশাহহুদ পড়ার পর সময়

পর বসলে আত্তাহিয়্যাতু .... শেষ পর্যন্ত পড়বে। তারপর যে কোন পছন্দনীয় দোয়া করবে।' (নাসাঈ, আহমদ, তাবরানী)

আল্লামা নাসেরুদ্দীন আলবানী বলেছেন, এ হাদীস প্রথম তাশাহ্হুদের পর দোআ পড়ার বৈধতার প্রমাণ। ইবনু হাজমের মতও তাই। আর তাঁর মতটাই শুদ্ধ। অন্যরা হয়তো অন্য শর্তযুক্ত হাদীস দ্বারা তা খণ্ডন করতে চাইবে। কিন্তু এ হাদীস শর্তমুক্তভাবে দোআর বৈধতার প্রমাণ দিচ্ছে।

(৭৪) তাকবীরে তাহ্রীমার আগে জায়নামাযের দোআ পড়া ঃ এটাও ঠিক নয়। কেননা নবী (সঃ) তাকবীরে তাহ্রীমার পরে ঐ দোআটি পড়েছেন। – (রসূলুল্লাহর নামায নাসেরুদ্দীন আলবানী– ৫১ পৃঃ)

(৭৫) নামাযে ইমামের ভুল হলে আল্লাহু আকবার বলে ইমামকে সতর্ক করা ঃ এটা ভুল। সঠিক পদ্ধতি হল, সোবাহানাল্লাহ বলা এবং মহিলা মুসল্লীরা হাতে তালি লাগাবে। (বোখারী শরীফের ১ম খণ্ড, ৬৪৩ নং হাদীস এবং মুসলিম শরীফের ২য় খণ্ড, ৮৩২ নং হাদীস দ্রষ্টব)

(৭৬) ওমরী কাজা ঃ যারা বালেগ হওয়ার পর অজ্ঞতা, অবহেলা, অবজ্ঞা বা অন্য কোন কারণে নামায পড়েনি, হেদায়েতের অনুভূতি লাভের পর তারা অতীতের ঐ সকল নামাযগুলোর ক্ষতিপূরণের জন্য পেরেশান হয়ে যায়। সেজন্য সাধারণভাবে ওমরী কাজার ধারণা প্রচলিত রয়েছে। এ ধারণাটা কোরআন ও হাদীস সমর্থিত নয়। কাজা আদায় করতে হয় সুনির্দিষ্ট ওয়াক্তের হারানো নামাযের যা সুস্পষ্টভাবে জানা আছে। কিন্তু যে নামাযের সুনির্দিষ্ট নাম, ওয়াক্ত ও সংখ্যা জানা নেই, তার কাজা আন্দাজী করা যায় না। আন্দাজী কোন এবাদত হয় না। বরং বিনা ওজরে ছেড়ে দেয়া নামাযের জন্য তাকে যা করতে হবে তা হল, অতীতের গুণাহর জন্য তওবা-এস্তেগফার করা এবং কান্নাকাটি করা। আল্লাহ শিরক ছাড়া সকল গুনাহ মাফ করেন। তবে তওবা করলে শিরকও মাফ করেন। পক্ষান্তরে, বর্তমানে বেশী করে নফল ও সুন্নত নামায পড়লে অতীতের নফলগুলোসহ ছুটে যাওয়া ফরজসমূহের ক্ষতিপূরণ হবে, ইনশাআল্লাহ্। সহীহ হাদীসে আছে, কারো ফরজ নামায কম হলে নফল নামায তা পূরণ করে দেবে। (আবু দাউদ)

জুমুআর নামাযের প্রচলিত ৭টি ভুল সংশোধন

(১) গোসল না করা ঃ আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ

غَسْلُ يَوْمِ الْجُمْعَةِ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

'জুমু'আর দিন প্রত্যেক বালেগের গোসল করা ওয়াজিব।'
– (মোআত্তাসহ হাদীসের ৬টি বিশুদ্ধ কিতাব)

আবদুল্লাহ বিন ওমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "জুমআর দিন আসলে সেদিন তোমরা গোসল করবে।" (হাদীসের একাধিক বিশুদ্ধ কিতাব)

নবী করীম (সঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ জুমআ পড়তে চাইলে সে যেন গোসল করে।' – (মুসলিম)

(২) মুসল্লীদের ঘাড় টপকিয়ে সামনের কাতারে শরীক হওয়া ঃ আবদুল্লাহ বিন বোসর থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) খোতবা প্রদানের সময় এক ব্যক্তি লোকদের ঘাড়ের উপর দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি তাকে আদেশ দেন, বস, তুমি লোকদেরকে কষ্ট দিয়েছ।'

ইমাম তিরমিজী ঘাড় টপকিয়ে সামনে অগ্রসর হওয়াকে ওলামায়ে কেরামের মতে মাকরূহ বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম শাফেয়ীর মতে, এরূপ করা হারাম। ইমাম নওয়ী বলেছেন, সহীহ হাদীসের আলোকে তা হারাম। ইমাম আহমদের মতে, তা মাকরূহ।

আল্লামা এ'রাকী কা'ব আল-আহবার থেকে বর্ণনা করেছেন, আমি লোকদের ঘাড় টপকানোর চাইতে জুম'আ ত্যাগ করাকে পছন্দ করি। ইবনুল মোসাইয়ের বলেন ঃ মুসল্লীর ঘাড় টপকানো অপেক্ষা আমার কাছে নিজ ঘরে জুম'আর নামায পড়া উত্তম বলে বিবেচিত। ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মতে, তা হারাম।

(৩) জুমু'আর সময় দু'পা পেটের সাথে কাপড় দিয়ে বেঁধে রাখা কিংবা হাত দিয়ে ধরে রাখা ঃ মোআজ বিন আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। 'রসূলুল্লাহ (সঃ) জুম'আর সময় ইমামের খোতবা দানকালে পেটের সাথে দু'পা বেঁধে কিংবা হাত দিয়ে ধরে রাখতে নিষেধ করেছেন।

– (আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজী, হাকেম)

ইবনুল আসীর তাঁর 'আন-নেহায়া' গ্রন্থে লিখেছেন, এভাবে বসলে ঘুম আসে এবং অযূ ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এছাড়াও এর ফলে সতর খুলে যাওয়ার আশঙ্কাও থাকে।

(৪) জুমু'আর দিন ২য় আজানের সময় মসজিদে প্রবেশ করে আজানের জবাব দানের জন্য অপেক্ষা করা এবং খোতবার প্রারম্ভে তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায পড়া ঃ এর ফলে প্রবেশকারী সুন্নতের সওয়াব লাভের জন্য ওয়াজিব লঙ্ঘন করে। আজানের জওয়াব দেয়া সুন্নত, আর খোতবা শুনা ওয়াজিব। আজানের সময় মসজিদে প্রবেশকারীকে খোতবা শোনার স্বার্থে দু'রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ সংক্ষেপে পড়তে হবে। এ মর্মে নবী করীম (সঃ) বলেছেন ঃ 'ইমামের খোতবার সময় কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন দু'রাকাত নামায পড়ে এবং তাড়াতাড়ি করে।' – (মুসলিম, আহমদ, আবু দাউদ) যারা এ দু'রাকাত নামায পড়েনা, তারা হাদীসের বিরোধীতা করে।

(৫) জুমু'আর ফরজের পর কথা বা কাজ ব্যতীত অবিচ্ছিন্নভাবে সুন্নত পড়া ঃ নিয়ম হল, ফরজের পর কোন দরকারী মথা বলবে বা কোন কাজ করবে। তারপর সুন্নত নামায পড়বে। এ মর্মে নামেরের বোনের ছেলে সায়েব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাহাবী হযরত মোআওইয়ার সাথে মাকসুরায় নামায পড়েছি। ইমামের সালাম ফিরানোর পর একই স্থানে দাঁড়িয়ে আমি (সুন্নত) নামায পড়লাম। তিনি আমার কাছে লোক পাঠান এবং বলেন, তুমি যা করলে আর এরূপ করবে না, তুমি ফরজ পড়ার পর হয় কথা বলবে, আর না হয় বেরিয়ে যাবে। কেননা, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন কথা বলা কিংবা বের হওয়া ছাড়া পূর্ববর্তী নামাযের সাথে পরবর্তী নামায মিলিয়ে না পড়ি।' – (মুসলিম)

ইমাম নওয়ী (রঃ) বলেছেন ঃ আমাদের সাথীদের মতে, ফরজ নামাযের স্থান থেকে সরে গিয়ে সুন্নত ও নফল নামায পড়া মোস্তাহাব। উত্তম হল, মসজিদ থেকে ঘরে গিয়ে নফল ও সুন্নত পড়া। তা না হলে, মসজিদের অন্য স্থানে সরে গিয়ে নামায পড়া। এর ফলে সাজদার স্থান বাড়বে এবং ফরজের স্থান থেকে সুন্নত ও নফলের স্থানের মধ্যে পরিবর্তন হবে। কথার মাধ্যমে ও সংযোগহীনতা সৃষ্টি হয় তবে, স্থান পরিবর্তন উত্তম।[১]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) বলেছেন, জুম'আসহ অন্যান্য নামাযেও সুন্নত পদ্ধতি হল, ফরজ ও সুন্নতের মধ্যে সংযোগহীনতা সৃষ্টি করা। কেননা, 'নবী করীম (সঃ) দু'ধরনের নামাযকে এক সাথে মিলিয়ে পড়তে নিষেধ করেছেন, যে পর্যন্তনা দু'ধরনের নামাযের মধ্যে কেয়াম কিংবা কথা দ্বারা সংযোগহীনতা সৃষ্টি করা হয়।' অনেক লোক সালাম ফিরানোর পরপরই দু'রাকাত নামায পড়া শুরু করে। এটা ঠিক নয়। কেননা, এতে নবী করীম (সঃ)-এর নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়। এর লক্ষ্য হল ফরজ ও সুন্নত-নফলের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা।

(৬) জুমু'আর খোতবার সময় কথা বলা ঃ জুম'আর খোতবার সময় কথা বলা নিষেধ। এ মর্মে নবী করীম (সঃ) বলেছেন ঃ

اِذَا قُلْتُ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَنْصِتْ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ

'তুমি যদি জুম'আর সময় ইমামের খোতবা চলাকালে তোমার সঙ্গীকে চুপ করতে বল, তাহলে তুমি لغو করলে।' (বোখারী) لغو শব্দের বিভিন্ন অর্থ আছে। ১. ভুল করা, ২. সওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়া, ৩. জুম'আর ফজীলত বাতিল হওয়া ইত্যাদি।

১. শরহে মুসলিম-ইমাম নওয়ী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৭০-১৭১ পৃঃ।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন, খোতবার সময় কথা বললে তাকে চুপ থাকার নির্দেশ দেয়া সৎ কাজের আদেশের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও যদি সওয়াব বাতিল হয়ে যায় তাহলে, অন্য কোন শব্দ উচ্চারণের প্রশ্নই উঠে না। অর্থাৎ খোতবার সময় নিরিবিলি খোতবা শুনতে হবে। তাতে কোন কথা বলে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারবে না। তিনি আরো বলেন, এ হাদীস প্রমাণ করে যে, খোতবার সময় সকল প্রকার কথাবার্তা নিষিদ্ধ।[২] এমনকি কংকর সরানোও নিষিদ্ধ।

এ মর্মে ইবনুল মোনজেরী আরেকটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। আবু জার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আমি জুম'আর সময় মসজিদে প্রবেশ করলাম। তখন নবী করীম (সঃ) খোতবা দিচ্ছিলেন। আমি উবাই বিন কা'বের পাশে বসা ছিলাম। নবী করীম (সঃ) সূরা তাওবা পড়লেন। আমি উবাইকে জিজ্ঞেস করলাম, কবে এ সূরাটি নাজিল হয়েছে? তিনি আমার দিকে চেহারার চামড়া কুঁচকে অসন্তোষের দৃষ্টিতে তাকালেন এবং কোন কথা বললেন না। কিছুক্ষণ পর আমি পুনরায় একই প্রশ্ন করলে তিনিও একই ভাবের পুনাবৃত্তি করলেন এবং কোন উত্তর দিলেন না। নবী করীম (সঃ) নামায শেষ করেন। আমি উবাইকে প্রশ্ন করলাম, আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না কেন এবং চেহারার চামড়া কুঁচকালেন কেন? উবাই জবাব দেন, তুমি তো তোমার নামায বাতিল করেছ। আমি নবী করীম (সঃ)-এর কাছে এ ঘটনাটি খুলে বললে তিনি উত্তরে বলেন ঃ উবাই সত্য বলেছে।' (ইবনু খোজাইমা)

উবাইর সাথে আবদুল্লাহ বিন মাসউদেরও অনুরূপ এক ঘটনা ঘটেছিল। তিনিও নবী করীম (সঃ)-এর কাছে গিয়ে উবাইর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে নবী করীম (সঃ) বলেন, উবাই ঠিক বলেছে, উবাইকে অনুসরণ কর।'

– (আবু ইয়ালী, ইবনে হিব্বান)

জুম'আর খোতবা যে কত গুরুত্বপূর্ণ এবং তা শুনার প্রয়োজনীয়তা কতবেশি এটা উপরোক্ত হাদীসগুলো দ্বারা বুঝা যায়।

(৭) **খোতবার আগে সুন্নত পড়ার সময় দেয়া ঃ** অনেক মসজিদে জুম'আর খোতবার আগে বক্তৃতা হয়। বক্তৃতা শুনার জন্য আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, এখন কেউ নামায পড়বেন না খোতবার আগে সুন্নাত পড়ার সময় দেয়া হবে। এর ফলে, মসজিদে ঢুকে প্রথমে তাহিয়্যাতুল মসজিদ দু' রাকাত সুন্নত নামায পড়ার ব্যাপারে নবী করীম (সঃ)-এর আদেশের বিরোধীতা করা হয়। নবী (সঃ) বলেছেন ঃ

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتّٰى يُصَلِّىَ رَكْعَتَيْنِ

২. ফাতহুল বারী-শরহে বোখারী-ইবনে হাজার আসকালানী-২য় খণ্ড, ৪১৫ পৃঃ।

'তোমাদের কেউ মসজিদে ঢুকলে সে যেন দু' রাকাত নামায পড়ার আগে না বসে।' – (বোখারী)

অথচ, বক্তৃতা শোনার জন্য তাকে সে আদেশ পালন করা থেকে বারণ করা হয়। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আদেশ লংঘনের মধ্যে কি কোন কল্যাণ আছে?

এ সমস্যার মূল কারণ হল, স্থানীয় ভাষায় খোতবা না দেয়া। আরবি খোতবা লোকেরা বুঝে না বলে আগে বাংলায় বক্তৃতা করে এর ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করা হয়। এর ফলে তিনবার খোতবা হতে হয়। নবী (সঃ) মাত্র দু'টো খোতবা দিয়েছেন। স্থানীয় ভাষায় খোতবা দেয়া সম্পূর্ণ জায়েয। এ মর্মে ওলামায়ে কেরামের ফতোয়া রয়েছে। দীনের মধ্যে কোন কিছু যোগ-বিয়োগ করা যায় না।[৩]

অযূ-গোসলের প্রচলিত ১৮টি ভুল সংশোধন

(১) অযূ করার সময় প্রকাশ্যে নিয়ত উচ্চারণ করা ঃ এটা সুন্নতের খেলাপ। সুন্নত পদ্ধতি হল, মনে মনে অযূর নিয়ত করা এবং মুখে উচ্চারণ না করা। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) বলেছেন, মুখে নিয়তের উচ্চারণ বুদ্ধি ও দ্বীনদারীর ঘাটতি। দ্বীনদারীর ঘাটতি হল এটা বেদআত। আর বুদ্ধির ঘাটতির উদাহরণ হল কেউ খাওয়ার সময় যদি অনুরূপ নিয়ত করে যে, 'আমি খাবারের এ পাত্রটিতে হাত দেয়ার নিয়ত করলাম, আমি তা থেকে এক লোকমা মুখে দিয়ে চিবিয়ে গিলে তৃপ্ত হওয়ার নিয়ত করলাম।' মোটকথা, এগুলো ঠিক নয়।

ইবনুল কাইয়েম (রঃ) বলেছেন, নবী করীম (সঃ) অযূর শুরুতে

نَوَيْتُ اَنْ اَتَوَضَّأَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَاسْتِبَاحَةٍ لِلصَّلَاةِ وَتَقَرُّ بًا اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى

বলতেন না, কিংবা কোন সাহাবায়ে কেরাম থেকে অনুরূপ কিছু বর্ণিত নেই। এমনকি কোন দুর্বল হাদীসেও এরূপ কোন বর্ণনা আসেনি।

লোকেরা অযূর দোআ– এ নামেও একটি দোআ পড়ে। সেটি হল ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ ـ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ ـ اَلْاِسْلَامُ حَقٌّ وَ الْكُفْرُ بَاطِلٌ ـ اَلْاِسْلَامُ نُوْرٌ وَالْكُفْرُ ظُلُمَاتٌ

এরূপ দোআর সমর্থনেও কোন হাদীস বা সাহাবায়ে কেরামের সমর্থন নেই। তাই এগুলো থেকে বিরত থাকা উচিত।

৩. এ মর্মে লেখকের 'ইসলামে মসজিদের ভূমিকা' বই এর খোতবা অংশ দ্রষ্টব্য।

ইবনুল কাইয়েম (রঃ) বলেছেন, অযূর শুরুতে নবী করীম (সঃ) থেকে বিসমিল্লাহ এবং অযূ শেষে নিম্নোক্ত দোআ ছাড়া আর কিছু বর্ণিত নেই ঃ

১ম

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ - اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ (মুসলিম-তাহারাত অধ্যায়)

২য়

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ (সুনানে নাসাঈ)

(২) **অযূ-গোসলে পানির অপচয় করা ঃ** যারা পুকুর-নদীনালা ও সাগরে অযূ করে এবং যারা কলের পানি বা কূপের পানি দিয়ে অযূ করে তাদের উভয়ের বেলায় পানির অপচয়ের বিষয়টি প্রযোজ্য।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। 'নবী করীম (সঃ) ৫ মোদ পানি দিয়ে গোসল এবং এক মোদ পানি দিয়ে অযূ করতেন।' – (বোখারী)

ইমাম বোখারী বলেছেন, ওলামায়ে কেরাম পানির অপচয় এবং নবী করীম (সঃ)-এর ব্যবহৃত পানির পরিমাণ অতিক্রম করাকে মাকরূহ বলেছেন। – (বোখারী কিতাবুল অযূ)

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) বলেছেন, নবী করীম (সঃ) সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈগণ, কেউ বেশি পানি ব্যবহার করতেন না।

সা'দ বিন আবি আক্কাস বেশি পানি দিয়ে অযূ করছিলেন। নবী (সঃ) তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন। তিনি বলেন, হে সা'দ, তুমি পানির অপচয় করছ কেন ? সা'দ জবাব দেন, অযূর মধ্যেও কি অপচয় আছে ? নবী (সঃ) বলেন, 'হাঁ', যদি তুমি প্রবহমান নদীর মধ্যেও অযূ কর। (ইবনু মাজাহ) অপচয় সব ক্ষেত্রেই নিষিদ্ধ।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেছেন, কম পানি ব্যবহার ব্যক্তির বুদ্ধি প্রতিপত্তির প্রমাণ। তাঁর ছাত্র মারওয়াজী বলেন, আমি আবু আবদুল্লাহকে (ইমাম আহমদ) অযূর সময় লোক চক্ষুর আড়াল করে রাখতাম যেন তাঁর কম

ব্যবহারের কারণে তারা না বলে যে তিনি ভাল করে অযূ করেন না। তিনি অযূ করলে মাটি প্রায় ভিজত না।

আবুল ওফা ইবনু আ'কীল বলেন, নবী করীম (সঃ)-এর চরিত্রে ও এবাদতে বেশি পানি ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না।

– (জাইল তাবাকাতিল হানাবেলা, ১ম খণ্ড, ১৫০ পৃঃ)

আবদুল্লাহ বিন মোগাফ্‌ফাল থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে পবিত্রতা অর্জন ও দোআয় সীমালঙ্ঘনকারী একদল লোকের আবির্ভাব ঘটবে।'

– (আহমদ, আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম)

আ'ওনুল মা'বুদ কিতাবের লেখক বলেছেন, তিন কাজে সীমালঙ্ঘন হতে পারে। (ক) তিনবারের বেশি অঙ্গ ধোঁয়া, (খ) পানি বেশি খরচ করা এবং (গ) ওয়াসওয়াসার কারণে প্রয়োজনের চেয়ে অঙ্গের বেশি অংশ ধোঁয়া। তারপর তিনি বলেন, ওলামায়ে কেরাম পানির অপচয় নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন যদিও সেটা সাগরের তীরের পানিই হোক না কেন।

(৩) ভালভাবে ও পরিপূর্ণ উপায়ে অযূ না করা ঃ মোহাম্মদ বিন যিয়াদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) আমাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমি তাঁকে বলতে শুনেছি ঃ 'তোমরা ভাল করে অযূ কর। আবুল কাসেম মোহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, পায়ের গোড়ালীর জন্য দোজখের আগুনের ধ্বংস।' (বোখারী) অর্থাৎ পায়ের গোড়ালী সাধারণত ভাল করে ধোঁয়া হয় না বলে তাতে পানি পৌঁছে না। তাই তা দোজখের কারণ হবে।

খালেদ বিন মা'দান নবী করীম (সঃ)-এর এক স্ত্রী থেকে বর্ণনা করেছেন, 'রসূলুল্লাহ (সঃ) এক ব্যক্তিকে নামায পড়তে দেখেন, অথচ তার পায়ের উপরের অংশে এক সিকি পরিমাণ জায়গা শুকনো রয়েছে। তিনি তাকে পুনরায় অযূর নির্দেশ দেন।' (আহমদ) আবু দাউদ আরো একটু বেশি বর্ণনা করে বলেছে, তিনি তাকে নামায পুনরায় পড়ারও নির্দেশ দেন।' ইমাম আহমদ বলেন, এ হাদীসের সনদ ভাল।

আল্লামা শাওকানী বলেছেন, যে ব্যক্তি এ পরিমাণ স্থান শুকনো রেখেছে, এ হাদীস তার পুনঃ অযূর ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ।

অযূর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা জরুরী। বহু লোক অযূর অঙ্গগুলোতে ঠিকমত পানি পৌঁছেছে কিনা তার প্রতি গুরুত্ব দেয় না। তাদের জন্য নিম্নের হাদীসগুলো খুবই উপকারী।

হযরত ওসমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। 'রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নামাযের জন্য ভালভাবে অযূ করল, ফরজ নামায পড়ার জন্য রওনা হল এবং লোকদের সাথে জাম'আতে নামায পড়ল, আল্লাহ তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন।' – (মুসলিম, আহমদ, নাসাঈ)

আবু আইউব এবং ওকবা বিন আমের থেকে বর্ণিত। 'রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যেভাবে হুকুম দেয়া হয়েছে সেভাবে অযূ ও নামায পড়লে তার অতীতের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।'

– (আহমদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, ইবনু হিব্বান)

(৪) পেশাবের অপবিত্রতা থেকে না বাঁচা ঃ নবী করীম (সঃ) এটাকে কবীরা গুনাহ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কা কিংবা মদীনার একটি বাগানের পাশ দিয়ে অতিক্রমের সময় দু'ব্যক্তির কবর থেকে চিৎকার শুনে বলেন, তারা বড় কোন বিষয়ে আজাব ভোগ করছে না। তারপর বলেন, তাদের একজন পেশাবের অপবিত্রতা থেকে বাঁচার চেষ্টা করত না এবং অন্যজন চোগলখুরী করত। তারপর তিনি খেজুরের একটি ডাল আনার নির্দেশ দেন। তিনি এটাকে ভেঙ্গে দু'টুকরো করেন এবং দু'কবরের উপর দু'অংশ গেঁড়ে দেন। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রসূল! আপনি এটা কেন করলেন? তিনি জবাব দেন, এগুলো শুকানোর আগ পর্যন্ত আল্লাহ তাদের আজাব লাঘব করতে পারেন।'

– (বোখারী)

পেশাব করার সময় পেশাব বা পেশাবের ছিঁটা গায়ে বা কাপড়ে পড়লে তা নাপাক হয়ে যায়। নাপাক শরীর ও কাপড় দিয়ে নামায পড়লে নামায হবে না।

(৫) পেশাব-পায়খানা করার সময় সতর ঢেকে না রাখা ঃ উরু ঢাকা জরুরী এবং তা সতরের অন্তর্ভুক্ত। অনেকে উরু খোলা রেখে পেশাব-পায়খানা করে। 'একবার নবী করীম (সঃ) জোরহোদ নামক সাহাবীর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলেন, হে জোরহোদ, তোমার উরু ঢাক, কেননা, উরু হচ্ছে সতর।' – (আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজী, ইবনে হিব্বান, হাকেম)

'রসূলুল্লাহ (সঃ) আরো বলেছেন ঃ নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত সতর।'

– (হাকেম)

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ উরু সতর।'

– (তিরমিজী)

তাই পেশাব-পায়খানা করার সময় উরু ঢেকে বসতে হবে।

(৬) পেশাব থেকে পবিত্রতার নামে বাড়াবাড়ি করা ঃ কিছু লোক পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জনের নামে শয়তানের ওয়াসওয়াসার শিকার। তারা পবিত্রতার জন্য মাত্রাতিরিক্ত কষ্ট স্বীকার করে। এজন্য কৃত্রিমতা অবলম্বন করতে গিয়ে শরীয়তের সীমালঙ্ঘন করে। তারা পেশাবের সর্বশেষ ফোঁটা বের করার জন্য পুরুষাঙ্গ ধরে ৪০ কদম হাঁটে, এক পা, এক পা করে দু'পা দিয়ে চিপে, যেন সেনাবাহিনীর কসরত! তাঁদের যুক্তি হল, বদনার পানি ফেলে দেয়ার পর উপুড় করে রাখলে অল্প অল্প করে ফোঁটা তৈরি হয়ে নিচে পড়ে। তেমনি পেশাবও আস্তে আস্তে ঝরে পড়ে। এজন্য কাশি দেয় এবং গলা ঘক্ ঘক্ করে।

আল্লামা ইবনুল কাইয়েম (রঃ) বলেছেন, শয়তানের ওয়াসওয়াসাগ্রস্ত লোকেরা পেশাবের পর ১০টি কাজ করে। সেগুলো হল ঃ ১. পুরুষাঙ্গকে গোড়া থেকে মাথা পর্যন্ত হাত দিয়ে টেনে এবং চিপে পেশাবের সর্বশেষ ফোঁটা বের করে। ২. গলা ঘক্ ঘক্ করা যেন অবশিষ্ট পেশাব বের হয়। ৩. নিচ থেকে উপরে ওঠে তাড়াতাড়ি বসে পড়ে। ৪. রশি বেয়ে উপরের দিকে ওঠার পর নিচে নেমে বসে পড়ে। ৫. পুরুষাঙ্গের মাথায় পেশাবের ফোঁটা দেখে পুরুষাঙ্গের ছিদ্রকে ফাঁক করে ধরে পবিত্রতার জন্য পানি ঢালে। ৭. পুরুষাঙ্গের মাথায় তুলা দিয়ে রাখে। ৮. পুরুষাঙ্গের মাথায় ন্যাকড়া বেঁধে রাখে। ৯. সিঁড়ি বেয়ে উপরে একটু উঠার পর দ্রুত নেমে আসে। ১০. কিছুক্ষণ হাঁটার পর পুনরায় কুলুখ ব্যবহার করে।

ইবনুল কাইয়েম বলেন, আমাদের ওস্তাদ শেখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন ঃ এগুলো সবই শয়তানের ওয়াসওয়াসা এবং বেদআত। তিনি বলেন, প্রথম দু'টোর বিষয়ে হাদীস তালাশ করে সহীহ কোন হাদীস পাইনি বরং ২য়টির ব্যাপারে একটি দুর্বল হাদীস রয়েছে যার উপর আমল করা যায় না। তিনি বলেন, পেশাবের উদাহরণ হল স্তনের দুধের মত। দোহন করলে দুধ বের হবে, আর ছেড়ে দিলে দুধ স্থিতিশীল থাকবে, অর্থাৎ কিছুই বের হবে না। যারা এ কাজের বদ অভ্যাস করেছে তারা ওয়াসওয়াসার শিকার। আর যারা তা করেনি তারা তা থেকে মুক্ত। যদি এ সকল কাজ সুন্নত হত, তাহলে এগুলো সবার আগে রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং সাহাবায়ে কেরামগণ করতেন।[১]

শেখ মোহাম্মদ বিন আবদুস সালাম বলেন ঃ শয়তানের ওয়াসওয়াসাগ্রস্ত লোকেরা উপরোক্ত যে ১০টি কাজ করে, মহানবী (সঃ) তা করেননি। এগুলো সবই শয়তানের ওয়াসওয়াসা এবং গোমরাহী।[২]

---

১. এগাছাতুল লাহফান-ইবনুল কাইয়েম, ১ম খণ্ড, ১৪৩, ১৪৪ পৃঃ।

২. আস-সুনান ওয়াল মোবতাদেআ'ত-পৃঃ ২৫।

পুরুষাঙ্গ ধরে হাটাহাটি করাই সতর লংঘন। পুরুষাঙ্গ ধরে হাটা অত্যন্ত লজ্জার বিষয়ও বটে। অনেকে বাড়িতে মেয়েলোকের সামনেও এ কাজ করে। মেয়েলোকেরা লজ্জা পায়। কোন মেয়ে লোক যদি পুরুষের সামনে নিজ লজ্জাস্থান ধরে এভাবে হাঁটত তখন সেটা কি রকম বেহায়াপনা হত। এটাও ঠিক তেমনি এক ভয়াবহ বেহায়াপনা। পেশাব ধীরে সুস্থে করতে হবে। এরপর ঢিলা বা পানির যে কোন একটা ব্যবহার করলেই পাক হওয়া যায়। তাড়াহুড়া করে পেশাব করলে পেশাব ঝরার আশঙ্কা থাকতে পারে। কিন্তু ধীরে সুস্থে পেশাব করলে সে আশঙ্কা থাকে না। তাই নিজেদেরকে বিনা প্রয়োজনে ঐ সকল বদ অভ্যাসের রোগী বানানো ঠিক হবে না। আর যাদের পেশাব ঝরার রোগ আছে তারা প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য নতুন অযূ করে নেবেন।

(৭) পেশাব-পায়খানার বেগ নিয়ে নামায পড়া ঃ এটা ঠিক নয়। এর ফলে নিজের কষ্ট তো আছেই। এছাড়াও নবী করীম (সঃ)-এর আদেশের বিরোধীতা করা হয়। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সঃ) বলেছেন, খাওয়া উপস্থিত হলে এবং দু'টো নিকৃষ্ট জিনিসকে (পেশাব-পায়খানা) দমন করা অবস্থায় নামায হতে পারে না। – (মুসলিম)

(৮) ঘুম থেকে জেগে হাত না ধুয়ে পানির পাত্রে হাত ঢুকানো ঃ হাদীসের মধ্যে এসেছে, পানির পাত্রে হাত ঢুকানোর আগে হাত ধুয়ে নিতে হবে। আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'তোমাদের কেউ ঘুম থেকে জাগলে তিনবার হাত ধোয়ার আগে সে যেন পানির পাত্রে নিজ হাত না ঢুকায়। তোমরা জাননা, তোমাদের হাত রাত্রে কোথায় বাস করেছে।' – (মালেক, শাফেঈ, আহমদ, বোখারী, মুসলিম এবং অন্য ৪টি হাদীসের বিশুদ্ধ কিতাব)

শেখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, হাত ধোয়ার পেছনে তিনটি হেকমত থাকতে পারে। ১. পায়খানা-পেশাবের রাস্তায় হাত লাগলে নির্গত ঘাম বা নাপাকী হাতে লাগতে পারে। ২. হাতের মধ্যে শয়তানের স্পর্শ লাগতে পারে। যেমন, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। নবী করীম (সঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ ঘুম থেকে জাগলে সে যেন নিজের নাকের দুটো ছিদ্র ভাল করে ঝেড়ে নেয়। শয়তান তার নাকের ছিদ্রের ভেতর বাস করে।' (বোখারী, মুসলিম) এ হাদীস দ্বারা নাক পরিস্কার করার যে কারণ জানা গেল, সেটা হল, সেখানে শয়তানের রাত্রি যাপন। তাই একই কারণ হাত ধোয়ার পেছনেও প্রযোজ্য হতে পারে। ৩. এটা এবাদতের বিষয় যার অর্থ আমাদের বোধগম্য নয়।

(৯) অযূর শুরুতে বিসমিল্লাহ না বলা ঃ সাঈদ বিন যায়েদ এবং আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'অযূ ছাড়া নামায হয়না এবং বিসমিল্লাহ বলা ছাড়া অযূ হয়না।' (আহ্‌মদ, আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ, হাকেম)। সৌদী আরবের সুপ্রিম ওলামা কাউন্সিলের সদস্য শেখ আবদুল্লাহ জিবরীন বলেছেন, কোন কোন আলেমের মতে, পেশাব ও পায়খানায় বিসমিল্লাহ বলা মাকরূহ এবং অযূতে বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব।

– (শরহু মানার আস-সাবীল)

(১০) গর্দান মাসেহ করা ঃ গর্দান মাসেহ করার ব্যাপারে মহানবী (সঃ) থেকে কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত নেই। তালহা বিন মাসরাফ তার বাপ থেকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ঘাড় মাসেহ সম্পর্কিত বর্ণিত হাদীস দুর্বল। তাই ইমাম নওয়ী, ইবনে তাইমিয়া এবং ইবনে হাজার আসকালানী এটাকে দুর্বল হাদীস বলেছেন।

(১১) হাতের কনুই না ধোয়া ঃ মহানবী (সঃ) হাত ধোয়ার সময় কনুই পর্যন্ত ধুতেন। তাই আমাদেরও তা করা উচিত। অন্যথায় অযূ হবে না।

(১২) গোসলের সময় মোটা মানুষের চামড়ার ভাঁজে পানি না পৌঁছানো ঃ মোটা মানুষের শরীরে গোশতের প্রাচুর্যের কারণে চামড়ার নিচে ভাঁজ পড়ে যায়। ফরজ গোসলের সময় তাতে পানি না পৌঁছলে সে গোসল দ্বারা শরীর পাক হবে না এবং কোন এবাদতও কবুল হবে না। তাই ভালভাবে অযূ-গোসল করতে হবে।

(১৩) হাতের আংটি ও ঘড়ির নিচে পানি না পৌঁছানো ঃ এতে করে ঐ জায়গাটুকু শুকনো থাকবে এবং ঐ অযূ-গোসল দিয়ে নামায জায়েয হবেনা।

ইমাম বোখারী বলেছেন, সাহাবী ইবনে সিরীন (রাঃ) অযূর সময় আংটির নিচে পানি পৌঁছাতেন।

(১৪) হাতের মধ্যে রং লাগলে কিংবা নখ পলিশ ব্যবহার করলে তা দূর করার আগে অযূ হবে না ঃ রং লাগলে সে জায়গায় পানি পৌঁছে না। অনুরূপ নখ পলিশ ব্যবহারের কারণেও সেখানে পানি পৌঁছেনা। তাই অযূ-গোসলের আগে কেরোসিন জাতীয় জিনিস ও রং এবং নখ পালিশ দূরকারী রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে তা দূর করতে হবে।

(১৫) যমযমের পানি দিয়ে অযূ না করা ঃ যেকোন পানি দিয়েই অযূ-গোসল সবই করা যায়। সেটা যমযমের পানি হলেও। আবদুল্লাহ বিন আহমদ থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর 'যাওয়ায়েদ আল-মোসনাদ' গ্রন্থে হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (সঃ) হজ্জ থেকে ফিরে

মসজিদে হারামে পৌঁছে এক বালতি পানি আমার আদেশ দেন। তিনি সে পানি পান করেন এবং তা দিয়ে অযূ করেন।

আল্লামা সা'আতী বলেছেন, এর দ্বারা বুঝা যায় যে, যমযমের পানি পান করা ও তা দিয়ে অযূ করা মোস্তাহাব।' (আল-ফাতহুর রাব্বানী-১১শ খণ্ড, ৮৬ পৃঃ) ইমাম নওয়ী শরহে মুসলিমে লিখেছেন, হযরত আব্বাস (রাঃ) থেকে যমযমের পানি দ্বারা গোসল করা নিষিদ্ধ মর্মে বর্ণনা সহীহ নয়।

সৌদী আরবের পরলোকগত জেনারেল মুফতী শেখ আবদুল আযীয বিন বাজ বলেছেন, যমযমের পানি দিয়ে অযূ জায়েয। তেমনি প্রয়োজন দেখা দিলে এস্তেঞ্জা এবং ফরজ গোসলও জায়েয। তাঁর মতে, নবী করীম (সঃ)-এর হাতের আঙ্গুলীর ফাঁক দিয়ে উৎসারিত পানি অযূ-গোসল ও পান করার জন্য যায়েজ ছিল। যমযম সে ধরনের পানি না হলেও দু'পানিই পবিত্র। তাই দু'টো পানির হুকুম একই হবে। -(ফাতাওয়া বি আহকামিল হজ্জ ওয়াল ওমরাহ-শেখ আঃ আযীয বিন বাজ)

(১৬) মাসিক সম্পর্কিত অজ্ঞতার কারণে নামায না পড়া ঃ মহিলারা মাসিক সম্পর্কিত মাসলা না জানার কারণে নামাযের ক্ষেত্রে অনেক ভুল করে। কেউ যদি শেষ ওয়াক্তে পবিত্র হয়, তার উপর ঐ ওয়াক্ত আদায় করা ফরজ হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'কেউ যদি সূর্যাস্তের পূর্বে ১ রাকাত আসরের নামায পায় সে পুরো আসর পেয়ে গেল।' (বোখারী, মুসলিম) অর্থাৎ তাকে বাকি রাকাতগুলো পড়া অব্যহত রাখতে হবে। তখন সূর্যাস্ত হলেও অসুবিধে নেই। আর যদি সূর্যোদয়ের আগে ১ রাকাত নামায পরিমাণ সময় আগে পবিত্র হয়, তাকে ফজর পড়তে হবে। নামাযের শেষ সময়ে পাক হওয়া সত্ত্বেও গোসল করতে গড়িমসি করায় নামাযের সময় চলে গেলে কবীরা গুনাহ হবে। মাতা-পিতা ও স্বামীর কর্তব্য হল মেয়েলোকদেরকে এ ব্যাপারে সতর্ক করা ও তাকিদ দেয়া। নচেত তারাও নামায লঙ্ঘনের গুনাহর শরীক হবে।

ইমাম ইবনুন নাহ্‌হাস বলেছেন, নামাযের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পর যদি মাসিক আসে এবং যদি ঐ সময়ে নামায আদায় করা সম্ভবপর হয়, তাহলে পাক-পবিত্র হওয়ার পর সে ওয়াক্তের কাজা আদায় করতে হবে।[১]

শেখ সালেহ বিন ওসাইমিন বলেছেন, নামাযের ওয়াক্ত শুরুর, যেমন সূর্য হেলার আধ ঘণ্টা পর মাসিক দেখা দিলে পরে ঐ নামায কাজা আদায় করতে হবে। কেননা, ওয়াক্ত শুরুর সময় সে পাক ছিল।

– (ফাতাওয়াহ আল-মারআহ-২৫ পৃঃ)

৩. তাম্বীহ আল-গাফেলীন-ইবনুন নাহহাস-পৃষ্ঠা ঃ ৩১১।

(১৭) অযূ করার পর শরীর ও কাপড়ে নাপাকী লাগলে অযূ ভাঙ্গে না। অনুরূপভাবে, নখ কিংবা চুল কাটলেও অযূ নষ্ট হয় না। যেসব কারণে অযূ নষ্ট হয় এগুলো তার মধ্যে নেই।

(১৮) পাক হওয়া সত্ত্বেও ৪০ দিন পর্যন্ত নেফাসের মেয়াদ পূরণ করা ঃ সন্তান প্রসবের পর যেদিন পাক হবে সেদিন থেকে নামায-রোযা শুরু করবে। ৪০ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করার কোন দরকার নেই। আরো আগে পাক হওয়া সত্ত্বেও নামায রোযা না করলে কবীরা গুনাহ হবে।

উপসংহার ঃ বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নামায বইটি পড়ার পর নামাযের ভুলগুলোও আলোচনা হলে নামাযকে পরিপূর্ণ করার পথে আর কোন বাধা থাকে না। উপরন্তু নামাযের জন্য দরকার পবিত্রতা অর্জন। অযূ-গোসলের মাধ্যমেই পবিত্রতা অর্জন করতে হয়। তাই নামাযের ত্রুটির পাশাপাশি অযূ-গোসলের ভুল-ত্রুটিগুলোও আলোচনার দাবী রাখে। সেজন্য আমি অযূ-গোসলের ভুল-ত্রুটিগুলোও আলোচনা করেছি।

মুসলমানের সাপ্তাহিক ঈদ হল জুম'আর দিন। সে কারণে জুম'আর নামাযের ভুল-ত্রুটিগুলোও শোধরানো দরকার। সে কাজটুকুও সম্পন্ন করতে পারায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। হাদীস শরীফে এসেছে, মহানবী (সঃ) বলেছেন, বান্দাহকে সর্বপ্রথম আল্লাহর কাছে নামাযের হিসেব দিতে হবে। নামাযের প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলোর হিসেবও এর অন্তর্ভুক্ত হবার কথা। তাই আসুন, মহান কেয়ামত দিবসের প্রস্তুতি হিসেবে আমরা নামায ও প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহকে ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা চালাই। আল্লাহ আমাদেরকে তওফিক দিন, আমীন।

সমাপ্ত